বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

বিষবৃক্ষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৬/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

(ক) অবতরণিকা

১. বঙ্কিম-প্রতিভা

শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষী ও লোকোত্তর সারস্বত প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় পৌরুষ, অপরিসীম সৃজনশক্তি বাঙালিজাতির কাছে পরম বিস্ময়াবহ ব্যাপার। বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে, বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অন্বেষণে ও প্রতিষ্ঠায়, বাঙালির অধ্যাত্ম চেতনায়, জাতীয় জীবনে সাম্যের আদর্শ প্রচারে, সর্বোপরি জাতির সুবিস্তৃত মানসলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ও রূপ সাধনার প্রভাব অনপনেয়। সহস্র শতাব্দীর তমিস্রাকে অপসারিত করে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব উনিশ শতকের বাঙালি মানসে সীমাহীন আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। যুগন্ধর মানব বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করে বাঙালি জাতি সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দৈবী প্রতিভা ও অনন্য মনীষা বাঙালিকে শুনিয়েছিল সঞ্জীবন ও উজ্জীবন মন্ত্র। এই অসামান্য পুরুষের মধ্য দিয়েই ঘটেছিল বাঙালির আত্মদর্শন—বাঙালির বঙ্গদর্শন। বর্তমানে বাঙালির আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে সম্ভাবনায়, জাতীয় জাগরণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদস্পন্দন আমরা শুনতে পাই।

বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর আত্মপ্রকাশ (১৮২৭ খ্রীঃ) বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। 'বঙ্গদর্শন' পূর্ববর্তীকালে নানা স্মরণীয় পত্রিকার আবির্ভাব হলেও তারা যেন বাঙালির রসপিপাসা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করতে পারেনি। 'বঙ্গদর্শন' সেই অভাব পূর্ণ করে জাতির জ্ঞান রসপিপাসা নিবৃত্ত করল। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালির চিৎপ্রকর্ষ ও সম্যক আত্মদর্শন ঘটল। 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণীয় মন্তব্যে বলেছেন, "বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনি' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

উপন্যাস ও সন্দর্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন গাম্ভীর্য ও শুচিতাবোধ প্রকাশিত, তেমনি বিদ্রূপ ও রহস্যাবরণের রচনায় তিনি বাঙালি মানসকে কমলাকান্তের মাধ্যমে শুনিয়েছেন ইতিহাস-দর্শন-রাজনীতি ও সমাজনীতির নানা কথা। পরাধীনতার বেদনাকে বঙ্কিমচন্দ্র কী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ মিলবে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনায়। দেশ ও কালের সীমিত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করে তিনি বাঙালিকে

স্বদেশের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হয়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর এইখানেই তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতা ও বিরাটত্ব। শাশ্বত শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিঃসঙ্গ মনের বেদনা প্রকাশে অদ্বিতীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশপ্রেম ও তত্ত্বমূলক উপন্যাসের স্রষ্টা তাই নয়, তিনি স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল বলেই আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মসম্বিৎকে জাগাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃত মানবধর্ম আবিষ্কারে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' যুগের অনন্য দর্পণ। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,— "বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনাবোধ ও কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার, দেশাচারের বিরুদ্ধে এমন নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনায় উনিশ শতকের বাঙালি মানসে যে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা একালেও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। কেননা, 'বঙ্কিমমানসের উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী দর্পণে সমকালীন ইউরোপ এবং ভারতের যুগপৎ ছায়াপাত অনুসন্ধিৎসু পাঠককে জিজ্ঞাসা চঞ্চল করে তোলে। বঙ্কিমী-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শই সক্রিয় ছিল।' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল মানবধর্মবাদে ও মানবাধিকারবাদে। বঙ্কিম মানসের এ দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোপাল হালদার তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ'-এর ভূমিকা বলেছেন, (১) "শুধু বিজ্ঞানে নয় বুর্জোয়া সভ্যতার ও সাহিত্যের যা মূল সত্যতা humanism মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, নরজীবনের প্রত্যক্ষ সম্ভাব্যতায় ও মহিমায় বিশ্বাস— মানবিকতা বা মানবধর্মবাদ। বঙ্কিম মনে প্রাণে তার দ্বারা প্রবুদ্ধ— তাঁর সৃষ্টি চেতনায় তা প্রথম থেকেই রসরূপ লাভ করেছে।" (২) "আধুনিক সভ্যতার বাস্তববাদীদের মানববাদ, জীবনবাদী চিন্তা ও যুক্তিধারার প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিম মানসের প্রধান অন্য একটা প্রবণতা।" (৩) "বঙ্কিমচন্দ্র সমাজবিপ্লবকে চান বা না চান, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র উপন্যাসের রসসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে করতে এই আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খর্বিত জাগরণের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে বিশেষ মানবাধিকারের মশাল— ব্যক্তিমানুষ তাঁর উপন্যাস থেকে ঘোষণা করলো— অয়মহং ভো। সমাজের সাধ্য কি মানুষের মর্যাদা অস্বীকার করে। এই মানবসত্যের প্রতিষ্ঠাও বঙ্কিমের উপন্যাসের মহৎ তাৎপর্য।" বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসে কী কী সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন তার উত্তরে বলা যায়— বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির ভাষা ছিল মাতৃভাষা, তাঁর দেশভক্তি তর্কাতীত, তিনি প্রথম থেকেই লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, তাঁর বন্দেমাতরম্ বঙ্গমাতার ধ্যানে উদ্বুদ্ধ হলেও সমভাবে ভারতমাতারও বন্দনা। সাম্যতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহৎ তত্ত্ব, কৃষকের কথা এত বলিষ্ঠভাবে তাঁর সমকালে কেউ বলেননি, সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনা তাঁর মুখ্য

স্বাদেশিক কর্ম। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি মধ্যবিত্তকে স্বাজাত্যের প্রেরণা দিয়েছেন, জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়েছেন, বাস্তব জগৎ ও জীবনকে সত্য বলে জানতে শিখিয়েছেন, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ সঞ্চার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যে জাতীয় আত্মপ্রকাশের এই অবদান ইতিহাসের দাবী মিটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রেরণা ও জাতীয় আত্মশাসনের আশাকে শক্তিশালী করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানবিকতার স্বরূপ অনুধ্যান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য সে বিষয়ে আমরা সকলেই প্রায় সংশয়ের অতীত। "ক্ষুরধার মনস্বিতা আর অপূর্ব সৃজনশীলতা যদি বাংলা সাহিত্যের কোনো প্রধান পুরুষের সমন্বিত আকারে একাধারে দেখতে হয় তো সেই প্রধান পুরুষ হলেন— বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের স্বভাবত যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক মন পাশ্চাত্ত্য চিন্তা সাহিত্যের ন্যাশনালিস্টিক ধারার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে আরও বেশি কর্ষণাপ্রাপ্ত, আরও বেশি সুতীক্ষ্ণ হয়েছিল।" (মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র : নারায়ণ চৌধুরী। চতুষ্কোণ, বঙ্গদর্শন শতক পূর্তি সংখ্যা।)

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নব প্রেমচেতনার উদ্বোধক। বঙ্কিম-সমকালীন সমালোচক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমকে ভারতচন্দ্রীয় কুৎসিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাঁকে পবিত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে 'একটি চমৎকার নৈতিক বিপ্লব'-এর জন্ম দিয়েছেন। শুধু প্রেম নয়, বাঙালি জাতিকে রমণীর রূপ নতুন চোখে দেখার এবং সেই রূপকে পূজা করার প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নারীকে শ্রদ্ধা করা যায় এবং শ্রদ্ধা করতে হবে— এই মহামূল্যবান শিক্ষাও তাঁরই। বঙ্কিমচন্দ্র অবিকল পাশ্চাত্য অনুকৃতির হাত থেকে বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মূল্যবোধ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিম-প্রতিভার অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে তাঁর বাংলা গদ্যচর্চায়; তিনি বাংলা গদ্যে সরলতা ও গতিসঞ্চার করে গদ্যের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেছেন। বিদ্যাসাগর ও প্যারিচাঁদ মিত্রের ভিন্নমুখী রচনারীতির সমন্বয় সাধন করে আদর্শ বাংলা গদ্যভঙ্গি নিরূপণ করেছেন। বলিষ্ঠ স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যথার্থ সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত বঙ্কিমের লেখনীতে। তিনিই আমাদের প্রথম বোঝালেন, 'The substance of Religion is culture'। তাঁর রচনার মাধ্যমেই বাঙালি তার গৌরবমণ্ডিত অতীতের সাক্ষাৎ লাভ করল। স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্বলনকারী, জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের প্রথম ঋতিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা লাভ করলাম আমাদের প্রণব বীজ— 'বন্দে মাতরম্'।

আসলে এ সমস্তই হল বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের ফলশ্রুতি। উপন্যাস ও সমালোচনা সাহিত্য তাঁর অপূর্ব সৃজনী ক্ষমতা তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ী করেছে। ইতিহাসের বিস্মৃতময় তামসলোকে কবিকল্পনার কবিতা আলোক সম্পাতে, নরনারীর হৃদয়রহস্য উদ্‌ঘাটনে, বহুমুখী চরিত্র সৃষ্টিতে, সংঘাতমুখর মানবজীবনে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অনন্য।

২. উপন্যাস ও উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র :

১. ['উপন্যাস— উপ (উপকণ্ঠে, সম্মুখে) নি— অস্ (ক্ষেপণ— স্থাপন করা) + ঘঞ্ (অ) = সম্মুখে বা প্রারম্ভে স্থাপন। ২. উপক্রম; প্রস্তাব; উপক্রমণিকা; মুখবন্ধ, বাক্যারম্ভ। ৩. উদাহরণ; দৃষ্টান্ত; উল্লেখ। ৪. বাংলায় বিশেষার্থে কাল্পনিক উপাখ্যান; উপকথা; কল্পিত গদ্যকাব্য। কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত ইত্যাদি কথাগ্রন্থকে উপন্যাস বলা যায়। অধুনা ইংরেজি নভেল (Novel) বুঝাইতে উপন্যাস শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উপন্যাস অর্থে প্রকৃত জীবনের দৃশ্যাত্মক কাল্পনিক কাহিনী সম্বলিত গদ্য গ্রন্থ; গদ্যে রচিত যে কাল্পনিক কাহিনীতে বা গল্পে প্রকৃত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়। নায়ক নায়িকাদির চরিত্র অতিপ্রাকৃত, অদ্ভুত বা নিতান্ত অলৌকিক হইলে উপন্যাস স্থলে রোমান্স (Romance) বলা হয়। নভেলের অনুকরণে অধুনা বাংলা উপন্যাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, চরিত্রনীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত হইতেছে।' — *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস]

২. "A fictitious prose narrative or tale presenting a picture of real life especially of the emotional cries in the life history of the men and women protrayed." – Twentieth Century Dictionary.

৩. ". . fictitious prose narrative of sufficient length to fill one or more representative of real life in continuous plot."

– Concise Oxford Dictionary.

৪. "A novel is a fictitious narrative, differing from the romance, because the events are accommodated to the ordinary trend of human events and the modern state of society." – Walter Scot.

৫. "The Novel is the epic form of our modern bourgeous society. ... It did not exist except in very rudimentary form before that modern civilisation which began with the renaissance and like every new art form it has served its purpose of extending and depending human conciousness."

*

"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first to take the whole man and give him expression."

– The Novel and the people / Ralph Fox

৬. "Novel– 'Derived from Italian novella tale, piece of news, and now applied to a wide variety of writings whose only common attribute is that they are extended pieces of prose fiction. The length of novels varies greatly and there has been much debate on how long a novel is or should be – ***There seem to be fewer and fewer rules, but it would probably by generally agreed that, in contemporary practice a novel will be between 60–70,000 words and, say 200,000 *** it is a form of story or prose narrative containing characters, action and incident and perhaps, a plot.' *** the

subject matter of the novel eludes classification *** No other literary form has proved so pilable and adaptable to a seemingly endless variety of topics and themes. *** The development of the novel as a popular form in the 19th c. was a European phenomenon and one of the most remarkable features of its history is the speed with which it matured."

– *A Dictionary of Literary Terms* : J. A. Cuddon.

সমাজ মানসের গভীরতম সত্যই শিল্পরীতির উৎসস্থল। স্রষ্টার মনোলোকে সমাজসত্য যে গভীরতম আলোড়নের সৃষ্টি করে তারই যথাযথ রূপদানের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন হয় রূপনির্মিতির। জীবনের প্রবহমানতা, যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা, সংঘর্ষ, উত্থান-পতন, স্বপ্ন প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বিত হয়েই শিল্পরীতির আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আবির্ভূত বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যরীতি এই মন্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

গদ্যের আবির্ভাবের অন্তরালে সমাজ বিন্যাসের, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এবং মনোজগতের বিপুল পরিবর্তনের ইতিহাস ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন যুগের চালিকাশক্তি সাহিত্যে বিভিন্ন রীতির আবির্ভাব ত্বরান্বিত করে। বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির সূচনা সর্বাত্মক নবজাগরণের অন্যতম ফলশ্রুতি। নবজাগরণ উদ্ভূত জীবন জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানচেতনা, সর্বাঙ্গীণ সংস্কারমুক্তির আন্দোলন, সর্বোপরি মানবতাবাদ— এ যুগের ইতিহাসের নিয়ন্ত্রীশক্তি। রূপান্তরিত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; অবশ্য শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমাগ্রসরমানতা এর পক্ষে রায় দেয়।

বর্তমানকাল যেমন বাস্তব কোনো ঘটনা নিরপেক্ষ নয়, তেমনি উপন্যাসও বস্তুজগত নিরপেক্ষ নয়, আধুনিক সংঘাতপূর্ণ জীবন আত্মপ্রকাশের তাগিদে উপন্যাসকেই শিল্পরীতির মাধ্যম রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর নাগরিক, কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও জটিল গতিবহুল জীবনের প্রকাশের জন্য উপন্যাসের প্রয়োজন অত্যন্ত বাস্তব সর্ত; কাম্রগ্র দেশ-কাল মনোজগতের ভাবসত্য একমাত্র উপন্যাসেই প্রতিফলিত হতে পারে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, উপন্যাস যেমন যুগাত্মার প্রতিফলন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর অন্তরাত্মারও প্রতিফলন বটে। সুতরাং জীবনের সমগ্রতার সন্ধানও উপন্যাস শিল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু। সামগ্রিকতা ব্যতিরেকে সার্থক উপন্যাস সূচিত হতে পারে না। জীবনের নিবিড় আগ্রহ যেমন ঔপন্যাসিকের রসসন্ধানী দৃষ্টির সামনে নবজীবনের দিগন্ত উন্মোচিত করে, তেমনি জীবনের প্রত্যক্ষ সৃষ্টির অভিজ্ঞতার পূর্ণ সংগ্রাম বা সংকটের ছায়াপাত ঘটে উপন্যাস।

উদ্ভূত আলোচনার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত। ছোট গল্প-নাটক-কবিতা প্রভৃতির ইতিবাচক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হলেও উপন্যাসের কোনো ইতিবাচক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, উপন্যাস যে গল্প-কবিতা-নাটক নয়, একথা

বলা যেতে পারে; কিন্তু সদর্থক সংজ্ঞায় কি তা এককথায় বলা সম্ভব নয়। উপন্যাসের সংজ্ঞা, স্বরূপ, মূলীভূত উপাদান, উপাদানের তাৎপর্য, গুরুত্ব, শিল্পরীতি ভাষারীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিতর্কিত ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।

উপন্যাস যদি 'Interpretation of human life of by means of fictitious narrative in prose.' হয়, তবে উপন্যাসের দুটো বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। প্রথমত, জীবন, দ্বিতীয়ত, জীবন ব্যাখ্যা। প্রথমটি হল উপাদান; দ্বিতীয়টি হল বৃহত্তর সত্য। বৃহত্তর সদ্য উদ্ভাসিত হয় চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে। মহৎ ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণে আশ্চর্য দক্ষতা থাকবে। এমন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করবেন যা পাঠককে আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত করে দেবে। জীবনের প্রতি বিশ্বাস থেকে ঔপন্যাসিকের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয়। মহৎ ঔপন্যাসিক যদি এই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী না হন, তবে তাঁর প্রতিভা তাঁকে সার্থকতার সীমাস্বর্গে পৌঁছে দেবে না। চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে গল্পাংশ— কেন না— 'The novel tells a story. That is the fundamental aspect without which it could not exist.' গল্পাংশ অতিক্রামী আর একটি সত্তাও উপন্যাসে ক্রিয়াশীল— তা হচ্ছে জীবন-সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নবোধ। এই বোধের প্রত্যাশা নির্ভর করে উপন্যাসকারের দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকায়। অর্থাৎ উপন্যাসকার কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকায় বিষয়কে নির্বাচন করেন; কেননা সেই দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়েই স্রষ্টার ব্যক্তিমনের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস অথবা লেখকের জীবনদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হতে পারে না। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য জীবন সৃষ্টি— জীবন সৃষ্টি প্রয়াসের মানসিক প্রবণতাই চরিত্র সৃষ্টির উৎস— সুতরাং সমাজ সত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত। যেমন শুধুমাত্র ফুলের গ্রন্থনই মালা নয়; তেমনি ঘটনা, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ প্রভৃতি হলেই একটা কাহিনী যথার্থ উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত নাও হতে পারে। এর জন্য ঔপন্যাসিকের আত্মিক শক্তির ভূমিকা থাকে— যে শক্তির বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, গল্পাংশ, চরিত্র সংলাপ-পরিবেশ এক অন্যতম জগতে উপনীত হয়ে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। এরা পরস্পর ঔপন্যাসিকের আত্মিকশক্তি বা প্রতিভার বলে একাত্ম হয়ে অখণ্ড রস-বস্তুতে পরিণত হয়, যা থেকে পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না।

ব্যক্তি ও সভ্যতার পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যে গঠিত ব্যক্তিজীবনের সমস্যার জটিলতার রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হলেও জীবন সমস্যার সমগ্রতার সন্ধান তাঁর অভিপ্রেত ও প্রতিপাদ্য। সমগ্রতার সন্ধানী দৃষ্টির আলোকে ঔপন্যাসিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস— সামগ্রিক পটভূমিকার উপন্যাস বিস্তৃতি লাভ করে। বাস্তব জগতের সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ পটভূমিকায় উপন্যাসের বিস্তৃতি লাভ ঘটলেও ঔপন্যাসিক কর্তৃক অঙ্কিত বাস্তব স্রষ্টার মনোলোকের বাস্তব। মনোলোকের বাস্তব বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে উপন্যাস।

অতএব উপন্যাস গল্পাংশ চরিত্র, পরিবেশ, জীবনদর্শন সংলাপ লেখকের আত্মিক ঐক্যের এক অখণ্ড সূত্রে বিধৃত হয়ে পাঠকের বুদ্ধিবোধিতে আবেদন সৃষ্টি করে। মহৎ উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা, ইঙ্গিত, বাক্য, শব্দ লেখকের উদ্দিষ্ট আবেদন বা রস সৃষ্টির সহায়ক সর্ত। উপন্যাসের প্রতিটি উপাদানের যথার্থ ব্যবহার উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের মাপকাঠি। উদ্ধৃত আলোচনার পটভূমিকায় উপন্যাসের ঘটনা, আখ্যানবস্তু, বর্ণনা, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাস বিচারে উপরিউক্তি মানদণ্ডের পূর্বসর্ত হল ঔপন্যাসিকের মনোজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও উপন্যাসের জন্মলগ্ন নিরূপণ। স্রষ্টার মনোসত্য ও সৃষ্টির জন্মলগ্নের উন্মোচিত রহস্য সূত্র ধরেই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার সম্ভব।

প্রাক-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে ১৮২৩-এ প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলা-ন' প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করতে পারে। গ্রন্থটি গদ্যে-পদ্যে, ছড়ায়, অনুপ্রাসে, সংস্কৃত-তৎসম প্রভৃতি গুরুগম্ভীর শব্দসমাবেশে, ব্যঙ্গে, চটুল বাচনভঙ্গিতে, নানাভঙ্গির বর্ণসংকর ভাষাবিন্যাসে, কৌতুকোচ্ছল রীতিতে রচিত। এখানে উপন্যাসের স্থির জীবনদৃষ্টি ও পরিণত প্রকাশরীতি অনুপস্থিত। ১৮৫৮-এ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং ১৮৬২-তে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয়। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থেই বাবুচরিত্র ও সমকালীন সমাজজীবন আলোচিত হয়েছে। তবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' যথার্থ উপন্যাস নয়— "নরপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের ও সরল ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল গ্রথিত সমষ্টি। ***বিশৃঙ্খল ও প্রাণাবেগচঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্র সৃষ্টি হয় নাই— সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।"[১] অবশ্য ১৮৫২-তে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স কর্তৃক রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামক গ্রন্থটি কালের দিকে থেকে অগ্রবর্তী বলে তাকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব প্রদান করা উচিত। কিন্তু এখানে আখ্যাসূত্রে ধারাবাহিকতা নেই এবং আলোচ্য গ্রন্থটি কয়েকটি পরিবারের সংসার জীবনের খণ্ডচিত্র। এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণামও অঙ্কিত হয়নি। তবে 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' গ্রন্থটির প্রধান কৃতিত্ব এই যে— "ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, জীবনের সুমিত নীতি নিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তির উন্মীলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী।"[২] তবে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সমধিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। কেননা এ গ্রন্থে যে বাস্তববর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ ও মননশীলতা আছে তা অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অনেক উন্নত। অবশ্য সমালোচকগণ কেউই 'আলালের ঘরের দুলাল'কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চাননি।—

ক. 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম পূর্ণাবয়ব উপন্যাস এবং বাস্তবরসে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে খুব উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় না। কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কণ. বা জীবন পর্যবেক্ষণই উচ্চ অঙ্গের

উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। ... ইহাতে যে সংঘাতটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের জিনিস, অন্তর্জগতের গভীরতর সংঘাতের কোনো চিহ্ন ইহাতে পাওয়া যায় না। ...পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' বা 'গোবিন্দলাল'-এর চরিত্রে যে অন্তর্বিপ্লবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এখানে তাহার আভাস মাত্র নাই। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'ও বাংলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক মাত্র, ইহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ লইবার স্পর্ধা রাখে না।"[৩]

খ. " 'আলালের ঘরের দুলাল'ও বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক সামাজিক নক্সা।"[৪]

গ. " 'আলালের ঘরের দুলাল'কে ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথম' উপন্যাস বলে স্বীকার করলেও প্রায় সকল সমালোচকই বইখানিকে পুরোপুরি সংজ্ঞানুযায়ী উপন্যাস বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ হিসাবে বইখানির শিথিলবদ্ধ প্লট এবং মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়নের অভাবের কথা সাধারণত উল্লিখিত হয়ে থাকে।"[৫]

ঘ. " 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ। কিন্তু বইটি নিখুঁত উপন্যাস হতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে 'আলাল' স্কেচধর্মী রচনা, কিন্তু উপন্যাস নয়।"[৬]

বাংলা উপন্যাসের এই পটভূমিকায় উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানবমনের গভীরতম রহস্য, জটিল জীবন জিজ্ঞাসা, মানবজীবনের বিভিন্ন বিরোধী বৃত্তির সংঘাতকে রূপায়িত করলেন। উপন্যাস শুধুমাত্র কাহিনী নয়, উপন্যাস মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তি, তার আদর্শ। জীবনের সমগ্রতার সন্ধান ঔপন্যাসিকের ধর্ম— আর বঙ্কিমচন্দ্র সেইখানেই সার্থক উপন্যাসশিল্পী। সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত অঙ্কন করা ঔপন্যাসিকের ধর্ম বলে উপন্যাস আর ঔপন্যাসিক সর্বত্রচারী। কাহিনী ও চরিত্রের পারম্পর্যযুক্ত গ্রন্থনে সেখানে জীবনবোধ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে কল্পনা থাকলেও তা বাস্তববুদ্ধির অতীত নয়, ঐতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবতার যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশে সমাজজীবনে দেখা দিলে উপন্যাসের আবির্ভাব হয়— আর সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে চরিত্র রূপায়ণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রথম উদ্‌গাতা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় যে, তিনি উপন্যাসের বিচিত্র বিভাগে পদচারণা করেছেন।

ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস— দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রাজসিংহ।

খ. ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত ও রোমান্টিক ভাবকল্পনা রঞ্জিত গার্হস্থ্য জীবনচিত্র— কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর।

গ. বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী— বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল।

ঘ. ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত— আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম।

ঙ. লঘু ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত— ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ উপন্যাসশিল্পী। তিনি একমুহূর্তে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত করে উপন্যাসের সীমা ও সম্ভাবনা প্রসারিত করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নায়ক-নায়িকাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, হঠকারিতা, আত্মদান, প্রবৃত্তির অসংযম প্রভৃতি লক্ষিত হল। " 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বরোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"[৭] ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইতিহাসের স্পর্শে ভাবনিবিড়তা (কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর); পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত প্রাধান্য (বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল); নারী চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— আধুনিক উপন্যাসশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি বঙ্কিমের লেখনীতে রূপায়িত। তাঁর লেখনীস্পর্শেই বাংলা উপন্যাস সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করে প্রেক্ষণীয় শিল্পমূর্তির আকার প্রাপ্ত হয়েছে। বঙ্কিচমন্দ্রের ত্রুটিগুলি অগ্রাহ্য করতে হয়— "বঙ্কিমের গল্প বলার ক্ষমতায়, অদ্ভুত (রোমান্টিক) ঘটনাকে অদ্ভুততর (ক্লাসিক) শৃঙ্খলার সমগ্রের দিকে পরিচালনার শক্তিতে, ইত্যাদি। চরিত্রচিত্রণে দেখি— অদ্ভুত হলেও যক্তিযুক্ত সংগতির সঙ্গে চরিত্র-উদ্‌ঘাটন, মনের ও কর্মের দলের পর দল উন্মোচন। বর্ণনার ও সংলাপের অপরূপ ইন্দ্রজালের বোধহয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন— বঙ্কিমের এই ভাষাকে না পেলে আধুনিক কালের বাঙালীর মনও স্বপ্নসত্যে মুক্তি পেত না। তার এক-একটি উদ্ভাস অনুভূতিকে শিহরিত করে, এক-একটি ক্ষুদ্র উক্তি হীরক-দ্যুতির মতো একইকালে চিত্তচমৎকারিণী, ভাবে অতলস্পর্শী।"[৮]

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত উপন্যাস ধারাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে উপন্যাসশিল্প কর্মে প্রতিভাত। রোমান্সের যাদুস্পর্শে জীবনের বিচিত্রবর্ণবৈভব তাঁর উপন্যাসে গাঢ়তায় উদ্‌ভাসিত। অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার অবতারণা, দূর অতীতের প্রতি স্বপ্নমধুর আকর্ষণ, কল্পনার গাঢ়তার বর্ণসম্পাত নয়, বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের রামধনু রঙিন মুহূর্তগুলিও বঙ্কিম-উপন্যাসে বিচিত্র বর্ণালিম্পনে উদ্‌ভাসিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাতে, সামাজিক উপন্যাসের সূচনা, কাহিনী গঠনের অভিনবত্বে, চরিত্রের বৈচিত্র্যে, ভাষার অনির্বচনীয় মাধুর্যে, রূপকল্পের তাজমহল নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্য। মানবজীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব জটিল রহস্য উন্মোচনে, গোপন পাপের প্রতি দুর্মর আকর্ষণে, পাপ থেকে মুক্তির আলোক চিত্রণে, মৃত্যুর অপরূপতায়, প্রেমের বিচিত্র রহস্য রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। রূপপিপাসার চিরন্তর রূপাঙ্কনে, সমাজবহির্ভূত প্রেমের অমলিন চিত্রাঙ্কনে দক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাভিচারী, নীতিহীন জীবনকে বরণ করতে পারেননি।

তাই কখনো কখনো আদর্শের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা শৃঙ্খলাবদ্ধ। তবুও শৃঙ্খলাবদ্ধ শিল্পীসত্তা মনুষ্যত্বসাধনার সমুচ্চ মহিমায় ভাস্বর, ব্যক্তিত্বের দীপ্ত প্রকাশে উজ্জ্বল, সর্বোপরি জাতীয় জীবনের সর্বভাব প্রকাশে বাঙ্ময় প্রতিভার অধিকারী। "বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের যে পথ উন্মোচন করেন তা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের সেই উদ্যোগী জীবনযাত্রার জয়ধ্বনি মুখরিত রাজপথ নয়। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাগরণের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের মুক্তির স্বপ্নপথ, বৈষয়িক উদ্যোগ-সমৃদ্ধির পথ নয়, চৈতন্য প্রসারের পথ— যাদের জীবন ছিল বাস্তবত পঙ্গু, তবু যাদের অভীপ্সা ছিল অসাধারণ, বঙ্কিমের বিশিষ্ট রোমান্টিক কল্পনা রসাস্বাদনে সেই বাঙালি মধ্যবিত্তদের তৃপ্তি জুগিয়েছে, তেমনি সত্য জীবনের ভাবুকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে।"[৯]

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২. ৩. তদেব
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/দ্বিতীয় পর্যায়/ভূদেব চৌধুরী
৫. বাংলা উপন্যাসের ধারা/অচ্যুত গোস্বামী
৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪)/কাজী দীন মুহম্মদ
৭. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/ পূর্বোক্ত।
৮. ৯. বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (ভূমিকা)/গোপাল হালদার

৩. বঙ্কিম-উপন্যাস পরিচিতি :

প্রাচীন ও নবীন দুটি ধারার সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান ঈশ্বর গুপ্ত যখন নবীন লেখক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক তখন কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। ঈশ্বরগুপ্ত এবং পূর্ববর্তী রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছিল এবং যার ফলশ্রুতি হলো তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' নামে একটি কবিতা পুস্তক। এখানে ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রভাব অতিক্রম করে তৎকালীন পাশ্চাত্ত্যসাহিত্যাদর্শে দীক্ষিত অনেক শিক্ষিত বাঙালির মতো ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তার ফলে রচিত হলো তাঁর 'The Adventures of a young Hindu' এবং 'Rajmohan's wife' ইত্যাদি রচনা। অবশ্য ইংরাজি ভাষা শেষপর্যন্ত তাঁর সাহিত্য মাধ্যম রূপে পরিগণিত হলো না, তিনি মাতৃভাষাতেই সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতির পরিবর্তে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী রীতি প্রবর্তনে প্রয়াসী হলেন। সাহিত্যে এই যে অভিনব রীতি প্রবর্তিত হলো তা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বঙ্কিমী-রীতি' রূপে অভিহিত। সংস্কৃত রীতির ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং আলালী ও ইংরাজি রীতির দ্রুত গতিকে বঙ্কিমচন্দ্র একসূত্রে গ্রথিত করে উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যাকে এক অর্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলা চলে। এই উপন্যাস রচনার মূলে ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ বিরাজিত থাকলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পাঠক অভূতপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময় রসে আবিষ্ট হলো। ইতিহাসের উপাদানকে তিনি এখানে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের জাগরণের অধ্যায়মাত্র। এখানে আছে নবপ্রবুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যশিল্পের বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা। আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনাপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ গতি, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ এবং ত্রুটিহীন কাহিনীরূপ না থাকলেও, বলা চলে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' নববাবুবিলাস' বা 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা এবং স্বরূপগত পার্থক্যেও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের নবজন্ম হলো, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত হলো।

পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস অপেক্ষা কবি বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গদ্যলেখা কাব্য। বিশেষ ভাবকল্পনা আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রে বিরাজিত— সমাজবিচ্ছিন্না নারীকে লোকসমাজে সংস্থাপিত করলে তার চরিত্রগত বিবর্তন ঘটবে কিনা। এ উপন্যাসের সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। স্বেচ্ছাবিহারিণী কপালকুণ্ডলা স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকতে চায় না, উন্মুক্ত অরণ্যই তার স্বেচ্ছাবিহরণের উপযুক্ত স্থান। 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্সরূপে বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। কপালকুণ্ডলা চরিত্র

রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো কালিদাসের শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়ারের মিরান্দার কথা ভেবেছিলেন। দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় নিয়তি এখানে দুর্নিবার প্রভাব ফেলেছে। 'কপালকুণ্ডলা' tale নহে— উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য— নাটক, গ্রীক নাটক।' পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী' ইতিহাসের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাহিনীর প্রতিবাদে আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত। এর মূল সুর স্বদেশপ্রীতি এবং ঔপন্যাসিক ইতিহাসের স্বল্পতাকে কল্পনার দ্বারা পূরণ করেছেন।

ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাধারাণী', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'— এই কয়টি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজ বণিকের সংঘর্ষের কাহিনী ঐতিহাসিক পটভূমিকারূপে ক্রিয়াশীল থাকলেও, এখানে বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে। চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস। এই উপন্যাস দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্যধর্মের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেছেন। নগেন্দ্রনাথ যেদিন বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রণয়াসক্ত হলো সেইদিনই দাম্পত্যপ্রেমের সংসারভূমিতে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হলো। নগেন্দ্রনাথের রূপজ মোহ সূর্যমুখীর দ্বারা অভিশপ্ত বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু, নগেন্দ্রনাথের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও প্রেমপিপাসিতা শৈবলিনী প্রতাপের প্রতি অনুরাগবশত চন্দ্রশেখরকে সমগ্র হৃদয় অর্পণে অক্ষম। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্য-আদর্শের শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাসের ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণী যেন 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী। রোহিণীকে নিয়ে গোবিন্দলালের পলায়ন ও পতিব্রতা ভ্রমরকে পরিত্যাগ— আলোচ্য উপন্যাসে অভিশাপগ্রস্ত ও ধিক্কৃত হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', এবং কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জীবনদর্শকে জয়যুক্ত করাতে চেয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্য সমাজের প্রণয়জীবনের স্বেচ্ছাচারের বিরোধী। এই সমাজানুগত্যের জন্য কেউ কেউ তাঁকে আদর্শবাদী বলতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত শিল্পের জন্য শিল্পতত্ত্বকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে চাননি এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধকরূপে শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। তবে আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী হলেও শিল্পনির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদী।

'ইন্দিরা', 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতিতে শিল্প নিটোল হলেও কাহিনী নির্মাণে জটিলতা অনুপস্থিত এবং শিল্পচাতুর্য অপেক্ষাকৃত কম। 'রজনী' মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, জন্মান্ধ নারী প্রেমের প্রভাবে কতখানি সক্রিয় তবেই সমাধানের চেষ্টা আলোচ্য উপন্যাসের লক্ষ্য। এখানে পাত্রপাত্রীর আত্মকাহিনির মাধ্যমে কাহিনি বিবৃত

হয়েছে। এ জাতীয় রীতি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। আত্মকথনের ভঙ্গিতে উপন্যাস রচনার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয় উইলকি কলিন্‌স্ কৃত 'Woman in white' গ্রন্থে। 'রজনী' উপন্যাসটি লিটন প্রণীত 'Last day of Pompai' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। 'রজনী'-র সঙ্গে উইল্‌কি কলিন্‌স্-এর 'Poor Miss Finch' এবং রিচার্ডসনের 'Pamela'-র সাদৃশ্য ও লক্ষ্য করা যায়।

'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা ও মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী সকলেই প্রায় ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসের ঘনঘটা সত্ত্বেও উপন্যাসশিল্প রূপে 'রাজসিংহ' অনন্যসাধারণ। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সন্ন্যাসবিদ্রোহের ক্ষীণ ইতিহাসের সূত্র অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণোজ্জ্বল কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বাদেশিকতা-আধ্যাত্মিকতা ও কঠোর সন্ন্যাসের আদর্শই 'আনন্দমঠের' মূল সুর। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ধর্মবোধকে এখানে মেশাতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের, জাতীয় জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মের সমন্বয়সাধানে প্রয়াসী হয়েনে। 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনী বাংলার ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই সময়ের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায় অপহৃতা বাঙালি বধূ কীভাবে দস্যুদলের নেত্রী রূপে যুদ্ধ করে প্রভূত ঐশ্বর্য ও কর্তৃত্বের অধিকারিণী হলো তাই আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নারীজীবনের যথার্থ সার্থকতার পথনির্দেশ করেছেন। নারীর জন্য সংসারধর্ম সত্য, নারীর জন্য সন্ন্যাসধর্ম নয়। তার চরিতার্থতা সংসারজীবনে স্বামী-পুত্র-কন্যা-পরিবারের মধ্যে। তাই উপন্যাসে দেবীচৌধুরাণী পরিণতিতে পুনরায় প্রফুল্লরূপে অবতীর্ণা—ব্রজেশ্বরের সংসারে সে সংকোচহীনা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষতম উপন্যাস 'সীতারাম'। সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও উপন্যাসটি ঐতিহাসিক নয়। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নিষ্কাম হিন্দুধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা। এখানে আছে সংসার ও সন্ন্যাসের সংঘাত, সীতারাম ও শ্রীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসই 'সীতারাম' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়।

৪. বঙ্কিম-উপন্যাসের ধারা ও বিষবৃক্ষ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন বাংলা সাহিত্যের নবীন লেখক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) আবির্ভাব। অনাধুনিক ও আধুনিক ও দুটি ধারার সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন রায়গুণাকার ভারতচন্দ্রের ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-কবিতায়। তাই বাংলা সাহিত্যেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে—তাঁর প্রথম গ্রন্থ *'ললিতা ও মানস'* একটি কবিতার বই। গ্রন্থটিতে অলংকারবাহুল্য ও রুচির দীনতা প্রকট যা বিগত যুগের কাব্যাদর্শকে স্মরণ করায়। এই পর্বের বঙ্কিমী-গদ্যেও প্রাচীনপন্থার গতানুগতিকতা সুস্পষ্ট। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তীদের প্রভাব অতিক্রম করলেন এবং নিজের মানসধর্মের প্রতিকূল কাব্যরচনার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে গদ্যরচনায় অধিকতর মনোযোগী হলেন। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের অনুসরণে পাশ্চাত্য সাহিত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন এবং ইংরেজি ভাষাকেই আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলেন। ফলশ্রুতিস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রে উপহার *The Adventures of a Young Hindu* এবং *Rajmohon's Wife* (১৮৬৪) ইত্যাদি রচনা। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁর ভুল ভাঙল এবং মাতৃভাষার সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্রতী হয়ে তিনি নিজস্ব প্রতিভায় বাংলা গদ্যরীতির নতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করলেন। তৎকালে প্রচলিত বিদ্যাসাগরীয় বা আলালীয় কোনো রীতিকেই গ্রহণ না করে তিনি সম্পূর্ণ এক অভিনব গদ্যগীতির সৃষ্টি করলেন যা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমীরীতি অভিধায় চিহ্নিত। সংস্কৃতরীতির ধ্বনি গাম্ভীর্য ও ইংরেজি রীতির গতিবাহুল্য বঙ্কিমীরীতিকে অভিনবত্ব দান করেছে।

বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম গদ্য রচনা দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)— বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জীবনে অভূতপূর্ব আলোড়নের সঞ্চার হল। ঔপন্যসিক রমেশচন্দ্র দত্তর ভাষায়— "যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে, আলেকচ্ছটায় চমকিত হইল। সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতি করিল... বঙ্গবাসীগণ বুঝিল, সাহিত্যে একটি নতুন যুগের আরম্ভ হইয়াছে।" কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*-র সঙ্গে ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট রচিত আইভানহো-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন; বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বলেছেন যে, *দুর্গেশনন্দিনী* রচনার পূর্বে তিনি আইভ্যানহো পড়েন নি। *দুর্গেশনন্দিনী* অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সৃষ্টির মধ্যে পড়ে না।; এই উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রতিভার উন্মেষমাত্র। *দুর্গেশনন্দিনী* মূলত রোমান্সজাতীয় রচনা— এই গ্রন্থের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন যুগের সূচনা হল রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তা স্মরণ্য— "কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি,

সেই সব বালক-বুলানো কথা, কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।" *দুর্গেশনন্দিনী*-র সমাদৃত হবার কারণ শুধুমাত্র এর নতুন আঙ্গিক নয়, নতুন জীবনবোধের পরিচয়-ই *দুর্গেশনন্দিনী*-র জনপ্রিয়তার কারণ— মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে *দুর্গেশনন্দিনী* এক আধুনিক যুগের কাহিনি। পরবর্তী উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬)। *কপালকুণ্ডলা*-র গোত্র নির্ণয়ে বলা হয়েছে 'tale নহে, উপন্যাস নহে— উহা গদ্যরীতির কাব্য— নাটক, গ্রীক নাটক।' *কপালকুণ্ডলা*-তে একটি বিশেষ তত্ত্বের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সমাজ-বিচ্ছিন্ন নারীকে লোকসমাজে এনে সংস্থাপন করলে তার চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন ঘটবে কিনা— এই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উত্তর খুঁজেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। রোমান্স হিসেবে তুলনারহিত *কপালকুণ্ডলা* কবি বঙ্কিমের এক অপূর্ব সৃষ্টি। "আয়তনে এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস হইতে ছোট; কিন্তু শিল্পকৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার মতো সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস সর্বসাহিত্যে বিরল। পটভূমি রচনা, আখ্যায়িকা গঠন, চরিত্রসৃষ্টি, সাংকেতিকতা যে উপাদানের প্রতিই লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাইবে যে, এই গ্রন্থ শুধু যে অনবদ্য তাহা নহে, পরন্তু বিস্ময়কর। যখন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা রচনা করেন ও প্রকাশ করেন তখন তাঁহার বয়স সাতাশ আটাশ বৎসর, সেই বয়সে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় দেওয়া বঙ্কিমের অনন্য সাধারণ শক্তিমত্তা-ই সূচিত করে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত দুর্গেশনন্দিনীকে বাদ দিলে মনে হয় যে দেবরাজদুহিতা মিনার্ভার মতো বঙ্কিমের প্রতিভা পরিপূর্ণ মূর্তিতে স্রষ্টার মস্তক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।" (*কপালকুণ্ডলা*: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ভূমিকা অরুণকুমার বসু ও সম্পাদনা সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)। পরবর্তী উপন্যাস *মৃণালিনী* (১৮৬৯) ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সঙ্গে প্রেমকাহিনির সামঞ্জস্য স্থাপনে রচিত। এখানে ইতিহাসের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনী উপস্থাপিত। আলোচ্য উপন্যাসে বাংলার ইতিহাসের ওপর নতুন আলোকপাতের চেষ্টা আছে, এ উপন্যাসের মূল সুর স্বদেশপ্রীতি। " 'মৃণালিনী' বাংলায় মুসলমান অভিযানের পটভূমিকায় উপস্থাপিত কাল্পনিক কাহিনী। *কপালকুণ্ডলা*-র পরে রচিত হলেও মৃণালিনী-র কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রবিন্যাস পূর্ববর্তীর চেয়ে অপকৃষ্ট। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমের কাহিনী এতে প্রাধান্য পেলেও মনোরমা ও পশুপতির কাহিনী গ্রন্থনে লেখক অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।" (বঙ্গ সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। সামগ্রিক বিচারে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ও উপন্যাসে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারেননি। তবে পশুপতির ট্রাজেডিকে লেখক বিশালতা দিয়েছেন— *মৃণালিনী* উপন্যাসে পশুপতিই পাঠকের একমাত্র প্রাপ্তি। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাধারাণী* (১৮৮৬) রচনা করেন। এই পর্বে রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলি সামাজিক উপন্যাস হলেও

চন্দ্রশেখর সম্পূর্ণত সামাজিক উপন্যাস নয়, ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত সামাজিক উপন্যাস হিসেবেই একে গণ্য করা উচিত। *যুগলাঙ্গুরীয়*-কে উপন্যাস বলা অপেক্ষা হিন্দু আমলে স্থাপিত একটি প্রেমের রোমান্টিক বড় গল্প বলাই বিধেয়, কেননা কাহিনী ও চরিত্র উভয় দিক থেকেই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিত। এই পর্বে রচিত *বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল*— যথার্থ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। অবশ্য *ইন্দিরা* এবং পরবর্তীকালে রচিত রাধারাণী আকারে উপন্যাসের পূর্ণতা লাভ করেনি বলে বড়গল্পের সমগোত্রীয় হওয়াই উচিত। *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল*— এই দুটি রচনা বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস; "এই দুইখানি উপন্যাসই গভীররসাত্মক, ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপদপাতের মূল কারণ অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-মুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাব্যপ্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।" (*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে ধনাঢ্য ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী নামে বালবিধবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিত্তের দুর্নিবার প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। ফলে সাধ্বী পত্নী সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী হলেন। পরে নগেন্দ্রনাথ স্বীয় ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলে সূর্যমুখী প্রত্যাবর্তন করেন। কুন্দনন্দিনী নিজেকে অপরাধী মনে করে বিষপানে আত্মহত্যা করে। মূলকাহিনীর সঙ্গে হীরা-দেবেন্দ্র উপকাহিনীও উপন্যাসে তীব্র বাসনার কামনাদীপকে প্রজ্বলিত করেছে। আলোচ্য উপন্যাসে নিষিদ্ধ কামনার উদ্দামতা, চরিত্রদ্বন্দ্ব থাকলেও ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে রোমান্টিকতার স্পর্শ থাকায় একে বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা চলে না। *ইন্দিরা*-কে উপন্যাস অথবা বড়গল্প না বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস' বলেছেন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও *ইন্দিরা*-কে 'ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস' বলেছেন। তবে 'ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস' হলেও, চরিত্রগত গভীর বিশ্লেষণ বা আলোচনা এখানে নেই। অবশ্য নায়িকা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। আলোচ্য উপন্যাসের চারিত্রিক উজ্জ্বলতার সঙ্গে মিশেছে বর্ণনা কৌশলের দক্ষতা। দস্যুহস্তে অপহরণের পর ইন্দিরার দুঃখ ও স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যে নানারূপ কৌশল অবলম্বন— এই নিতান্ত সামান্য সাধারণ উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে *ইন্দিরা*-র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। কাহিনীগত সামান্যতা ও সাধারণত্বের জন্যে গভীর সমস্য অবতারণার কোনো সুযোগ এখানে ছিল না। *চন্দ্রশেখর* সামাজিক উপন্যাস যেমন নয়, তেমনি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। উপন্যাসে সতর্কতার সঙ্গে ঐতিহাসিক পটভূমিকা অনুসৃত হলেও বাঙালীর পারিবারিক-সামাজিক জীবনের সমস্যাই এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দাম্পত্য আদর্শকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। মীরকাসেম, গুরগণ খাঁ, তকি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি

হলেও তাদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসকে অনুসরণ করেনি। তবুও এখানে ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে বলে, *চন্দ্রশেখর*-কে ইতিহাস ও সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের *রজনী* বড়গল্প জাতীয় রচনা এবং আত্মকথনমূলক ভঙ্গীতে রচিত। ইংরেজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন রচিত *The Last days of Pompeii* উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের প্রভাব অন্ধ রজনীর চরিত্রে অংশত লক্ষ্য করা যায়। "নানা জটিল ও রহস্যময় ঘটনার মধ্যে দিয়ে নায়ক শচীশ এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ এবং তারপরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় তার দৃষ্টিশক্তি লাভ—এটা হল উপন্যাসের মূল আখ্যান।" (*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*/পূর্বোক্ত)। আলোচ্য উপন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে আর একটি উপকাহিনী সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। "রজনীর গল্পাংশ রজনীর কাহিনী ও লবঙ্গের কাহিনী— এই দুইটি আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত। উভয় কাহিনীই পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে এবং উভয় কাহিনীতেই অমরনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। অমরনাথের সহিত অতীতের সম্পর্কের পটভূমিকায় বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রকে লইয়া লবঙ্গের দাম্পত্য জীবন যেমন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে, তেমন তাঁহার সংস্পর্শে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া লবঙ্গ ও রজনীর চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে।" (*উপন্যাস সাহিত্য বঙ্কিম*/ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত)। *রজনী* বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। পাশ্চাত্য সাহিত্যে উইল্‌কি কলিন্স তাঁর *Womon in White* নামক গ্রন্থে যে আত্মকথনমূলক রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই রীতিটি এখানে অনুসরণ করেছেন। রজনী-র সঙ্গে কলিন্‌স-এর Poor Miss Finch এবং রিচার্ডসনের পামেলার সাদৃশ্য সংলক্ষ্য। *রজনী*-র পরবর্তী রচনা *কৃষ্ণকান্তের উইল* "বাংলা সাহিত্যের একখানি অনবদ্য গ্রন্থ, বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক সৃষ্টি। এর বিষয়ও পুরুষের আত্মসংযমে অনিচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া এবং তার শোচনীয় পরিণাম। ...এ উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনে ও চরিত্র সন্নিবেশে বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে নারীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, পুরুষের নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত / পূর্বোক্ত)। আলোচ্য উপন্যাসে গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ করেনি, পতিব্রতা স্ত্রী ভ্রমরকে ফেলে রেখে গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে পলায়ন করেছে। অবশেষে এই চির অভিশপ্ত ব্যাভিচারের জন্যেই রোহিণী গোবিন্দলালের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, ভ্রমর গোবিন্দলালের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে; সর্বশেষে গোবিন্দলাল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী রূপে উপন্যাসে উপস্থিত। " 'কৃষ্ণকান্তের উইল,-এ বিশেষ বর্ণনা বাহুল্য নাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলিতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, ...গ্রন্থের সর্বত্রই একটা সংযত ভাবপ্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্যবোধ, একটা নির্দোষ

ঘটনাবিন্যাসশক্তি, ও একটা বিদ্যুৎ রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। ...কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।" [*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* / পূর্বোক্ত]

'বিষবৃক্ষ' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়— "এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। বিষবৃক্ষে কহিনি এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতাব মধ্যে।" 'বিষবৃক্ষ' পূর্ববর্তী রচনার সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' ধারার পার্থক্য কোথায় সে সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "বিষবৃক্ষের পর্যায়ে এসেই বঙ্কিম ঔপনাসিকের স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতি হয়েছেন। এবার তেমনি তার থেকে জীবনসমস্যাবোধ যেমন ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে নিবিড়, তেমনি তার বিচার-বিকাশে সব কিছুই হয়েছে তথ্যানুসারী ও বৈজ্ঞানিক।" [*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : দ্বিতীয় পর্যায়* / ভূদেব চৌধুরী।] ১২৭৯ র বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশ ঘটে এবং ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রিঃ), 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস রূপে 'বিষবৃক্ষের' তাৎপর্য আছে। পূর্বোক্ত সমালোচক মনে করেন— "বয়ঃসন্ধি যুগের আবেগ স্ফীত জীবনযন্ত্রণাকে বঙ্কিম একটি বিচারসম সমাধানের মুখোমুখি টেনে তোলার চেষ্টা করে আসছিলেন। *** প্রথম পর্যায়ের কলাকর্মে বঙ্কিম প্রতিভা প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নকল্পনায় পরিস্ফীত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শন রচনার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়সের পরিণতি যেমন ঘটেছিল, তেমনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসেবে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনার স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। *** বঙ্কিমের সহজে বিচার মূলক স্বভাব বঙ্গদর্শনের যুগে এসে জীবন ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে যুক্তি বিচারমুখী হয়েছিল। তারই প্রত্যক্ষ ফল বিষবৃক্ষ।" [*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : দ্বিতীয় পর্যায়* / পূর্বোক্ত]।

পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস বাস্তবজীবনের কাহিনী, বাস্তবজগতের নরনারীর হৃদয়মন্থনজাত তীব্র হলাহলের শ্বাস প্রশ্বাসে জড়িত কাহিনী। বঙ্কিম-উপন্যাসের ধারায় 'বিষবৃক্ষে'র স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যে বলেছেন— "বিষবৃক্ষ চতুর্থ উপন্যাস যাতে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা যথার্থ বিকাশ লাভ করেছে। *** রোমান্সের সমুদ্র পার হয়ে বাঙালী পাঠক বিষবৃক্ষে বাস্তবের ঘাটে এসে পৌঁছালো।" 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রথম দ্বন্দ্বমুখর জীবনের চিত্র রূপায়িত হল, ব্যক্তিত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল; রোমান্সের পুনরাবৃত্তিমূলকতা থেকে বাস্তব জীবনের অভিঘাতে পূর্ণ বাসনা-কামনার আরক্ত সংরাগ রঞ্জিত উপন্যাসের আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

[খ] উপন্যাস পাঠ : গ্রন্থভিত্তিক সাধারণ আলোচনা

১। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ এক অখণ্ড জীবনদৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত।

উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের গভীর সম্পর্ক আছে। ট্র্যাজেডির মধ্যে ঘটনার বিশেষ প্রাধান্য আছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ট্র্যাজেডি গড়ে ওঠে। আরিস্টটল ট্র্যাজেডির রূপতত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : 'A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself.'*** 'The action involves against who must necessarily have their distinctive qualities both of character and thought, since it is from these that we ascribe certain qualities to their actions.'

কাহিনী কার্য-কারণ ধারায় বর্ণিত হয়ে আখ্যানে রূপান্তরিত হয়। কাহিনী কালধারায় ব্যাপ্ত হয়ে আমাদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে আর আখ্যান উদ্ভূত করে প্রশ্ন। পাঠকের আগ্রহ ও রসপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য ঔপন্যাসিককে কাহিনী-বিন্যাস বা আখ্যানের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। উপন্যাস বা নাটকের ঘটনাটি এমন স্থান থেকে আরম্ভ হয় যেখানে সূচনার ইঙ্গিত থাকে। এখানে প্রকাশিত হয় উপস্থাপনার কৌশল। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ কথামুখ নিয়ে রচিত।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মূল বিষয় হল নর-নারীর প্রেম, এর জটিল মানসিক প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে নগেন্দ্রের নৌকারোহণে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে। সূর্যমুখী তাঁকে মাথার দিব্য দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি যেন তুফান উঠলে নৌকায় না থাকেন। অবশেষে ঝড় উঠলো। নগেন্দ্র নৌকার আশ্রয় ত্যাগ করে যে গৃহে আশ্রয় নিলেন সেখানে ঈশানের পুঞ্জ মেঘের অদূর ভবিষ্যতে অবাধে ছুটে আসার সঙ্কেত ছিল। সেখানে ভগ্ন কুটীরে এক বৃদ্ধের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে লোক-মনোমোহিনী কিশোরী কন্যাকে নগেন্দ্রনাথ দেখলেন। এই কন্যাই কুন্দনন্দিনী। তিনি যদি নৌকা থেকে অবতরণ না করতেন তবে পিতৃবিয়োগ-কাতরা, আশ্রয়হীনা কুন্দকে নিয়ে তার আত্মীয়ের খোঁজে কলকাতায় আসতে হ'তো না।

এই ঘটনার উপস্থাপনায় কোন আকস্মিকতা নেই। শিল্পী বঙ্কিম নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রার কাহিনীর সঙ্গে সূর্যমুখীর স্বামীর প্রতি সতর্কবাণী এবং ঘটনাচক্রে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ ও তাঁর মনোভাব সুন্দরভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

কুন্দকে আশ্রয় দেবার মধ্য দিয়ে মানবজীবনে নিয়তির অমোঘ বিধানের একটা যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে কলকাতায় এনে ভগিনী কমলমণির গৃহে কিছুদিনের জন্য রাখলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুন্দের স্নিগ্ধ মাধুর্য ও সারল্য নগেন্দ্রকে আকৃষ্ট করলো। সুহৃদ হরদেব ঘোষালের কাছে লিখিত পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বচ্ছ সরোবরে ভাসমান পদ্মসদৃশ কুন্দের চক্ষু, তার অপার্থিব সৌন্দর্য ও সর্বাঙ্গীণ শান্ত অভিব্যক্তি স্বচ্ছসরোবরে শরৎচন্দ্রে কিরণসম্পাতের তুল্য। তখন পর্যন্ত নগেন্দ্র কুন্দের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু রূপমোহ দেখা দেয়নি। শিল্পীর মনে যে সৌন্দর্যধ্যান থাকে, নগেন্দ্র তারই আরতি করেছেন। নগেন্দ্রনাথকে দেখে কুন্দর মনে কোন আশঙ্কা জাগেনি, সে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে। সূর্যমুখী কুন্দকে তার ভ্রাতৃতুল্য তারাচরণের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এদিকে নগেন্দ্রর জ্ঞাতি ও দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রনাথ কুন্দের দেহে নবযৌবন সঞ্চারের শোভা দেখে অভিভূত হলো। বিবাহের তিন বৎসর পরে কুন্দ বিধবা হলো।

নবম ও দশম পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবেন্দ্রের স্ত্রী হৈমবতী কুরূপা, আত্মপরায়ণা ও অপ্রিয়বাদিনী। হৈমবতীর কটূক্তি ও ব্যবহারে দেবেন্দ্র তাকে পদাঘাত করে পৃথকভাবে বাস করতে লাগলো।

পিতার মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্র পাপপঙ্কে নিমগ্ন হলো। দেবেন্দ্র বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে গিয়ে গান শোনালো। তার উদ্দেশ্য ছিল কুন্দের মন জয় করা।

একাদশ থেকে চতুর্দশ যৌবনকাল তার দেহকে পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করেছে। কুন্দের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য নগেন্দ্রের ব্যাকুলতা, তার বালবৈধব্য শ্রবণে কাতরতা, অশ্রুপূর্ণ নয়ন, দাসী কুমুদকে কুন্দ নামে আহ্বান করে তাঁর সপ্রতিভ আচরণ— এই মনোবৈকল্যের কথা পত্রে সূর্যমুখী উল্লেখ করেছেন।

নগেন্দ্রের চিত্তবিকার কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হরদেব ঘোষালকে লিখলেন— 'আমি অধঃপাতে যাইতেছি'। সূর্যমুখীর বালির বাঁধ ভাঙলো। তিনি কমলমণিকে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের সুখ-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শিশুপুত্র সতীশ তাদের জীবনকে এক স্বর্ণসূত্রে বেঁধেছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে উপন্যাসের ক্রান্তিলগ্ন সূচিত করেছে। কমলমণির নিকটে কুন্দের মনোভাব ব্যক্ত হলো। যাই হোক, সূর্যমুখীর সোনার সংসার রক্ষা করবার জন্য কুন্দ কমলমণির সঙ্গে যেতে স্বীকৃত হলো।

বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর পূর্বরাগের বিকাশের চিত্র প্রদর্শন করেননি, কিন্তু এর সম্পূর্ণ রূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। নগেন্দ্রের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ গভীর রূপাসক্তিতে পরিণত হয়েছে আর কুন্দের ক্ষেত্রে তার শুচিস্নিগ্ধ প্রেম অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে অনুরাগে রূপান্তরিত হয়েছে। কুন্দের প্রেমে কোন প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় সে কমলমণির সঙ্গে যেতে সম্মত হলো। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণী তার বাসনাতপ্ত হৃদয়-জ্বালা নিয়ে গোবিন্দলালের কল্যাণের জন্য গ্রাম ছেড়ে সম্মত হয়নি। বরং সে গিল্টি করা সোনার গয়না ভ্রমরকে দেখিয়ে তার নির্লজ্জ কামনাকে প্রকাশ করেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে হীরার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। হীরা বাল-বিধবা, বিংশতি বৎসর বয়স্কা। সে সুন্দরী, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। হীরার ভূমিকা উপন্যাসে গৌণ হলেও সে তার কার্যকলাপে কাহিনীর মধ্যে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসের একটি বৃহৎ ভূমিকা সে পালন করেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কমলমণির সঙ্গে তার গ্রাম ত্যাগে অনিচ্ছা। নগেন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাব এবং কুন্দের অসম্মতি বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তদশ থেকে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত তালে চলেছে। দেবেন্দ্রের পরিচয় জেনে সূর্যমুখী কর্তৃক কুন্দের ভর্ৎসনা, হীরার গৃহে তার আশ্রয় লাভ, কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের আসক্তিহেতু হীরার মনের জ্বালা, দেবেন্দ্রকে হীরার প্রেমাসক্তি জ্ঞাপন, এই সকল কাহিনী এই পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হীরা মূল ও উপকাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে।

পঞ্চবিংশ থেকে অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখী কর্তৃক নগেন্দ্রের কুন্দকে বিবাহ করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন, উভয়ের পরে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ বিবাহ দানের, নগেন্দ্র কুন্দের জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত রূপে মসীবর্ণ ছায়ার প্রক্ষেপণ বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ থেকে ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নগেন্দ্র-কুন্দের জীবনে আনন্দলাভের ব্যর্থতা, নগেন্দ্রের মনে অনুতাপ, রূপজ মোহ সম্পর্কে তার মানসিক গ্লানি, কুন্দকে পরিত্যাগ করে সূর্যমুখীর অনুসন্ধান, শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ থেকে ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত হীরার পতন ও মর্মান্তিক লাঞ্ছনা বর্ণিত হয়েছে। 'হীরা মহারত্ন কপর্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল।' সে এক চণ্ডাল চিকিৎসকের নিকট থেকে মনুষ্যঘাতী হলাহল সংগ্রহ করলো।

দ্বিচত্বারিংশ থেকে ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন, কুন্দের বিষপান ও মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে হীরা-দেবেন্দ্রের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আশা প্রকাশ করেছেন যে, বিষবৃক্ষ গৃহে গৃহে অমৃত দান করবে।

ঘটনার সুবিন্যস্ত রূপ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে অসাধারণ। ঘটনার পরে ঘটনা, চরিত্রসমূহের ভাব, ভাবনা ও কার্য থেকে উৎসারিত হয়ে জটিল আবর্ত রচনা করেছে। এই ঘটনারাজী আবার চরিত্রসমূহের জীবনে অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

বঙ্কিমের মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা যাই থাক তিনি শিল্পীর মন ও জিজ্ঞাসা নিয়ে এই উপন্যাসে ঘটনার সুবিন্যস্ত রূপ ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ঘটনা ও চরিত্রের পরিণতি স্বাভাবিক রীতিতে অগ্রসর হয়েছে।

জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র এক অখণ্ড দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী দু'রকম। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাইরের ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়।

কৃষ্ণকান্তে বার বার উইল পরিবর্তনের ফলে চরিত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি ঘনিয়ে এনেছেন।

আর বিষবৃক্ষে চরিত্র সকল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ট্র্যাজেডিতে নায়ক-চরিত্র সৌভাগ্যহীন হয়। এই পতনের কাহিনী ঘটনামাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেখা যায় নগেন্দ্রনাথ সচ্চরিত্র, রূপবান যুবক। উপরন্তু দাম্পত্য জীবনে সূর্যমুখীর ন্যায় স্ত্রীর অবিচলিত ও অকলুষিত প্রেমের পাত্র। এহেন পুরুষের মনের মধ্যে যে রূপতৃষ্ণা ছিল সেই রন্ধ্রপথে কুন্দনন্দিনীকে দেখে তাঁর চিত্তবৈকল্যের বীজ উপ্ত হলো। কুন্দনন্দিনী যখন বিধবা হয়ে দত্তগৃহে আশ্রয় নিল তখন নগেন্দ্রের রূপতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল। নগেন্দ্রের এই মানসিক প্রবণতা ও আলোড়নের জন্যই কুন্দের ও সূর্যমুখীর জীবনের পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। হীরা ও দেবেন্দ্র-চরিত্র মূল কাহিনীর সঙ্গে গৌণ কাহিনীর মধ্যে যোগসাধন করেছে এবং মূল কাহিনী ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এক অখণ্ড শিল্পদৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন। একদিকে তিনি দেখেছেন যে, মানবজীবন ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষ যেন ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের চিন্তা, বিচারবুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা থাকে না, সে ঘটনারাজির আবর্তে আলোড়িত হয়ে পরিণামের দিকে নীত হয়। কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক বারংবার উইল পরিবর্তনের মাধ্যমে গোবিন্দলাল ও রোহিণী পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে। রোহিণীকে বারুণীর জলাশয় থেকে উদ্ধার করবার পরে গোবিন্দলালের রূপপিপাসা জেগে উঠেছে। গোবিন্দলালের পদস্খলনের কথা শুনে কৃষ্ণকান্ত তাঁকে বঞ্চিত করে নতুন উইলে সম্পত্তি ভ্রমরের, নিষ্করুণ চিঠি প্রভৃতি মিলিত হয়ে গোবিন্দলালকে অনিবার্যভাবে রোহিণীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। রোহিণীকে নিয়ে যে নতুন জীবন গোবিন্দলাল শুরু করলেন সেখানেও প্রতিকূল দৈবের ন্যায় নিশাকরের আবির্ভাব, তার সঙ্গে রোহিণীর গোপন সাক্ষাৎকার, গোবিন্দলালের উপস্থিতি এই সকল ঘটনা চরম পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছে। সুতরাং এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহ যেন ঘটনাসমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারিয়ে উদ্ভূত অবস্থার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আর এক দৃষ্টিতে নর-নারীর জীবনলীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, মানুষের পক্ষে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা, অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি বেগ এবং প্রমত্ত মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের প্রবল ইচ্ছা অনুকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। একজন যেখানে নিজেকে সংযত রাখতে পারে অন্য ব্যক্তি তা পারে না। নগেন্দ্রনাথ সংসারে সকল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বিনা আয়াসে পেয়েছেন। এই জন্য তাঁর মানসিক শিক্ষা হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহকে বিচারবুদ্ধির আলোকে মূল্যায়ন করবার সুযোগ হয়নি। দাম্পত্যজীবনে তিনি ছিলেন সুখী, কিন্তু তাঁর রূপ-পিপাসা ছিল অচরিতার্থ। গোবিন্দলালের ন্যায় তিনি প্রবৃত্তিনির্ভর ছিলেন না। তাই তাঁর মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনা বোধ আছে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ

তাঁর মনে প্রবল আত্মগ্লানি সৃষ্টি করেছিল। কুন্দও নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে নগেন্দ্রনাথকে হৃদয়ের গভীর অনুরাগে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার জীবন শোচনীয় পরিণামে অবসান লাভ করেছে। সূর্যমুখীও প্রবল অভিমানের গৃহত্যাগ করে নগেন্দ্রের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার পরিণামে উভয়ের পুর্নমিলন হলো বটে, কিন্তু কুন্দের মৃত্যু তাদের জীবনের সমন্বয়ের সুর বিঘ্ন কবলো।

বঙ্কিম-উপন্যাসের তত্ত্ব হলো সমাজ-জীবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা। ধর্মতত্ত্বে তিনি লিখেছেন— 'সমাজের ভিতরে ভিন্ন মানুষের ধর্মজীবন নাই। সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মানুষের ধর্মধ্বংস।' 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'— এই দুই উপন্যাসে তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সংঘাত পরিস্ফুট করেছেন। চিত্তসংযমের মাধ্যমে প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য বিধান কর্তব্য। হৃদয়বৃত্তিকে অনুচিত প্রাধান্য দিলে তা পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, সুতরাং সামঞ্জস্যীভূত ভোগ আনন্দের হেতু। গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ, রোহিণী ও কুন্দ সমাজ-নীতি লঙ্ঘন করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে সুখী হতে চেয়েছিল। কুন্দ জানত না যে, সকল সুখের সীমা আছে। এ-কথা শৈবলিনীও জানত না, কিন্তু বুঝেছিল লবঙ্গলতা। নির্মলকুমারীও এ সত্য জানতো, তাই সে বাদশাহের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রবৃত্তির দাবদাহ যেখানে মানসিক স্থিতি ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, সেখানে দুঃখ ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশান্ত দৃষ্টিতে সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় নর-নারীর জীবন-প্রবাহকে লক্ষ্য করে শিল্পীর নির্লিপ্ত দৃষ্টি ও বেদনাময় মন নিয়ে তাদের কাহিনি অঙ্কিত করেছেন।

২। বিষবৃক্ষ • সামাজিক উপন্যাস

সমাজ ও সামাজিক জীবন বর্জিত কোন উপন্যাস হয় না; উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই সে সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ব্যক্তিসমূহের বা ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক পটপ্রেক্ষা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মৈত্রী ও বৈধতার বহু বিচিত্র টানা-পোড়েনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাস শিল্প বাঁক নিয়ে চলেছে। তাই এক অর্থে সমস্ত উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাস। তবে বিশেষভাবে যে উপন্যাসে সম্পূর্ণ বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তথা সামাজিক সমস্যা ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, ফলত চরিত্র সমূহের মানসবৃত্তের ভাঙচুর ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে সামাজিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করা চলো, রোমান্স/ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্য। উপন্যাসের সঙ্গে সমাজগতির সম্পর্কটি বাস্তব পরিবেশে ও লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্বতায় পরিস্ফুট হয় সামাজিক উপন্যাসে।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস'-কেই সামাজিক উপন্যাসের পূর্বাভাস বলা চলে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'কেও একই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যথার্থ সামাজিক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের বিদেশী শাসনাধীন সমাজ ও অর্থনীতির ভিতরকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার বহিরঙ্গের রুচিবিকার এসবেরই প্রেক্ষাপটে এই সামাজিক উপন্যাসকে বুঝতে হবে। একদিকে সদ্যোজাত নাগরিক মধ্যশ্রেণী, বিদেশীশিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে নতুন যুগের সংঘাত সংশয়মুখর ও অস্থির জীবনের সাহচর্যে বাংলা গদ্য লাভ করছিল শক্তি ও সক্ষমতা।

বঙ্কিম উপন্যাসের তত্ত্ব হল সমাজ জীবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি লিখেছেন— 'সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মানুষের ধর্মধ্বংস।' 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজ জীবনের সংঘাত পরিস্ফুট করেছেন। চিত্ত সংযমের মাধ্যমে প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যবিধান কর্তব্য। হৃদয়বৃত্তিকে অনুচিত প্রাধান্য দিলে তা পরিণামে দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং সামঞ্জস্যীভূত ভোগ আনন্দের হেতু।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও রোমান্সের মায়াময় কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন স্বপ্নলোক থেকে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তবে সেখানে সমাজজীবনও অনুপস্থিত নয়। অবশ্য 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক উপন্যাস এবং একে পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম কাহিনী থেকে আখ্যানে উপনীত হলেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে দেখা দিল। সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষবৃক্ষ

উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই উপনাসে কাহিনী ও চরিত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। চরিত্রের ভাবনা ও কার্য থেকে ঘটনা উৎসারিত হয়ে তা আবার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এখানে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। কুন্দনন্দিনী আপন হৃদয়াবেগের তাড়নায় নগেন্দ্রকে গ্রহণ করেছে। স্বপ্নে প্রদর্শিত চিত্রের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়নি। আলোচ্য উপন্যাসের সঙ্গে এখানে রোমান্সধর্মী 'কপালকুণ্ডলা'র পার্থক্য। এই উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী প্রমুখ সকলেই অত্যন্ত পরিচিত, আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের ধারা, অভিজ্ঞতা ও পরিণাম আমাদের মনকে স্পর্শ করে। যে সমাজজীবনে বা বাস্তব পটভূমিতে মানবজীবনলীলা সংঘটিত হয় সেই বাস্তবভূমির উপর তাঁদের বাস, নগেন্দ্রনাথের বিবাহপ্রস্তাবে কুন্দনন্দিনীর অসম্মতিজ্ঞাপন ও কমলমণির প্রস্তাবে গ্রাম ত্যাগের সংকল্প তার চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমভিত্তিক পারিবারিক জীবনের চিত্র অভিনীত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুপ্রেমের সম্পর্ক ও পরস্পরের উপর বিশ্বাস সত্ত্বেও পুরুষের অদম্য রূপতৃষ্ণাহেতু সংসারে কী জাতীয় বিপর্যয় ও সমস্যা সৃষ্টি হয় বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসে তাই দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিক নরনারীর অপ্রতিরোধ্য হৃদয়বৃত্তির রূপটি শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তাকে বাস্তবসম্মতরূপ দান করেছেন। এই জীবনকে দেখার পিছনে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক ভাবমানস পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু যা প্রত্যাশিত, স্রষ্টার ঔদার্য ও সমত্ববোধ যেন যথার্থরূপে ব্যক্ত হয়নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর মধ্যে সামাজিক মনোভাবও সচেতন ছিল। এই হেতু তিনি আদর্শবাদী দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে আদর্শ স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত করে পারিবারিক সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। বাঙালীর পারিবারিক জীবন আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে গঠিত। এই একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রটি সম্পূর্ণ না হলে কাহিনী বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য হয় না। 'বিষবৃক্ষ' আত্মীয়স্বজন পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাহিনীর বাস্তবতা যেরূপ রক্ষা করেছে তেমনি বিস্তৃতি লাভের জন্য উপযুক্ত প্রতিযোগে সহায়তা পেয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল— এই দুই খানিই বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণায়ত সামাজিক উপন্যাস; এই দুই খানি উপন্যাসই গভীররসাত্মক ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়, উভয় উপন্যাসেই বিপদপাতের মূল কারণ অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপমুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তি দমনে অক্ষমতা। উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শীতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাবপ্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।" এখানে ঔপন্যাসিক মানবহৃদয়ের গভীরে অবতরণ করেছেন। সত্যের নগ্নমূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যবিধাতা মানবজীবনের মধ্য দিয়ে যে গভীর অথচ রক্তরঞ্জিত নিয়মিত রেখাটি টেনে দেন তার গতিরহস্য তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের মূল্য বেশী, কেননা সমাজ ধ্বংসে ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। তিনি সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের আদর্শ ও মূলবোধকে বিচার করেছেন বটে, কিন্তু শিল্পীরূপে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যর্থতার পরিচয় দান করেছেন। ব্যক্তিকে সমাজবৃত্তের মধ্যে স্থাপন করে তিনি তার জীবনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দ, হীরা অথবা দেবেন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্বরূপ ও মানসিক পরিচয় সহ ব্যক্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের ধর্ম উপন্যাসে রূপ সৃষ্টি করা। এই রূপ বলতে ব্যক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশকে বোঝানো হয়। নিছক সমাজবৃত্তের মধ্যে ব্যক্তিকে রাখবার প্রয়াস করলে চরিত্র সৃষ্টি নির্বস্তুক হয়ে পড়ে। তাই শিল্পী বঙ্কিম সমাজশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত না হয়ে তার পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের রূপ ও রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিষবৃক্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমকালীন জীবন। সমকালাশ্রিত উপন্যাসগুলি বঙ্কিমের হাতে প্রায়ই পারিবারিক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পারিবারিক উপন্যাসে জীবনের সমগ্রতার বিকাশ ঘটে না। তাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যতখানি পারিবারিক উপন্যাস, ততখানি সামাজিক উপন্যাস নয়, মফস্বলের সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। সেই দিক থেকে 'বিষবৃক্ষ' উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। "গোটা গোবিন্দপুর গ্রাম কমবেশি এ কাহিনীতে উপস্থিত। দেবেন্দ্র এবং হীরার আধ্যায়িকার সাহায্যে বিষবৃক্ষের কাহিনী পারিবারিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। *** শুধু পারিবারিকতার গণ্ডি অতিক্রম করাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল না— নতুন কালের ব্যবহারে পটভূমিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাও এ ক্ষেত্রে শিল্প প্রয়াসের অঙ্গীভূত হয়েছে। *** সমকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, নতুনকালের নানা টানাপোড়েন— এই উপন্যাসের আকাশে বিভিন্ন সুরের সমাবেশ ঘটিয়েছে। *** সীমিতভাবে হলেও এই কাল লক্ষণে এবং পটভূমি পবিবেশে সমকালীন বাংলাদেশেরই এক খণ্ডকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করার চেষ্টা"। (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর / সরোজ* বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাসরূপে কোন কোন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত সে সম্পর্ক ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', প্রথম খণ্ডে লিখেছেন : "বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক, এই অর্থে যে সমকালীন। *** অবশ্য সমাজ জীবনের সকলের পরিচয় দেবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না। এমনভাবে ঘটনাকে সাজান নি যাতে নিজ সময়ের নানা শ্রেণীর আচরণ, শিক্ষা, বিয়ে, কাছারি, পুলিশ, হাট বাজার, যানবাহনের ছবি আঁকার সুযোগ মেলে"। তাঁর মতে, বিষবৃক্ষে সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এসেছে সূত্রকারে। যেমন— সেকালে ধনীগৃহস্থের বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা ছিল, তারাচরণের মাধ্যমে বর্ষিষ্ণু পল্লীতে নব্য রীতির ব্রাহ্মযুবকের আচরণ, বিধবা বিবাহ, পারিবারিক জীবনের ছবি, পুরুষ চরিত্রের অর্থনৈতিক শ্রেণী পরিচয়ে যুগসত্যের প্রতিফলন ইত্যাদি। "কাহিনীর পাত্রপাত্রীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য না হলে কোন সমাজ বিবরণই উপন্যাসে প্রশ্রয় পাবে না— এটাই বঙ্কিমের

রীতি। *** বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাহিনীর মানুষদের শ্রেণীগত ভূমিকাকে যুগোচিত বিশিষ্টতার স্থিত করেছেন। *** বঙ্কিম তাঁর আগের সমাজ আশ্রয়ী ঔপন্যাসিকদের রীতিতে বিশ্বাসী না হলেও সামাজিক উপন্যাস লিখতে বসে সময়কে অবজ্ঞা করেননি। যুগের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। *** বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সামাজিক বাস্তবতা দৈনন্দিন নিস্তরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণের নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার। সেখানে তাঁর সাফল্য।" | *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড* / ক্ষেত্র গুপ্ত | সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন— " বিষবৃক্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সমকালকে, সমসাময়িক সমাজকে স্পর্শ করলেন। *** বিষবৃক্ষে বঙ্কিম দূরস্থিত ইতিহাসের কাল পরিহার করে নিজ কালের জটিল প্রকৃতির সম্মুখীন হলেন।" *(বাংলা উপন্যাসের কালান্তর)।*

সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে' প্রেমের জটিল রূপ প্রকাশিত। শিল্পী বঙ্কিম জীবনের গভীর সত্যকে ভিন্ন তাৎপর্যে মন্ডিত করে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দৃষ্টিকে নরনারীর মনোলোকে নিবদ্ধ করেছেন। তার রূপ ও রহস্যকে ব্যক্ত করেছেন। বিস্ময়কর ও বিচিত্র মানবজীবন তাঁর লেখনীতে ব্যাখ্যাত ও প্রদর্শিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বললেও সেখানে সামাজিক প্রভাব আদৌ নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করেনি। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্রসমূহ নিজেদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে অনিবার্য গতিতে যাত্রা করেছেন। এখানকার ঘটনাসমূহ চরিত্রের বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। সুতরাং সামাজিক উপন্যাসরূপে 'বিষবৃক্ষে'র সাফল্য অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি। কেউ কেউ মনে করেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের ন্যায় একটি সামাজিক সমস্যার অবতারনা করেছেন; সুতরাং এটি সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু তা যথার্থ নয়; কেন না ঔপন্যাসিক এখানে সামাজিক সমস্যার দ্বারা আলোড়িত হলেও সংস্কারমুক্ত মন ও সমবেদনা স্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছিলেন। সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহের নিন্দা ও সমর্থন করেছেন। সূর্যমুখী জানেন নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দর বিবাহ হলে তাঁর নিঃসপত্ন অধিকার নষ্ট হবে; আর নগেন্দ্র এই বিবাহকে নীতি বিরুদ্ধ বলে মনে করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। নগেন্দ্রনাথের এই বিবাহ শুধু যে পারিবারিক জীবনের শান্তি নষ্ট করবে তাই নয়; এক অনভিপ্রেত অমঙ্গলের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে। বিধবা কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের এই মনোভাব নিয়ে সমস্যা বিচার না করে নগেন্দ্রনাথের রূপোন্মাদনার কথা বলেছেন। উদগ্র আত্মসুখ যদি অন্যের সুখকে বিনষ্ট করতে চায় তবে তা পরিণামে কল্যাণকে আঘাত করে। রূপোন্মাদনা পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট কবলে সামাজিক শুচিতাবোধকেও আক্রমণ করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, আত্মসুখসর্বতা থেকে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা ভেবে বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক সমস্যাকে সামাজিক সত্যের পরিবাহিতায় অতিক্রম করিয়ে দিয়েছেন বলে 'বিষবৃক্ষ'কে সামাজিক উপন্যাস বললে অত্যুক্তি হয় না।

৩। 'বিষবৃক্ষে'র সমাজবৃত্তে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা

বঙ্কিমচন্দ্রে রোমান্সধর্মী উপন্যাস দুর্গেশণন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯)। এই তিনটি উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমিতে নর-নারীর বিচিত্র জীবন-কাহিনি, তাদের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ইতিহাস এখানে পশ্চাতে থেকে মানবজীবনে এক দুর্নিবার প্রেরণা ও গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে কিন্তু তা পুরোভাগে স্থান পায়নি। বিষবৃক্ষের পরে চন্দ্রশেখর ও রাধারাণী রচিত হয়েছিল কিন্তু ভাব ও রীতির দিক থেকে তারা প্রথম পর্বের সঙ্গে সংযুক্ত। *'বিষবৃক্ষ'* (১৮৭৩), *'রজনী'* (১৮৭৯) ও *'কৃষ্ণকান্তের উইল'* (১৮৭৮) এই উপন্যাসসমূহের রীতি ও সুর প্রথম পর্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস নিছক ঘটনানির্ভর নয়। এখানে চরিত্রসমূহ কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তব জগতে পদার্পণ করেছে। কপালকুণ্ডলাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কল্পনা প্রাধান্য লাভ করলেও তা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই উপন্যাসে বাস্তব জীবনের অন্যান্য পরিচয় বর্জন করে চরিত্রসমূহের একটি অভিপ্রায় অপরাপর সাংসারিক দাবীর ঊর্ধ্বে উঠে অভ্রান্ত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। মৃণালিনীতে বাস্তবতার প্রকাশ আরো পরিস্ফুট। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনরসের প্রবাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে লেখক যে জীবনের গভীর স্তরে অবতরণ করেছেন তা নয়, তবে স্বাভাবিকতার দিক থেকেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আবার 'রজনী'তে চারটি প্রধান চরিত্র নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা যখন একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছে তখন তারা নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জীবনে অবতরণ করেছেন। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়। প্রথম পর্বের উপন্যাস ছিল কাহিনীভিত্তিক, কিন্তু পূর্বোক্ত দুইটি উপন্যাস পৌঁছুলে আখ্যানে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পর্বের উপন্যাসে ঘটনার পরে ঘটনা বিন্যস্ত করে এদের মধ্যে চরিত্রসমূহ সমর্পণ করায় বহুক্ষেত্রে আমাদের মনে উত্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না, জীবনের সকল অংশে আলোকপাতও ঘটে না।

সমাজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। চরিত্রে ভাবনা ও কার্য থেকে ঘটনা উৎসারিত হয়ে তা আবার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এখানে আকস্মিকতার স্থান নেই। কুন্দনন্দিনী আপনার হৃদয়ের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়াবেগের তাড়নায় নগেন্দ্রকে গ্রহণ করেছে। স্বপ্নে প্রদর্শিত চিত্রের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মাতৃপদ থেকে বিল্বপত্রে পতন তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী কিংবা কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল আমাদের অত্যন্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। তাঁদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের ধারা, অভিজ্ঞতা ও পরিণাম আমাদের মনকে স্পর্শ করে। যে সমাজজীবনে বাস্তব পটভূমিতে মানব জীবনলীলা সংঘটিত হয় সেই বাস্তব ভূমির উপর তাঁদের বাস। নগেন্দ্রনাথের বিবাহ-প্রস্তবে কুন্দনন্দিনীর অসম্মতি জ্ঞাপন ও কমলমণির প্রস্তাবে গ্রাম ত্যাগের সঙ্কল্প, তার চরিত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমভিত্তিক পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর প্রেমের সম্পর্ক ও পরস্পরের উপর বিশ্বাস, স্বামীর অদম্য রূপতৃষ্ণা হেতু সংসারে কী জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করে তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। বঙ্কিম নর-নারীর অপ্রতিরোধ্য হৃদয় বৃত্তির রূপটি শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তাকে বাস্তবসম্মত রূপদান করেছেন। এই জীবনকে দেখবার পেছনে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক ভাবমানস পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু যা প্রত্যাশিত, স্রষ্টার ঔদার্য ও মমত্ববোধ তা যেন যথাযথরূপে ব্যক্ত হয়নি। এর কারণ বোধহয় এই যে, তাঁর মধ্যে সামাজিক মনোভাবও সচেতন ছিল। এই হেতু তিনি আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে আদর্শ স্বামী প্রতিষ্ঠিত করে পারিবারিক সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

বাঙালীর পারিবারিক জীবন আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গঠিত। এই একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রটি সম্পূর্ণ না হলে কাহিনীও বস্তুনিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বিষবৃক্ষ আত্মীয়-স্বজনপূর্ণ পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় কাহিনীর বাস্তবতা যেরূপ রক্ষা করেছে তেমনি বিস্তৃতি লাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সহায়তা পেয়েছে।

বিষবৃক্ষ পারিবারিক তথা সামাজিক উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক 'মানব হৃদয়ের গভীর স্তরে অবতরণ করেছেন, সত্যের নগ্নমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যবিধাতা মানবের জীবনের মধ্য দিয়া যে গভীর কৃষ্ণ অথচ রক্তরঞ্জিত নিয়মিত রেখাটি টানিয়া দেন, তাহার গতিরহস্যটি তিনি খুব সূক্ষভাবে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের মূল্য বেশী, কেননা সমাজে ধ্বংসে ব্যক্তিও বিনষ্ট হয়। তিনি সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিচার করেছেন। ব্যক্তিকে সমাজবৃত্তের মধ্যে স্থাপন করে তিনি তার জীবনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা অথবা দেবেন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্বরূপ ও মানসিক পরিচয়সহ ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসে রূপ সৃষ্টি করা ঔপন্যাসিকের ধর্ম। এই রূপ বলতে আমরা ব্যক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশকে বুঝে থাকি। নিছক সমাজবৃত্তের মধ্যে ব্যক্তিকে রাখবার প্রয়াস করলে চরিত্র সৃষ্টি নির্বস্তুক হয়ে পড়ে, তাই শিল্পী বঙ্কিম সমাজ-শক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত না হয়ে তার পটভূমিকায় ব্যক্তি-জীবনের রূপ ও রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাই এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্রে ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সহিতত্ব বা নৈকট্য স্থাপিত হওয়ায় আমাদের রূপপিপাসা তৃপ্ত হয়।

৪। বিষবৃক্ষ : বিন্যাস ও শিল্প প্রকরণ/শিল্পরীতি/গঠনকৌশল/গঠন শৈলী :

বাংলা উপন্যাসের মুক্তিদাতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের কায়াগঠনে ইংরেজি নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শেক্সপীয়রের নাটক গড়ার কলাকৌশল অর্থাৎ কেন্দ্রে উপকাহিনীর আনুগত্য তথা তাৎপর্যমুখিতা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন এবং নাট্যজগত থেকে নিয়ে এসে উপন্যাস কথনে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পথ অনুসরণ করেই তিনি একটা মৌলিকভঙ্গি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আনলেন, যা নাটকীয় হলেও ঠিক নাটকের মতো নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যভঙ্গিকে মানবচিত্তের গভীর বোধের সঙ্গে যুক্ত করে উপন্যাস শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উদ্বোধন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার মূল বৈশিষ্ট্য হল— এক বা একাধিক উপকাহিনী, উপকাহিনীর স্বতন্ত্র বিস্তার এবং মূলের সঙ্গে তার যোগ, সমান্তরাল ঘটনা ও চরিত্রের আভ্যন্তর বিসদৃশ ভাবসৃষ্টি, পরিবেশ, চিঠি, উইল, সঙ্গীত, ছড়া, স্বপ্ন, আলৌকিক সঙ্কেত, জ্যোতিষীর গণনা, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ ইত্যাদি উপাদানের ব্যবহার। তাঁর উপন্যাসের ভাষারীতি অতিসচেতন মনের ফল। চরিত্র রচনায় কখনও তীব্র ঘটনা বা আবেগতাড়িত সংলাপে হৃদয়ের গভীর গোপন অংশ উদ্‌ঘাটন।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস এবং এর শিল্পরীতি রোমান্স থেকে স্বাভাবিকভাবেই পৃথক। তবে আলোচ্য উপন্যাসে কুন্দের স্বপ্নদর্শন, দেবেন্দ্রের ছদ্মবেশ ধারণ, কুন্দ ও সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, হীরা কর্তৃক কুন্দকে বিষ খাওয়ানো, কুন্দের আত্মহত্যা, উন্মাদিনী হীরা ও রোগগ্রস্ত দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে রোমান্স রস থাকলেও পূর্ববর্তী কালের রোমান্সের ঘটনাপুঞ্জের প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানে আছে ব্যক্তিত্বের প্রবৃত্তিতাড়িত ক্রমবিকাশের সঙ্গে ঘটনার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পূর্ববর্তী রোমান্সের সঙ্গে তুলনায় একথা বলা যাবে না, "বিষবৃক্ষে বাইরের ঘটনার গুরুত্ব নেই। *** এবং বঙ্কিম এই উপন্যাসেও ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যে মানবসমস্যার কেন্দ্রে বৃত্তায়িত প্লট গঠনে যত্ন নিয়েছেন। শিল্পরীতির বিচারে একথা মানে হয় যে রোমান্সে হাত পাকানো লেখক সামাজিক উপন্যাসে সুস্থির সাফল্যে পৌঁচেছেন।"

— (*বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি/* ক্ষেত্র গুপ্ত)

পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিভাগের পরিকল্পনা থাকায় অবিরাম গতির ভাব প্রকাশিত। উপন্যাসের দ্বিতীয় বাক্যেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাব প্রকাশিত। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা প্রণয়-ত্রিভুজের। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর গাঢ় প্রীতিবদ্ধ উপদ্রবহীন জীবনে বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রবেশ— প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত সেই কাহিনীর প্রবেশ এবং ত্রিভুজকেন্দ্রিক প্রণয়ের সূত্রপাত। পঞ্চম অধ্যায়ে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সংবাদ বহন করা দুটি পত্রের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ। এখনও ঔপন্যাসিক কেন্দ্রীয় কাহিনীতে প্রবেশ করেননি। অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত পূর্বকথা। নবম অধ্যায়ে দেবেন্দ্রের স্বভাবচরিত্রের তথ্যাদি পাওয়া যায়। এর আগে অবশ্য কুন্দকে

গোবিন্দপুরে আশ্রয় দিয়ে সূর্যমুখী কর্তৃক নতুন গ্রন্থি রচনা: নগেন্দ্রের গৃহবর্ণনায় লেখক নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনের প্রগাঢ় আসক্তি ও ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য-গৌরবের ভাব পাঠককে জানালেন। একাদশ পরিচ্ছেদে নাট্যাঙ্গিকের নতুনত্ব সূর্যমুখীর চিঠিতে নগেন্দ্রের চিত্তের গভীরে এবং উপন্যাসের মূল প্রণয়ঘটিত ত্রিধাবিভক্ত সমস্যায় ঔপন্যাসিকের প্রবেশ। চৌদ্দ এবং ষোল অধ্যায়ে নগেন্দ্রের আসক্তি যে উপকাহিনী সৃষ্টি করেছিল তা পঞ্চদশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে মূলকাহিনীর উপর এসে পড়ল। ছদ্মবেশী দেবেন্দ্রের যথার্থ পরিচয় জেনে সূর্যমুখী কুন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। কুন্দের গৃহত্যাগে উপন্যাসের মূল সমস্যা নতুন বাঁক নিল এবং অনেক তীব্র হয়ে উঠল। পঁচিশ অধ্যায়ে নগেন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমুখী কুন্দের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে জানা গেল। পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসের ঠিক মাঝামাঝি ঘটনা এখানে শীর্ষবিন্দুতে উপনীত। পনের থেকে পঁচিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দশটি অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক মূল প্লট বিকশিত করে তুলে কলাকৌশলগত উৎকর্ষের নিদর্শন রেখেছেন। এখানে হীরা-দেবেন্দ্র উপকাহিনী অনেকটা স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে। ক্লাইম্যাক্সের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে (২৬-২৭) বিবাহের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া-- পরের অধ্যায়ে সূর্যমুখীর অন্তর্ধানের কাহিনী তীব্রভাবে আন্দোলিত। পরবর্তী পরিচ্ছেদে হীরা উপকাহিনীর বিকাশ, দেবেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ যেমন গভীর, কুন্দের প্রতি তেমনই তীব্র ঈর্ষা। হীরা প্রসঙ্গের সাহায্যে বেশ কিছুকাল ব্যবধানের কথা জানিয়ে ঔপন্যাসিক ৩৪, ৩৫ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর চরম দুরবস্থা ও নগেন্দ্রের সংবাদপ্রাপ্তির কথা জানালেন। ৩৬ পরিচ্ছেদে হীরা দেবেন্দ্র কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়। ৩৭-৩৯ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর মৃত্যুতে নগেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত— সংবাদটি অপ্রত্যাশিত বলে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত এবং পরবর্তী মিলনব্যাপারে তীব্রতর নাট্যচমকের মতো কাজ করেছে। নগেন্দ্রের গৃহত্যাগের পর থেকে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত (৩৯ পরিচ্ছেদ) আখ্যায়িকা বিকাশের একটি সুস্পষ্ট স্তর। ৪০ পরিচ্ছেদে পুনরায় হীরার প্রেমকাহিনী; ৪২-৪৬ পর্যন্ত নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের কাহিনী; এই সময় সূর্যমুখীর আবির্ভাব নাটকীয় আকস্মিকতায় এবং উভয়ের অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনে নাটকের স্বাদ আছে— কিন্তু কুন্দের নীরব অস্তিত্ব সে মিলনকে মধুর ও আনন্দোদ্বেল করতে পারেনি। প্লট বিকাশের আলোচনায় হীরা দেবেন্দ্রের উপকাহিনী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মূল প্রণয় ত্রিভুজের সঙ্গে লালসা-ঘৃণা ও ঈর্ষার বন্ধনে আবদ্ধ হীরা দেবেন্দ্র কাহিনী মূল আখ্যানকে জটিলতর করেছে। বিপরীত দিকে কমল-শ্রীশ ও সতীশের উপাখ্যানে কোনও উপকাহিনী গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনভাবে বিবৃত এ কাহিনীতে কৌতুকে মাধুর্যে ও বাৎসল্যরসে পূর্ণ পারিবারিক চিত্রই উপস্থাপিত। এ কাহিনী স্বতন্ত্র সুরের সৃষ্টি করেছে এবং নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জীবনযন্ত্রণার বিপরীত পটভূমিরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে আখ্যায়িকা গঠনে চিঠির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোট ১৩খানি চিঠির মধ্যে দুটি চিঠি দীর্ঘ, বাকিগুলি মাঝারি ধরনের। ১৩ খানি চিঠির মধ্যে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর লেখা পাঁচখানি করে, হরদেব ঘোষালের দুখানি ও ব্রহ্মচারীর লেখা একখানি।

তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিগুলি সবই ৩২ পরিচ্ছেদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। চিঠিগুলির দ্বারা আত্ম বিশ্লেষণ, মনোবিশ্লেষণ, গোপনস্তরের জটিল সম্পর্কের ইঙ্গিতময় নির্দেশ, অবচেতন লোকে প্রবেশের ইঙ্গিত ইত্যাদি প্রকাশিত। 'বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে চিঠিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন অনেকখানি তীক্ষ্ণভাবনার ফলে।'

সামাজিক উপন্যাসে অতিলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ চরিত্র যোজনার অবকাশ অল্প বলে সূর্যমুখীর উদ্ধার কর্তারূপে যে ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব তার ভূমিকা যান্ত্রিক ও গৌণ।

আলোচ্য উপন্যাসে ৯টি সঙ্গীতও আখ্যায়িকা অংশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেবেন্দ্র-হীরা উপকাহিনীর সঙ্গে জড়িত সঙ্গীতগুলি উপন্যাসের কেন্দ্রকে লঘুভাবে স্পর্শ করে আছে। সঙ্গীতগুলি কাহিনীকে রোমান্টিক করেছে ও লাস্য মাধুর্যের সুর সঞ্চারিত হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে স্বপ্ন প্রসঙ্গ অবশ্য বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বপ্নগুলিতে যথাক্রমে নগেন্দ্রের অনুশোচনা, মানস যন্ত্রণা, কুন্দের হতাশা ও চরম আশ্রয়হীনতা, নগেন্দ্র বিষয়ে কুন্দের গভীর চিত্তব্যাকুলতা ইত্যাদি প্রকাশিত। তবে স্বপ্নের মাধ্যমে উপন্যাসে নাট্যরসের প্রকাশ লক্ষ্যগোচর।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বর্ণনামূলকতার যথাযথ ব্যবহার আছে। প্রকৃতিবর্ণনা, চিত্রসপ্তকের বর্ণনা, নগেন্দ্রের বাড়ি উদ্যান ও পরিবেশের বর্ণনা, নারীরূপর বর্ণনা ইত্যাদির মাধমে উপন্যাসে রোমান্টিকাত্র ও বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতিবর্ণনায় বাগান, আকাশ, রাত্রির আকাশ, ঝাউতলার শেষরাত্রি, প্রভাতকালীন উদ্যান, রাত্রিকালীন উদ্যান ইত্যাদি বর্ণনায় ঔপন্যাসিক প্রকৃতির শান্ত কোমলরূপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আকাশের নীরব অনন্ত গাম্ভীর্য কুন্দের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। প্রকৃতি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির ভয়াল রুদ্ররূপের উপাসক নন। নগেন্দ্রের গৃহ, উদ্যান, বিভিন্ন মহল ইত্যাদির বর্ণনা নগেন্দ্রের ঐশ্বর্য ও উল্লাসময় জীবনের কথা জানিয়ে দেয়। আবার ঔপন্যাসিকের বাস্তবচিত্র বর্ণনার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নদীতীরে গ্রামের জীবন ও গোবিন্দপুর গ্রামের নানা লোকজনের বর্ণনা ইত্যাদি অংশে। চিত্রসপ্তকের বর্ণনা ও ভাষাগত বিশিষ্টতার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসের একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন।

বঙ্কিম-শিল্পরীতিতে নরনারীর রূপবর্ণনা বিশেষ গুরুত্ব দাবী করে। নারীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নয়ন, দেহবর্ণ ও দেহভঙ্গির উপর। (যেমন : 'সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকাস্পর্শী ভ্রুযুগসমাশ্রিত।' হীরার চোখ 'পদ্মলাশনয়না')। দেবেন্দ্রের অপুষ্ট গঠন ও নারীসুলভ কান্তি পৃথকভাবে তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না। কুন্দের বর্ণনায় তার নয়নের দৃষ্টি, দেহাতিরিক্ত লাবণ্যের প্রকাশ ঘটে। কুন্দের স্বপ্নে দেখা নগেন্দ্রও 'উন্নত প্রশস্ত প্রশস্ত ললাটে', 'সরল সকরুণ-কটাক্ষ, 'দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা'। মূলত রূপবর্ণনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সচেষ্ট হন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে আখ্যায়িকা কৌশলে মন্তব্য, নীতিবাক্য প্রয়োগ, রীতিবর্ণনা

ইত্যাদিও ক্রিয়াশীল থেকেছে। কৌতুক সৃষ্টির জন্য বেশ কিছু সরস মন্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে। বিষবৃক্ষ কী, তার স্বরূপই বা কী ইত্যাদিও শিল্পরীতির সঙ্গে জড়িত। উপন্যাসে সমকালীন চিত্রাঙ্কনের প্রবণতাও আলোচ্য উপন্যাসে বেশ লক্ষ্যগোচর।

কিন্তু এসমস্ত উত্তীর্ণ হয়ে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে যে শিল্পরীতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, সমালোচকের ভাষায় তা হল :

১. "পূর্বতন রীতির পুরো ব্যবহারের পরেও বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র আরও কিছু করেছেন। তা হল বিশ্লেষণ। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি নতুন। চরিত্ররচনায় বিশ্লেষণরীতি প্রথম প্রতিষ্ঠা পেল বিষবৃক্ষেই। নগেন্দ্র সূর্যমুখী কুন্দ হীরা দেবেন্দ্র— এই মানুষগুলির মনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লেখক প্রবেশ করেছেন। কখনও ভিন্নমুখী বিভিন্ন বৃত্তির সংঘাত দেখিয়েছেন (নগেন্দ্র, কুন্দ, হীরা), কোথাও চকিতে অবচেতনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে (নগেন্দ্র, সূর্যমুখী), আবার আপাত যুক্তিপূর্ণ কাজের উৎসে সুপ্ত চিত্তবৃত্তির সক্রিয়তা (সূর্যমুখী) অনুভব করা গিয়েছে। আবার কোনও ব্যক্তির অধঃপতনের কারণানুসন্ধানে (দেবেন্দ্র) লেখকের যুক্তিবিস্তার। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কখনও আধা-নীতিকথার ছদ্মবেশে বা সরাসরি ব্যাখ্যায় নেমেছেন লেখক। এরূপ চেষ্টা বর্তমান উপন্যাসে বড় কম নয়। উনত্রিশ আটত্রিশ এবং চুয়াল্লিশের অধ্যায়ে নগেন্দ্রের, ষোল সতের এবং বিয়াল্লিশের অধ্যায়ে কুন্দের, কুড়ি এবং চল্লিশের অধ্যায়ে হীরার, দশের অধ্যায়ের দেবেন্দ্রের মন ও চরিত্র সোজাসুজি লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য এই উদ্দেশ্য কখনও চিঠি, কাজ ও কথা আবার অন্য পাত্রের দৃষ্টিকোণের সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ অপরাপর উপায়ের সঙ্গে পূর্বে বিবৃত ঘটনা-তরঙ্গ ও সংলাপের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও বিশ্লেষণ-রীতিকে তিনি জড়িয়ে দিয়েছেন, পাশাপাশি এরা দুটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি হয়ে থাকেনি।

চরিত্রাঙ্কনে আরও কয়েকটি পদ্ধতিগত বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। এগুলি একান্ত গৌণ মানুষদের নিয়ে। যেমন— ক. সুরেন্দ্র চরিত্রটির আমদানি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার কোনও পৃথক চেষ্টা ঔপন্যাসিক করেননি। তাকে যে প্রয়োজনে লাগিয়েছেন, তা সিদ্ধ করতে গিয়েই সুরেন্দ্র নিজস্বভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মানুষটির মমতার দৃষ্টিতে দেবেন্দ্রের অসৎ চরিত্রের উপরে যুগপৎ ঘৃণা-ভর্ৎসনা ও প্রীতি সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। দেবেন্দ্রের-চরিত্র সৃষ্টিতে সুরেন্দ্র একটি সহায়ক উপাদান। খ. হরদেব ঘোষালের ব্যক্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। এই ব্যক্তি চিঠির মধ্যেই মাত্র ধরা দিয়েছে— গোটা উপন্যাস জুড়ে এর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। অথচ এই চরিত্রের ধারণা নায়কচরিত্রচিত্রণে বিশেষ সাহায্য করেছে। গ. ব্রহ্মচারী ব্যক্তিত্বহীন বৈশিষ্ট্যহীন। ঘটনাগ্রন্থি সঠিক রাখাই তার একমাত্র কাজ। ঘ. তারাচরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার স্বল্প উপস্থিতিতে। তার চরিত্রের উপস্থা নো ব্যাপকতার প্রতিশ্রুতি আনে; লেখক কিন্তু নির্মমভাবে তাকে মৃত্যু মুখে সঁপেছেন আয়োজনহীনভাবে। উপন্যাসের প্রয়োজনে বঙ্কিম অত্যন্ত সংযত। ঙ. সতীশচন্দ্রের হাস্য কলরব পিতামাতার জীবনে মাধুর্য বর্ষণ ছাপিয়ে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবন

সমস্যা পর্যন্ত ইঙ্গিত করে। তাদের নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবন ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ কিনা এই প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।

গৌণ চরিত্রকে কাজে লাগানো অথচ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ করে তোলা (ব্যতিক্রম ব্রহ্মচারী), তাদের বিন্যাসে কুশলতা ও অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

আগের শ্রেষ্ঠ লেখা কপালকুণ্ডলা যথেষ্ট গভীর, কিন্তু বিষবৃক্ষ উপন্যাসের জীবনবোধ ও চরিত্রভাবনায় গভীরতার সঙ্গে জটিলতাও সমন্বিত। শিল্পরীতিও হয়ে উঠেছে সেই জটিল গভীরতার সার্থক দেহরূপ।" *(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্রগুপ্ত।)*

২. "চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবিন্যাস ছাড়া অন্যান্য দিক্ দিয়াও 'বিষবৃক্ষ' খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সরল ও জীবন্ত বাস্তব বর্ণনায় বঙ্কিম বঙ্গ-উপন্যাসক্ষেত্রে অতুলনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নৌকা-যাত্রা, গঙ্গাতীরস্থিত স্নানের ঘাটগুলি ও নৈদাঘঝটিকা-বৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাস্তব-রসটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সাধারণ জীবনযাত্রার বর্ণনাও তুল্যরূপে প্রশংসার্হ। আধুনিক উপন্যাসে সমস্যাবিশ্লেষণ আমাদিগকে এরূপভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, বাস্তব-বর্ণনাতে আমাদের উৎসাহ ও শক্তি অনেক ম্লান হইয়া আসিতেছে; হয় তাহা আদর্শের উচ্চ-গ্রামের সহিত সমান সুরে বাঁধা, নিরুদ্দেশ যাত্রার গোধূলিরাগরঞ্জিত (idealised) হইয়াছে, নয় তাহার উপর সমস্যার ছায়া, একটা পাণ্ডুর রক্তহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে।"

"গভীরভাবাত্মক অথচ সংযত বর্ণনাতেও বঙ্কিম তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ত।"

"যেখানে মর্মভেদী দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, সেখানেও অশ্রুপ্রাচুর্যের পরিবর্তে একটা সংযত-গম্ভীর বিষাদই তাঁহার প্রকাশের স্বাভাবিক ভঙ্গী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বাক্-সংযমই কুন্দনন্দিনীর পিতার দুর্দশার চিত্রটিকে একটি অসাধারণ অর্থগৌরবে ও করুণ-রস-প্রাচুর্যে ভরিয়া দিয়াছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মেঘান্ধকার নিশীথে কুন্দনন্দিনীর দত্ত গৃহত্যাগ, আষ্টাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর মৃত্যুসংসদে শোকোচ্ছ্বাস, উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কুন্দের অতর্কিত বাক্‌পটুতার বর্ণনাগুলি বঙ্কিমের এই শক্তির উদাহরণ। বঙ্গসাহিত্য সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ-এর স্থান খুব উচ্চ।)

— *(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/* শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫। 'বিষবৃক্ষ' : নামকরণগত সার্থকতা

নামের উদ্দেশ্যে নির্দেশাত্মক, গুণাত্মক নয়। নাম ও নামীকে ভারতীয় দর্শনে অভিন্ন হিসেবে দেখানো হয়। এই অভিন্নতাতেই নাম ও নামীর নামকরণগত সার্থকতা নির্ভরশীল। নাম শুধুমাত্র নামের জন্যে নয়, গুণাত্মক নামকরণের সম্ভাবিত চিন্তা থেকেই নামকরণের সার্থকতা অন্বেষণ করতে হয়। উপন্যাসের লক্ষ্য কাহিনী না চরিত্র, এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও দেখা যায় যে, লক্ষ্যভেদের গুরুত্বে উভয়েই সমমাত্রিক এবং কাহিনি ও চরিত্রের প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের নামকরণ করেন। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থেকে চরিত্রের গতি নির্ধারিত হয়। আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রের প্রাধান্যের জন্য নামকরণ চরিত্রকেন্দ্রিক হয়ে থাকে, আবার 'থীম্' নির্ভর নামকরণও দুর্লভ নয়। 'থীম্' নির্ভর নামকরণ ভাবাত্মক বা সাংকেতিক নামকরণরূপে কথিত হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে উপন্যাসের আবেষ্টন পরিবেশ ইত্যাদি অখন্ড ব্যক্তিত্ব হয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে (যেমন— আরণ্যক, গঙ্গা) দেখা দেয়। এইসব বিভিন্ন সূত্রের উপর নামকরণ নির্ভর করে। শেষপর্যন্ত উপন্যাসের বিভিন্ন সূত্র সমূহের পারস্পরিক টানাপোড়েনেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে 'বিষবৃক্ষ' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদে 'বিষবৃক্ষ কি' শিরোনামে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাধান্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সফল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষ কামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সফল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহবা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৭ সংস্করণ)। বঙ্কিমচন্দ্র আবার বিষবৃক্ষের বর্ণনা প্রদানকালে বলেছেন, "এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল অত্যন্ত বিষময়; যে খায় সেই মরে। *** চিত্তসংযম পক্ষে প্রথমত, চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়ত, চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক।*** চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল।" (পূর্বোক্ত)

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের যে চিত্রাঙ্কন করেছেন সেখানে দেখা যায় নগেন্দ্রনাথ সবদিক থেকে সুখী ছিলেন। তিনি ভাগ্যবান পুরুষ। নগেন্দ্রের রূপ অনিন্দ্য, ঐশ্বর্য অতুল, সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, পরোপকারী, মিতব্যয়ী, স্নেহশীল, কর্তব্যকর্মে অবিচল, ভার্যার প্রতি অনুরক্ত; তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্যে সরল,

আলাপে নম্র, অনুগত্যের প্রতিপালক। এছাড়া তিনি স্ত্রী সূর্যমুখীর অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তবুও এই প্রেমনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ, সকল গুণের আধার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর রূপদর্শনে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হলেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না।' কুন্দনন্দিনীকে দর্শনের পূর্বে নগেন্দ্রনাথ লোভে পড়েননি বা তাঁর অভাব জানতে পারেননি। লোভ সংবরণের অভ্যাস বা শিক্ষা তাঁর হয়নি।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি নায়কের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন বহুগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু কোন একটি ত্রুটির রন্ধ্রপথে তাঁর জীবনে অতর্কিতে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসবে এবং দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। বঙ্কিম-বর্ণিত নগেন্দ্রনাথের চরিত্র ত্রুটি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হওয়ার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যেহেতু তাঁর পূর্বগামী দুঃখের অভিজ্ঞতা ঘটেনি, সেইহেতু তিনি কুন্দনন্দিনীকে দেখে রূপোন্মত্ত হয়েছিলেন। জীবনে প্রলোভনের অবকাশ ঘটেনি এবং তজ্জন্য সংযম শিক্ষার অভ্যাস হয়নি। চিত্তসংযমের চেষ্টা করলেও তিনি প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়ক গোবিন্দলালের অতৃপ্ত রূপপিপাসা ছিল; ফলে জীবনে প্রলোভন আসামাত্র তা বাসনা বহ্নি রূপে প্রজ্বলিত হয়েছিল। ফলে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে গোবিন্দলাল আতপ্ত দেহ সংরাগের পথযাত্রী হলেন। কিন্তু নগেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাঁর সূর্যমুখী 'বাতাসান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্য ভরে দোদুল্যমান।' উপরন্তু তিনি হৃদয়ের প্রেমকে সাধিকার ন্যায় পতির পদে সমর্পণ করেছেন। কুন্দের সৌন্দর্য ও চক্ষুর অপার্থিব শোভা নগেন্দ্রের মধ্যে রূপারতি জাগিয়ে তুলেছিল। সুহৃদ হরদেব ঘোষালকে তিনি পত্রে কুন্দের অনির্বচনীয় রূপ-লাবণ্যের কথা বলেছেন। তাঁর এই বর্ণনার মধ্যে যে কবিপ্রাণ ছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। অথচ কোন রন্ধ্রপথে তাঁর মধ্যে কামনার বীজ দেখা দিল বঙ্কিম তা বিশ্লেষণ করে দেখাননি।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দে প্রেমের রূপায়ণ দেখিয়েছেন। সে নগেন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করলো, কিন্তু স্বল্পস্থায়ী প্রেমের উপরে বজ্রাঘাত নেমে এলো। কুন্দ নগেন্দ্রকে পেলো, কিন্তু তাঁর মন পেলো না। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রের তার প্রতি বিরূপ মনোভাব সে আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারলো। কুন্দ শান্ত ভীরু স্বভাবের। নগেন্দ্রের প্রেমবারি সিঞ্চনের অভাব বিবাহের পরে কুন্দকলি প্রস্ফুটিত হয়নি। কুন্দ উপলব্ধি করেছেন 'সকল সুখেরই সীমা আছে।' নগেন্দ্র সূর্যমুখীর গুণমুগ্ধ হলেও তাঁর মধ্যে আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়নি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে বলেছিলেন যে তাঁর ভালোবাসার নাম আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

সূর্যমুখীর মধ্যে সকল গুণ বর্তমান। তিনি পতিগতপ্রাণা। স্বামী তাঁর নিকটে সর্বস্ব ধন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর সুখের জন্য কুন্দের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু স্বামী-প্রেমের উপর নিঃসপত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

করতে পারেননি। নিষ্কাম কর্মযোগের দীক্ষা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্ল এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে রূপের উন্মাদনা হেতু যে বিষবৃক্ষের বীজ গৃহে উপ্ত হয়েছিল তা চিত্ত সংযমের অভাবে মহাতেজস্বী বৃক্ষরূপে বর্ধিত হয়। অপরদিকে কুন্দ উপলব্ধি করতে পারেনি যে, সকল সুখের সীমা আছে। সুতরাং সেও পক্ষান্তরে এই বিষবৃক্ষের পরিবর্ধনে সহায়ক হয়েছে। হীরা উপন্যাসের গৌণ চরিত্র। সে রূপবতী ও বিধবা কিন্তু দেবেন্দ্রকে দেখে তার কামনা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সে দেবেন্দ্রর ভোগতপ্তবাসনার নিকটে আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং এই উপন্যাসে দেখা যায় যে, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী এবং হীরা সকলেই বিষবৃক্ষ রোপণ করে তার তিক্ত ফল গ্রহণ করেছে ও জীবনকে শোচনীয় পরিণামের দিকে নিয়ে গিয়েছে। এই দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ সার্থক এবং তা ব্যঞ্জনাধর্মী। বিষবৃক্ষের মর্মান্তিক পরিণাম দেবেন্দ্রকেও ভোগ করতে হয়েছে। কামনার প্রমত্ততা এবং অপরিমিত মদ্যাসক্তি হেতু দেবেন্দ্রের সুস্থ স্বাভাবিক মনটি মরে গিয়েছিল। সে নারী সম্পর্কে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগলোলুপ; দেনা-পাওনার জীবানন্দের ন্যায় তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন আকাঙ্ক্ষা সুপ্তাবস্থায় ছিল না। দেবেন্দ্র তার অসংযত লালসা হেতু কুন্দকে লাভ করবার জন্য হীরার ধর্ম নষ্ট করেছে।

মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা অনুযায়ী বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বে গুরু বলেছেন 'এ জীবন লইয়া কি করিব? কি করিতে হয়?' এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে সম্ভবত অধিকার করেছিল। তিনি তাঁর মানসিক দৃষ্টি প্রসারিত করে নরনারীর জীবনকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে তাদের জীবনে প্রবৃত্তির আলোড়ন কি জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং জীবনের পরিণাম আনয়ন করে। এই তত্ত্বগত দৃষ্টির আলোকে তিনি বিষবৃক্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ছিল দ্বৈত সত্তা। একদিকে তিনি সমাজসত্তার নৈতিক মূল্য স্বীকার করেছেন এবং অপরদিকে শিল্পীর নির্লিপ্ত অথচ সহানুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে নরনারীর জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসে কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজসত্তা শিল্পীসত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এর প্রমাণ আমরা পাই উপসংহারের মন্তব্যে, সেখানে তিনি বলেছেন যে বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি গৃহে গৃহে অমৃতফল সৃষ্টি করবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণে তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে তিনি একটি বিশেষ তত্ত্বের আলোক মানবজীবনের পরিচয় ও পরিণামকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। স্বভাবত এর প্রভাব উপন্যাসের আখ্যানে এবং চরিত্রসমূহের পরিণামে প্রতিফলিত হয়েছে। দেবেন্দ্র এবং হীরার ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপে প্রদর্শিত হয়েছে। দেবেন্দ্র অসংযত প্রবৃত্তির দাস। ভোগাকাঙ্ক্ষা তার জীবনের কাম্য। হীরার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির আলোড়ন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সে বালবিধবা, জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার অপরিতৃপ্ত। সুতরাং সে অত্যন্ত সহজে প্রলোভনের মধ্যে আত্মসমর্পণ

করেছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর দৃষ্টিতে তাদের জীবনে আসক্তির আবির্ভাবকে স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য রূপে অঙ্কিত করেন। এতে মনে হয় যে তিনি একটি বিশেষ নৈতিক দৃষ্টির আলোকে তাদের জীবনকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস করেছেন।

সমালোচক মনে করেছেন,— "প্রবৃত্তির অসংযমজনিত আপাতমধুর মিলনের এবম্বিধ পরিণতি দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সুনীতিমার্গে আমাদের উন্নীত করার জন্য 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসটি প্রচারধর্মী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সমাজসংস্কারক নন তিনি স্রষ্টাও। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদ অপূর্ব কাব্যরসমণ্ডিত উপন্যাসের রূপ ধরে আমাদের মনকে একদিকে অনির্বচনীয় আনন্দের সুধারসস্রোতে পরিপ্লুত করে, অপরদিকে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তির উপদেশ দেয়।" (*কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র* / সুধাকর চট্টোপাধ্যায়)

সমালোচকের উক্ত বক্তব্য বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। কেননা, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নামকরণগত সার্থকতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতা উপন্যাসের শিল্পরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। "বিষবৃক্ষ প্রথম যুগের শেষ উপন্যাস। চিত্তশুদ্ধি বা আত্মসংযম সম্পর্কে যে নীতি বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার করিয়াছেন এই উপন্যাসে তাহার সূচনা আছে। বিষবৃক্ষ নামই তাহার পরিচয়।" (বঙ্কিমচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ'। শিল্পক্রিয়ার এই নৈতিক সংজ্ঞায় তাঁর উপন্যাস বিচার করলে দেখা যায়— "তাঁহার উপন্যাসগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা হইয়াছে, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাস্রোতের পারম্পর্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং চরিত্রগুলিকে এমন পটভূমিতে স্থাপন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে যে তাহাদের জীবন আলেখ্য হইতে সহজেই একটি নৈতিক সত্য প্রতিভাত হয়। *** শিল্পকলার এই নৈতিক ব্যাখ্যা তাঁহার শিল্পক্রিয়াকে স্বাভাবিক গতিধারায় প্রবাহিত হইতে দেয় নাই।*** ইহাতে তাঁহার সামঞ্জস্য-সংস্কার আদর্শের স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"। (বঙ্কিম মানস / অরবিন্দ পোদ্দার)।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। শিল্পী এখানে নামকরণের মাধ্যমেই যেন নৈতিক আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। উপন্যাসের ঊনত্রিশংতম পরিচ্ছেদে 'বিষবৃক্ষ কি' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র যে তাৎপর্যের উপস্থাপনা করেছেন, তার দ্বারা বিধবা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ এবং কুন্দর আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণতি সমর্থন ও সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম স্ত্রী সূর্যমুখী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রিপুর তাড়নায় নগেন্দ্র কুন্দর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল; আর কুন্দও বিধবা হওয়া সত্ত্বেও চিত্তসংযমের অভাবের জন্য সমাজধর্মের বিধান না মেনে নগেন্দ্রকে ভালবেসেছিল। 'বিষবৃক্ষ' রচনার উদ্দেশ্য ছিল বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক আন্দোলন উপলক্ষে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিপাদন করা। তাঁর বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত

মতবাদের সংশয়হীন প্রকাশ আছে তাঁর 'সাম্য'-তে— যা বেশ কয়েক বছর পরে রচিত। সেখানে তিনি বলেছেন, "বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে,*** তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। *** পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীনগণ বিবাহ হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।" বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির খাতিরে বিধবাদের বিবাহের অধিকার স্বীকার করলেও সামাজিক নীতিবোধের মানদণ্ডে অস্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ সাধবী স্ত্রী 'রজনী' উপন্যাসের লবঙ্গলতিকা। কুন্দ সেই সনাতন আদর্শবিচ্যুতা বলে তার ভালবাসা আন্তরিক হলেও তা 'পাপাচার','আর পাপাচার বলিয়াই ইন্দ্রিয়-দহন-সঞ্জাত।' নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দর ভালোবাসা অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকেই কুন্দ এমনভাবে চিত্রিত যে যেন একটা পাপচেতনা তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, সাহিত্যকে নিম্নসোপান করে ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করাতে হবে। তাঁর মতে, মানবিক সম্পর্ক ধর্ম-সম্পর্কে রূপান্তরিত হলেই তা সার্থক হবে। ফলে তাঁর মনে হয়েছিল, নগেন্দ্র কুন্দকে ভালোবেসে অধর্মাচরণ করেছিল, সুতরাং তার ফলভোগ করতে হবে; নৈতিক অনুশাসন দ্বারা তাঁর অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অথচ উপন্যাসের ঘটনাক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের সহানুভূতি ও উদার মনোভাব নতুন ভাবে যেমন কুন্দকে সৃষ্টি করে তুলছিল, তেমনি নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের অনুরাগও তাঁকে নতুন করে তুলছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিম শিল্পীরূপে এ অনুভূতিকে গুরুত্ব দেননি; কেননা তাঁর মধ্যে নীতিবাদী বঙ্কিমের সত্তা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া নগেন্দ্র-সূর্যমূখীর সম্পর্ক যে ক্রমশ প্রাণহীন গতানুগতিক ধারায় পরিণত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্যও উপেক্ষা করেছেন। কুন্দর বা কুন্দ নগেন্দ্র সম্পর্কের ট্র্যাজেডি সামাজিক আচলায়তনের জন্য সার্থক পরিণতি লাভ করেনি। কুন্দর ট্র্যাজেডি বা কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের ব্যর্থতার কারণ সনাতন নৈতিক আদর্শ; যা বিরুদ্ধাচরণ করা, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে পাপাচারে মগ্ন হওয়া। আসলে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নীতিবাদী বঙ্কিমের জয় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে অধিক প্রতিফলিত। তাঁর সহনশীলতা শিল্পরূপকে ক্ষুণ্ণ করেছে। শিল্পীর অনুভূতিকে সত্যকে মর্যাদা দানের জন্য অথবা নিরপেক্ষভাবে প্রবাহকে অনুসরণ ও রূপায়িত করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' রচনা করেননি; প্রচলিত নৈতিক সত্যকে রূপায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি 'বিষবৃক্ষ' রচনা করেছিলেন। বক্তব্যের সপক্ষে উপন্যাসে আরও দুটি মন্তব্য পাওয়া যায়—

১. 'বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে।' (৩৭ পরিচ্ছেদ)।

২. 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' (৫০ পরিচ্ছেদ।)

এ সমস্ত সত্ত্বেও কিন্তু আর একটি ভাবনা থেকে যায়— "বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আসলে একটি আধুনিক একটি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এটা নতুন জিনিস— বাঙালীর চেতনারও এক নব্য মানবচেতনা। ধনী জমিদার নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী

সূর্যমুখী। কুন্দকে ভালোবেসে সে বিয়ে করল।*** নগেন্দ্র একে পাপ বলে মনে করছে। নিজের অসংযত হৃদয়ের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে।*** নগেন্দ্রের গল্পে কিন্তু দাম্পত্য জীবনে একনিষ্ঠ না-হওয়াকে পুরুষ অপরাধ জ্ঞান করেছে।*** নগেন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়েতে সমাজ বিরূপতা দেখায়নি, নগেন্দ্রের চিত্ত দংশনক্ষত হয়েছে। এখানেই নতুন আধুনিক মানুষের জন্ম। নারীর প্রতি প্রেমে পুরুষেরও একমুখিতাকে আদর্শ ও অবশ্য পণ্য মনে করার মধ্যে সনাতনী নীতিবোধের বিনাশ। বিদ্যাসাগরে যা ছিল সমাজসংস্কার আন্দোলন, বঙ্কিমে তাই ব্যক্তিগত চেতনা। বিষবৃক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যবোধে স্থিত নতুন সামাজিক পুরুষের আবির্ভাব।"

(বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড / ক্ষেত্রগুপ্ত।)

৬। বিষবৃক্ষ : ট্র্যাজেডির স্বরূপ : নিয়তি বনাম চারিত্রিক ত্রুটি

১. "The true sense of tragedy is the deeper insight that it is not his individual sins that the hero atones for, but original sin, ie, the crime of existense it self." — Schopenhauer

২. "Tragedy, then, is simply one fruit of the human instinct to tell stories, to reproduce and recast experience. And since experience is often sad, so are its copies" — F. L. Lucas

৩. "Tragedy might be defined as the poetic imitation of a coherent series of particular events, (forming a complete action) : an invitation which shows us man is a state of suffering, and which has for its and to excite our pity"

[*European Theories of Drama* : B. B Cark.]

৪. "সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপর শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে— কুন্দনন্দিনী তো এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্যমাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল— মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;— আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুদ্ধ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রিমাত্র দেখিতে পাইলাম— বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম— ইহাই ট্র্যাজেডি।" *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (অচলিত সংগ্রহ, ২)*

মানবজীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য গ্রিক-ট্র্যাজেডি ও রোমান্টিক-ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হলেও উভয় ট্র্যাজেডির সাধারণ ধর্ম মূলত এক— মানুষের দুঃখময় জীবনের ইতিবৃত্ত। তবে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে নিষ্করুণ দৈব বা নিয়তির তাড়নায় মানুষের ভয়াবহ সর্বনাশ, সেখানে মানুষ অসহায়, জ্ঞাতসারে অন্যায় বা পাপ না করলেও নিয়তির অমোঘ বিধানে অসহায় মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে আসে। আর রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে মানুষের দুঃখভোগ ও তার মহতী বিনষ্টি তারই অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তির বশে বা দুরতিক্রমনীয় স্বভাবগত দুর্বলতায়— সঠিক সিদ্ধান্ত না দিয়ে কোনও কাজ করার ফলে। আধুনিক যুগের মানুষ জীবনের দ্বন্দ্বে অধিকতর বিশ্বাসী বলে রোমান্টিক ট্র্যাজেডির (বা শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি) ধারাই বর্তমানে বিশ্বসাহিত্যে অনুসৃত। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও তার ব্যতিক্রম নয়। আর বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই ট্র্যাজেডি-চেতনার অসামান্য বৈভব প্রকাশিত— যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনন্য গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণত পুরুষের রূপজ মোহের চিত্র অঙ্কিত হয় এবং সেই রূপজমোহ পুরুষের ধ্বংস আনয়ন করে। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই রূপজমোহের চিত্রাঙ্কন করেছেন কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপজমোহের আসক্তিতে নগেন্দ্রনাথের ধ্বংস প্রত্যাশিত ছিল; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত পরিপূর্ণ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেলেন পত্নী সূর্যমুখীর সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রেমের দ্বারা। অপরদিকে রূপজমোহাসক্তির উৎস কুন্দনন্দিনীর ট্র্যাজেডি ঘটল তার প্রতিকূল নিয়তিও জটিল পরিস্থিতির জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সমগ্র উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর ট্র্যাজেডি অঙ্কন করেছেন।

উপন্যাসের সূচনাতেই কুন্দর নিঃসীম রিক্ত মূর্তি— তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুন্দের পিতার মৃত্যু ঘটেছে এবং সেখানে ঔপন্যাসিক কুন্দের নিঃসহায় অবস্থার এক মর্মবিদারী চিত্রাঙ্কন করেছেন : "কুন্দ একবার মনে করিল পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু— কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না। ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে সেখানে তাঁহার শব পড়িয়া ছিল, সেইখানে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল।" পিতার মৃত্যুতে তার জীবন সহায় সম্বলহীন হবে মনে করে কুন্দ পিতার মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। মর্মান্তিকভাবে করুণ এই চিত্রের চরিত্র কুন্দকে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সমস্যাকীর্ণ পথে এনে দাঁড় করালেন। কুন্দর নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রার শুরুর প্রাক্কালে জননী কর্তৃক স্বপ্ন প্রদত্ত হল যেখানে তিনি একটি পুরুষ ও একটি নারীর চিত্র দেখিয়ে জানালেন : "এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।" কিন্তু শেষপর্যন্ত অদৃষ্টতাড়িতা কুন্দকে নিয়তিনির্দিষ্ট পথে নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রা করতে হল; যদি কুন্দ বুঝেছিল স্বপ্নে দৃষ্ট পুরুষই আসলে নগেন্দ্রনাথ— যাঁর সান্নিধ্য অশুভফলপ্রদ, সুতরাং পরিত্যাজ্য। নগেন্দ্রের কারুণ্য মণ্ডিত মুখ মণ্ডল ও লোকবৎসল চরিত্র তার কোনো ক্ষতি করবে— এমন বিশ্বাস সে করতে পারল না। "এইখানেই কুন্দের ট্র্যাজেডিতে তাঁর চরিত্রের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এখানেই বঙ্কিমের ট্র্যাজেডি চেতনায় শেক্সপীয়রীয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।" (বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি চেতনা/জীবন মুখোপাধ্যায়)। অবশেষে সপ্তম পরিচ্ছেদে কুন্দ নগেন্দ্রের গোবিন্দপুরের বাড়িতে এলে সেখানে হীরাকে তার দাসী নিযুক্ত করা হল। এই হীরাই সেই স্বপ্নেদৃষ্ট 'পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী'। অদৃষ্টের অমোঘ ষড়যন্ত্র আর কুন্দর রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা তাকে ট্র্যাজেডির অমোঘ অনিবার্যতায় অভিষিক্ত করল। নগেন্দ্রনাথের প্রতি কুন্দনন্দিনীর বা কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপজমোহের আকর্ষণ ট্র্যাজেডি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে দেবেন্দ্র চরিত্রের অবতারণা করলেন— যে দেবেন্দ্র কুন্দের রূপমুগ্ধ : "দেবেন্দ্র তাঁহার (কুন্দের) নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্বশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে

শোভা আর ভুলিলেন না।" কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের রূপজমোহ তাঁর চরিত্রে বিপুল পরিবর্তন আনল; নগেন্দ্র মদ্যপান শুরু করলেন, তাঁর চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হল। হরদেব ঘোষালকে লিখলেন, 'আমি অধঃপাতে যাইতেছি।' নগেন্দ্রের অবস্থা উপলব্ধি করে সূর্যমুখী ননদিনী কমলমণিকে তা জানালে, কমলমণি কুন্দকে প্রশ্ন করে নগেন্দ্রের প্রতি তার গভীর অনুরাগের খোঁজ পেলেন। কিন্তু বিধবা কুন্দের ও বিবাহিতা নগেন্দ্রের প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করে কমলমণি কুন্দকে কলকাতা যেতে বললেন। নগেন্দ্রের মঙ্গল, সূর্যমুখীর মঙ্গল বুঝতে পারলেও কুন্দনন্দিনী নিজের মঙ্গল উপলব্ধিতে অক্ষম। প্রেমের অচরিতার্থতার ফলে কুন্দ স্বীয় জীবন সমস্যার সমাধান অন্বেষণে যখন তৎপর তখন তার মনে পড়ে গেল মাতৃপ্রদত্ত স্বপ্নাদেশ; আর সেই মুহূর্তে কুন্দ সরোবরে নামতে শুরু করে। কিন্তু নগেন্দ্র তাকে নিরস্ত করে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন; কুন্দ সম্মত হলো না। কেননা, নগেন্দ্রের যা ছিল মোহ, কুন্দর কাছে তা ছিল প্রকৃত প্রেম। 'প্রেম অনির্বাণ আলো, ইচ্ছামত তাকে প্রসারিত বা নির্বাপিত করা যায় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের শক্তি প্রেমেরই থাকে— ট্র্যাজেডি প্রেমেরই ঘটে। কুন্দ সেই প্রেমের ট্র্যাজেডির নায়িকা।'

কুন্দর জীবনপথ আবার ভিন্ন পথে ধাবিত; হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে দেবেন্দ্রের আগমন, কুন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ, গান শোনানো ইত্যাদি তথ্য হীরাদাসীর মাধ্যমে অবগত হয়ে সূর্যমুখী 'চরিত্র ভ্রষ্টতার অপরাধে' কুন্দকে গভীর রাত্রির ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন। কুন্দ নিয়তিনির্দিষ্ট হীরার গৃহে আশ্রয় লাভ করল; দেবেন্দ্র কুন্দর প্রতি মুগ্ধ ও লোভী— দেবেন্দ্র আবার হীরার প্রণয়াস্পদ, সুতরাং কুন্দর প্রতি হীরার প্রবল ঈর্ষা, হীরা ষড়যন্ত্র করে নগেন্দ্রকে সূর্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলল; নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে সন্ধানের জন্য দেশদেশান্তরে গমনের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। হীরার গৃহে বন্দী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের জন্য বিরহকাতরা হয়ে পড়ল; কুন্দর লজ্জা প্রণয়ের কাছে পরাভূত হল— "সেই লজ্জা স্রোতের উপরে প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল।" সূর্যমুখী স্বামীর চিরসুখের আশায় বিধবা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ প্রদান করে গৃহত্যাগ করলেন। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলে নগেন্দ্র চতুর্দিক অন্ধকার দেখলেন। কুন্দের প্রতি ছিল তাঁর প্রেম; আর সূর্যমুখীর প্রেম ছিল সূর্যের আলোকের ন্যায়, যা নগেন্দ্রকে পরিপুষ্ট করত। ফলে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহের পর থেকেই শুরু হল কুন্দের জীবনের দুঃখের দিন— যে সংস্রব কুন্দের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তাকে বরণ করেই কুন্দের জীবনে ফুটে উঠল ট্র্যাজেডির সহস্রদল পদ্ম। নিয়তির এই ট্র্যাজিক লীলা তাকে দ্রুতগতিতে অনিবার্য বিধ্বংসী বিনষ্টির পথে নিয়ে গেল।

কুন্দকে নিয়ে নগেন্দ্রের ভাবনা বা আনন্দ ছিল না; কুন্দ সংসারে উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, অবহেলিতা। এমনকি নগেন্দ্র তাকে একথাও জানালেন যে তার জন্যই সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছে। ট্র্যাজিক জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতায় কুন্দের উপলব্ধি হল যে, সকল সুখেরই

সীমা আছে। নগেন্দ্র জয়দেব ঘোষালকে জানালেন যে, কুন্দ তাঁর চক্ষুশূল। সূর্যমুখীহীন সংসারে বীতশ্রদ্ধ ও বেদনার্ত নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করলে কুন্দনন্দিনী বুঝলেন, নগেন্দ্রের মোহাগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া তার জীবনের চূড়ান্ত ভুল। নগেন্দ্রের কাছে কুন্দনন্দিনীর এই প্রয়োজনহীনতা তাকে লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ করতে লাগল। কুন্দনন্দিনীর এই ট্র্যাজিক অবস্থার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, *** তেমনি কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।"

অতঃপর নগেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন আপন গৃহে এবং সূর্যমুখীরও প্রত্যাবর্তন সেই একই দিনে; উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। আর কুন্দনন্দিনী মর্মান্তিক পীড়ায় রোদন করল। স্বামীদর্শন লালসায় অধীরা কুন্দের মর্মচ্ছেদী রোদন; অবশেষে স্বপ্নে কুন্দনন্দিনীর জননীদর্শন এবং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ— কেননা, 'আশার সমস্ত আকাশই তো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল।' কুন্দনন্দিনীর আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের জন্য হীরাদাসী মৃত্যুর পান পাত্র নিয়ে এগিয়ে এল। কুন্দকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করাই ছিল হীরার উদ্দেশ্য— 'আমার যদি তোমাকে সহিতে হইত তবে এতদিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।' কুন্দর কর্ণকুহরে 'আত্মহত্যা' কথাটি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। বিষের মোড়ক কুন্দর সামনে— "প্রাতঃকালে নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর পুনর্মিলন উপলক্ষে যখন মঙ্গলজনক শঙ্খ ও হুলুধ্বনি উঠছে, ঠিক তখনই নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত কুন্দ হীরা প্রদত্ত বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। মঙ্গলের পরিবেশকে ছাপিয়ে উঠল এই অমঙ্গল— নগেন্দ্র সূর্যমুখীর মিলনকে ছাপিয়ে উঠল কুন্দর ট্র্যাজেডি'। *(বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি তথা/ পূর্বোক্ত)*

'ট্র্যাজেডির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই আনন্দের সুরে আখ্যায়িকাটি শেষ হইতে দিলেন না। তাঁহার নির্মম বিচারে একটি বলিদানের প্রয়োজন হইল, এবং চির উপেক্ষিতা, অভাগিনী কুন্দনন্দিনী এই বর্ণনার জন্য নির্বাচিত হইল। বিষবৃক্ষের ফল এতদিনে সত্যসত্যই ফলিল এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের ন্যায় গ্রন্থকারের কার্যকারণ শৃঙ্খলার অমোঘ গ্রন্থিবন্ধনে এই গরল কুন্দনন্দিনীরই উদরস্থ হইল। কিন্তু যে তরঙ্গ আসিয়া কুন্দকে মৃত্যুতে অতল গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তাহার কোমল লজ্জা সংকুচিত হৃদয়ের নিজ প্রেরণা হইতে আসে নাই, তাহা নিকটবর্তী একটি পঙ্কিল আবর্ত হইতে ঈর্ষা ফেলিল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের রূপেই তাহার উপর আপতিত হইল।" *(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।*

উপন্যাসে কুন্দর ট্র্যাজেডির মূলে ভাগ্য যেমন, তেমনিতার চরিত্র ও জটিল পরিস্থিতিও বিরাজিত। স্বপ্নের নির্দেশের বিরোধিতা করা এবং অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার প্রবণতায় পরিস্থিতির জটিলতার জন্যই কুন্দর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্র অনন্য সাধারণ কুশলতায় কুন্দের নিয়তি ঘটিত ট্র্যাজেডিকে চরিত্রঘটিত ট্র্যাজেডিতে উন্নতী

করেছেন। আর তার জন্য হীরা দেবেন্দ্র উপকাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। হীরা ও দেবেন্দ্র চরিত্রেও ট্র্যাজিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চরিত্রগত অগভীরতার জন্য সে ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। হীরা চরিত্রে ট্র্যাজেডির উপাদান থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগত রূপায়ণের জন্য সে শ্রদ্ধা বা সভানুভূতি উদ্রিক্ত করে না। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে মূল ট্র্যাজেডি হল কুন্দনন্দিনীর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়তায় মর্মবিদারী উপাখ্যান— যা করুণরসের সহায়ক, আর তার মৃত্যুতে পাঠক হয় ভয়ার্ত ও বিহ্বল। চিত্তে জাগে করুণা ও ভীতি মিশ্রিত ভাব— যা গ্রীসীয় ও শেকসপীয়রীয় ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। 'বিষবৃক্ষের' ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। 'বিষবৃক্ষের' ট্র্যাজেডি হল পতঙ্গবৃত্ত ব্যক্তির জ্বলন্ত বহ্নিরাশিতে প্রবিষ্ট হওয়ার ট্র্যাজেডি।

৭। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে প্রেমের ত্রিভুজ রূপ

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্কিমমানসে সমাজের নীতি-দুর্নীতির যে প্রশ্নই থাকুক না কেন, শিল্পী-মনই প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পী বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্র রূপ, মানসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রেমের পরিণতির রূপ দেখিয়েছে।

এই উপন্যাসের নায়ক সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ নগেন্দ্রনাথ দত্ত। একদা নৌকারোহণে তাঁর কলকাতা যাত্রাকালে তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন 'ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিও না,' নগেন্দ্রনাথ সেকথা স্মরণ করে প্রকৃতির ঝড় এড়াতে গিয়ে নিয়তি কর্তৃক আয়োজিত অত্যন্ত প্রবল হৃদয় ঝটিকায় নিক্ষিপ্ত হলেন। অন্যদিকে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী কুন্দনন্দিনী পিতৃহারা হয়ে স্বপ্নাবস্থায় পরলোকগতা মাতা কর্তৃক প্রদর্শিত একজন দেবনিন্দিত পুরুষ ও একজন শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা নারীমূর্তি দেখলো। তার মা এই দুজনের সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দিলেন। এতে কিশোরীর জীবনে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠবে তার পূর্বভাস পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীকে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠলো তা পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে।

নগেন্দ্রনাথ প্রকৃতির ঝটিকাবর্ত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নদীতীরে যে গৃহে আশ্রয় নিলেন সেখানে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনাথিনী কুন্দকে আশ্রয়দানের মানসে তিনি কুন্দকে এনে ভাগিনী কমলমণির গৃহে রাখলেন। এখানেই তাঁর হৃদয়ে চিত্তবৈকল্যের বীজ উপ্ত হলো। প্রথম যৌবন সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্বের মাধুর্য ও সরলতা নগেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। সুহৃদ হরদেব ঘোষালের কাছে তিনি যে পত্র দিয়েছেন তাকে কুন্দের রূপে মুগ্ধ নগেন্দ্রের হৃদয়ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পত্রে স্বচ্ছ সরোবরে ভাসমানসদৃশ কুন্দের চক্ষু, তার অপার্থিব সৌন্দর্য ও সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাবাবিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চন্দ্রকর বা পুষ্পসৌরভকে শরীরী করে কুন্দের দেহসৌন্দর্য যেন প্রকাশিত ও তার ভাবাভিব্যক্তি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতের তুল্য। কুন্দের পদ্মসদৃশ চোখ দুটি দেখলে হরদেবও যে তাঁর মতিস্থৈর্য হারাবেন, এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে নগেন্দ্রনাথ তাঁর আলোড়িত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছেন।

কমলমণিকে সূর্যমুখী পত্রে লিখেছেন যে, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছেন। কুন্দের বয়স বর্তমানে সতেরো-আঠারো, রূপলাবণ্যে তার দেহ পরিপূর্ণ। সূর্যমুখী লিখেছেন— 'পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।'

কমলমণিকে লিখিত সূর্যমুখীর পত্র থেকে আরো জানা যায় যে, নগেন্দ্রনাথ চিত্তকে আপন বশে আনবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেছেন, কিন্তু সেই অসামান্য রূপবতী নারীর প্রভাব তিনি কোনক্রমে এড়াতে পারেননি, তাঁর মন থেকে মুহূর্তের জন্যও কুন্দনন্দিনী মুছে যায়নি। সূর্যমুখীর প্রতি তাঁর অত্যধিক সমাদর হৃদয়ের

আলোড়নকে ব্যক্ত করে। শিল্পী বঙ্কিম নগেন্দ্রর চরিত্রের যে পরিবর্তন তা তাঁর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শিল্পসম্মত পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রথমে চিত্ত সংযমের প্রবল প্রয়াস, তারপরে ধাপে ধাপে চরিত্রের পরিবর্তন তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এনেছে। ক্রমে নগেন্দ্রের মদ্যাসক্তি, দুর্গত ও পীড়িত প্রজাদের প্রতি দুর্ব্যবহার, সূর্যমুখীর সঙ্গে ব্যবহারের বিরূপতা, সূর্যমুখীর বালির বাঁধ ভেঙে দিল। নিদাঘকালের প্রদোষকালে মতো নগেন্দ্রের চরিত্র মেঘাবৃত হলো।

কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তার মানসিক বিপর্যয়ের চিত্র অশ্রুজলের ধারায় কমলমণির কাছে ব্যক্ত হলো। সূর্যমুখীর সোনার সংসার যাতে রক্ষা পায় সেই উদ্দেশ্যে কমলমণি কুন্দকে তার সঙ্গে যেতে বললো, কুন্দও অসম্মতি জানালো না। 'নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল'। উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র-কুন্দের পারস্পরিক প্রেমের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কুন্দের মরতে দ্বিধা, নগেন্দ্রের নাম উচ্চারণে আনন্দ, কমলমণির সঙ্গে স্থানত্যাগের সংকল্প পরিহার, মাতৃমূর্তির আবির্ভাবের কথা স্মরণ, নগেন্দ্র কর্তৃক অঙ্গ -স্পর্শ, তাঁর হৃদয়ভাবের প্রকাশ, নগেন্দ্র কর্তৃক কুন্দের কাছে বিবাহের প্রস্তাব, তাদের কাছে এনেছে।

কুন্দনন্দিনীর জীবন নগেন্দ্রময় হলেও সূর্যমুখীর উপকারের কথা সে ভুলতে পারে না। মানসিক এই সঙ্কট মুহূর্তে নগেন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। তাই নগেন্দ্রনাথের বিবাহ প্রস্তাবে সে সম্মতি জানতে পারলো না; কেন না সূর্যমুখীর ক্ষতি, সংসারের অনেকের ক্ষতির কারণ সে হতে চাইলো না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহবশে সূর্যমুখী কুন্দকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন। হীরার গৃহে কুন্দ আশ্রয় পেলো। এই ঘটনা নগেন্দ্রের মধ্যে রোষাগ্নি প্রজ্বলন করলো। সূর্যমুখীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কঠোর ভাষায় ব্যক্ত হলো 'তোমাতে আমার আর সুখ নাই— আমি তোমার অযোগ্য স্বামী।' 'আমি অন্যগত প্রাণ হইয়াছি।' ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যা এস্থলে আরো জটিল আকার ধারণ করলো। নগেন্দ্রনাথ দেশান্তরে যাবার সংকল্প জানালে সূর্যমুখী তাঁকে একমাস অপেক্ষা করতে বললেন। হীরার গৃহে আশ্রয়প্রাপ্তা কুন্দও প্রণয়াবেগে তাড়িত হয়ে আবার সূর্যমুখীর গৃহে ফিরে এলে সূর্যমুখী তাকে গ্রহণ করে স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। সূর্যমুখী আপনার সম্পদকে কুন্দের হাতে তুলে দিলেন স্বামীর মুখ চেয়ে। নগেন্দ্র এই বিয়েতে খুশী হলেন। তিনি শ্রীশকে লিখিত পত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা, তাঁর সন্তান লাভের জন্য পুনর্বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও সূর্যমুখীর উদ্যোগে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তা নিন্দনীয় নয়, একথা জানালেন। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদারের প্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। সমাজ ভীতি তাঁদের ছিল না। তাই নগেন্দ্র গর্বভরে শ্রীশচন্দ্রকে জানিয়েছেন, 'যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি'?

কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহের পরে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রের মনে অনুশোচনা জাগালো। বিবাহের পনেরো দিনের মধ্যে নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি মোহ কেটে গেল।

সূর্যমুখীর চিন্তা এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করলো যে, তিনি কুন্দের মুখদর্শন পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না। প্রচণ্ড আঘাতে নগেন্দ্র জেগে উঠলেন বটে, কিন্তু মনের ভারসাম্য তাঁর আর ছিল না। হরদেব ঘোষাল তাঁকে লিখেছিলেন 'ভালোবাসার কখন অযত্ন করিবে না, কেন না ভালোবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ।' — একথা জেনেও তিনি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করতে পারলেন না। সূর্যমুখীর অনুসন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। সূর্যমুখীর গৃহে প্রত্যাবর্তন ও নগেন্দ্রের সঙ্গে বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন, দেবেন্দ্র কর্তৃক লাঞ্ছিতা ও প্রতিশোধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হীরার প্ররোচনায় ভাগ্যবিড়ম্বিতা, উপেক্ষিতা কুন্দের বিষপান ও মৃত্যু, প্রেমের ত্রিভুজ সমস্যার সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর বহুপ্রতীক্ষিত মিলনের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু উভয়ের মধ্যে যেন এক ভেদরেখা অঙ্কিত করলো।

প্রথমনাথ বিশী তাঁর 'বঙ্কিমসরণী' গ্রন্থে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দুটি ত্রিভুজ লক্ষ্য করেছেন : "বিষবৃক্ষ কাহিনীর মধ্যে বৈধ ও অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে গঠিত নরনারীর দুটি ত্রিভুজ আছে। প্রথম ত্রিভুজের তিনটি কোণে সূর্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী। এ তিনের সম্পর্ক অবৈধ নয়, সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ স্বামী-স্ত্রী; কুন্দ বিধবা, কিন্তু বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হওয়ায় এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের বিবাহ ঘটায় তাদের প্রণয়কে চূড়ান্ত ভাবে অবৈধ আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। অপর ত্রিভুজটি বিষময়। তার তিন কোণে দেবেন্দ্র, হীরা ও কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনী দুই ত্রিভুজে সমান। এখানে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত। দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার প্রণয়ে সমবেদনা বোধ করলেও তাকে অবৈধ বলা ছাড়া উপায় দেখি না। আর কুন্দর প্রতি দেবেন্দ্রে আসক্তি, তাকে প্রণয় বলা উচিত নয়, অবৈধ ও হৃদয়হীনতার চরম।" বিচলিত নগেন্দ্র এবং অসহায় ও নিষ্ক্রিয় কুন্দ—পরস্পরের প্রতি নিরন্তর আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। কুন্দকে পাওয়ার আশায় দেবেন্দ্র নানাপ্রকার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত; তার মধ্যে হীরার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করলেও তা বিফলপ্রসূ। দেবেন্দ্রকে হাত করার জন্য কুন্দকে ব্যবহার করে হীরা। অবশেষে হীরা বুঝতে পেরেছে দেবেন্দ্র তাকে ভালোবাসে না; কুন্দকে পাওয়ার জন্য তার মনোরঞ্জন করেছে। তখন 'খণ্ডিতা রমণীর প্রবল প্রণয় পরিণত হল প্রচণ্ড বিদ্বেষে', কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিদ্বেষের লক্ষ্য দেবেন্দ্র হলেও কুন্দকে দণ্ড দিতে হল। হীরার বিশ্বাস হল, কুন্দকে হত্যা করলেই দেবেন্দ্রকে যথার্থ দণ্ড দেওয়া হবে। সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনে যখন সকলেই সুখী, তখন অনাদৃত ও বিস্মৃত কুন্দের সামনে হীরা তুলে ধরল বিষপাত্র। মৃত্যুকামনায় নিরত কুন্দের মৃত্যু পথযাত্রা প্রশস্ত হল।

কুন্দের প্রতি ভালোবাসাকে নগেন্দ্র বলেছেন মোহনিদ্রা। কিন্তু নগেন্দ্রের হৃদয়ে

কুন্দ 'পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি', রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। একে মোহ বলা যাবে না, এ হলো মোহাতিরিক্ত চিত্তের আকস্মিক জাগরণ। সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভক্তি ও পূজা নিবেদন করেছেন। এতে প্রেমিকহৃদয় ভরে ওঠেনি; তাই তিনি কুন্দের ভালোবাসার অভিলাষী ছিলেন। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রের মোহনিদ্রা কাটে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের যবনিকা টানতেন তবে শিল্পের দাবী মিটতো না। শিল্পী বঙ্কিম সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের মিলনের মধ্যে যে বিচ্ছেদের সূচনা করলেন সেখানে ত্রিভুজ প্রেমের পরিণতি শিল্পসম্মত হয়েছে।

৮। বিষবৃক্ষ ● উপকাহিনীর নির্মাণ কৌশল

"উপকাহিনী অর্থে একটি বিশেষ রীতি বা রূপকল্প বোঝায় এবং তা ইংরেজি Sub plot রীতির সমার্থক। উপন্যাস বা নাটকের ক্ষেত্রে উপকাহিনী বিশিষ্ট অর্থে যুক্ত। মূলকাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির সম্পর্ক উপন্যাসের মৌলিক শক্তির উপর নির্ভর করে। *** উপকাহিনির মৌলিক দায়িত্ব প্রগাঢ় কাহিনিটিকে শিল্প পরিণতি দেওয়া। মূল কাহিনিটির সূত্রপাতের পর তাকে বিভিন্ন ঘটনাস্রোত ও বিচিত্র পরিবেশে উপস্থিত করে বিশেষ একটি বা কয়েকটি মানুষের জীবনের পরিচয় দেওয়া উপকাহিনির মুখ্য কাজ। *** বস্তুত কাহিনি ও উপকাহিনি সপ্রাকৃতিক ও স্বজাতীয়। স্বভাবতই কাহিনি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাগুলি উপকাহিনির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। *** উপকাহিনি শিথিল হতে পারে কিংবা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। *** মূলকাহিনীর শিথিলতা বা জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকাহিনির উপর নির্ভরশীল। *** কাহিনির ঐক্য যেমন একটি ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় না— উপকাহিনিরও তেমনি। একাধিক ঘটনাও চরিত্রের সূত্রে গ্রথিত হয়ে বিবর্তিত ও রূপময় হয়ে ওঠে একটি ঘটনা বা চরিত্র এবং সেই ঘটনাগুলি ও চরিত্রগুলির সমন্বয়েই কাহিনির ঐক্য। উপকাহিনি শুধু এই ঘটনামালার অনিবার্য সূত্রই নয় তারও নিজস্ব একটি গতি ও রূপ আছে।" | *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য* / আলোক রায় সম্পাদিত।]

[ক] উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনির একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। এই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস গড়ে ওঠে। কিন্তু এই কাহিনি পর পর কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি নয়, কার্যকারণ ধারায় বিধৃত হয়ে আখ্যানে (plot) রূপান্তরিত হয়। উপন্যাসের কাহিনি আবার একটি মাত্র আখ্যান নিয়ে রচিত হলে তা চিত্তাকর্ষক হয় না। আরিস্টটল বলেছেন, মূল কাহিনীকে পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্য শাখা কাহিনির অবতারণার প্রয়োজন আছে। শাখা কাহিনি একাধিক থাকতে পারে কিন্তু সকল কাহিনিরই লক্ষ্য হবে মূল কাহিনিকে পরিপুষ্ট করা। এই কাহিনির ধারায় জীবনের রূপ ও রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে আমাদের মনে জীবন-জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে। ঔপন্যাসিক আপন প্রতিভাবলে কাহিনি গ্রহণ করে বর্ণনার উৎকর্ষে ও সুপ্রযুক্ত সংলাপের মাধ্যমে জীবনের রূপ ও স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসে মূল কাহিনির সহিত উপকাহিনির গ্রন্থনে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

বিষবৃক্ষের মূল কাহিনি ধারা নগেন্দ্র, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে রচিত হয়েছে। উপকাহিনীর ধারায় আছেন দেবেন্দ্র, হীরা এবং কমলমণি ও শ্রীশ মূল কাহিনির সংলগ্ন ও পরিপূরক। "কমল-শ্রীশ ও সতীশের উপাখ্যান কিন্তু উপকাহিনি হয়ে

ওঠেনি। দুই অধ্যায়ে এদের প্রসঙ্গ স্বাধীন ভাবে কতকটা বিবৃত। সেখানেও কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঘটনা ও মানসবিকাশ প্রদর্শিত নয়। তাকে কৌতুকে মাধুর্যে ও বাৎসল্য রসে পূর্ণ পরিবার চিত্ররূপেই গণ্য করা উচিত। দুটি অধ্যায়ে একই চিত্র। পরিবর্তন বা বিকাশের প্রশ্নই ওঠেনি। ঘটনার সূত্রে মূল কাহিনীকে কোথাও এরা নিয়ন্ত্রণ করেনি। — করতে চেষ্টাও করেনি। মূল ত্রিভুজের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে এদের পারিবারিক প্রীতি বা সমত্বের যোগ, প্রবৃত্তির বন্ধন নেই। কমলকে পেয়ে সূর্যমুখী সংলাপে বা চিঠিতে মন খুলতে পেরেছে। কুন্দের গোপন চিত্তভাব কমলের সস্নেহ জিজ্ঞাসা প্রথম অর্ধচেতন স্তর থেকে সচেতন ভাবনায় উঠে এসেছে। *** অবশ্য কমলদের দাম্পত্য স্বতন্ত্র সুর বাজিয়েছে। তেমনি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবন যন্ত্রণার বিপরীত পটভূমি রূপেও স্থাপিত থেকেছে। তাদের বাৎসল্য নগেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের ঐ বিশেষ শূন্যতার প্রতি নীরব ইঙ্গিত করেছে।" [*বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি* / ক্ষেত্র গুপ্ত]। এদের ছাড়া কয়েকটি গৌণ চরিত্র আছে। এদের মধ্যে দেবেন্দ্রের সুহৃদ সুরেন্দ্র, মালতী গোয়ালিনী এবং হীরার আয়ি উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ঘটনাচক্রে কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে ও ক্রমে নগেন্দ্রের মনে রূপতৃষ্ণা জাগ্রত হবার ফলে কুন্দের প্রতি আকর্ষণে তাদের আনন্দময় জীবনে যে বিপর্যয়ের ঝড় উঠল তা নিয়েই বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মূল কাহিনির অবতারণা। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে সুখী। কলিকাতায় নৌকাযাত্রাকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নগেন্দ্রনাথ এক দরিদ্র পরিবারে আশ্রয় নিলেন। সেইস্থানে মৃত্যুপথযাত্রী পিতার সেবাকার্যে নিয়োজিতা কুন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পিতার মৃত্যুর পর আশ্রয়হীনা কুন্দকে নিয়ে তাকে কলিকাতায় মাসীর গৃহে পৌঁছে দেবার জন্য নগেন্দ্রনাথ যাত্রা করলেন। পিতার মৃত্যুর পর কুন্দকে স্বপ্নে তার মাতা এক সুন্দর যুবাপুরুষ ও এক পদ্মপলাশলোচনা নারীমূর্তি দেখিয়ে তাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। নগেন্দ্রের মধ্যে কুন্দ স্বপ্নে-দেখা পুরুষের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। তার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

অনাথা কুন্দকে নগেন্দ্রনাথ তাঁর ভগিনী কমলমণির গৃহে রাখলেন। স্ত্রী সূর্যমুখীকে নগেন্দ্র পত্র মারফৎ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন এবং প্রিয় সুহৃদ হরদেব ঘোষালের নিকটে যে পত্র দিলেন তাতে কুন্দকে দেখে তাঁর হৃদয় চাঞ্চল্যের কথা অব্যক্ত রইল না। সূর্যমুখী কুন্দের রূপ-গুণের কথা অবগত হয়ে তার সঙ্গে ভ্রাতৃতুল্য তারাচরণের বিয়ে দেবেন বলে স্থির করলেন। তারাচরণ গ্রামে বিদ্যাবত্তার গুণে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিলেন এবং দেবীপুর নিবাসী নগেন্দ্রের জ্ঞাতি দেবেন্দ্রের পারিষদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন।

বিয়ের পরে তারাচরণের বন্ধু হিসেবে দেবেন্দ্রের কুন্দকে দেখবার সুযোগ ঘটল। দেবেন্দ্র কুন্দের 'নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব শোভা' দেখে মুগ্ধ হলেন।

এখানেই উপকাহিনীর নায়ক মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেন। দেবেন্দ্রের এই পদক্ষেপ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। কার্যকারণ ধারায় দেবেন্দ্র চরিত্রের অবতারণা উপন্যাসের ধর্মকে ক্ষুণ্ণ না করে আরো চিত্তগ্রাহী করে তুলেছে।

কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে এলে সূর্যমুখী তাকে আপন ভ্রাতৃজায়া রূপে গ্রহণ করে প্রধানা পরিচারিকাকে তার পরিচর্যার ভার দিলেন। এই প্রধানা পরিচারিকাই হীরা। হীরাকে দেখে কুন্দের শরীর স্বেদাক্ত ও কন্টকিত হলো। কারণ এই রমণীই সেই মাতৃপ্রদর্শিত স্বপ্নের পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামাঙ্গী। কুন্দের মাতা কুন্দকে এর সংসর্গ পরিহার করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উপন্যাসের মূল ধারায় হীরার স্থান নগণ্য হলেও মূল প্রবাহে ক্রমে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে শোকাবহ পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছে।

বিয়ের তিন বৎসর পরে তারাচরণের মৃত্যু হলো। এরপর কাহিনীর যুগ্ম প্রবাহ যুক্তবেণী রচনা করেছে। এই উভয় ধারাকে সংযুক্ত করেছে হীরা।

তারাচারণের মৃত্যুর পর কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে আশ্রয় পেল। 'এতদূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল' ও 'বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।'

দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবীর বেশে কুন্দকে দেখবার লোভে নগেন্দ্রের গৃহে যাতায়াত শুরু করল। বৈষ্ণবীবেশী ও তাঁর গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করল।

এদিকে নগেন্দ্রের অন্তরে কুন্দর রূপলাবণ্য ঝড় তুলল। কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর পত্র থেকে জানা যায় যে তিনি চিত্তকে সংযত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কুন্দ যে তাঁর মনকে অধিকার করেছে তা সূর্যমুখীর চোখ এড়ায়নি। মাঝে শ্রীশ ও কমলমণির কাহিনী একটি স্বতন্ত্র ধারা রচনা না করে মূল কাহিনীর পরিপূরক অংশ রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। বহু গুণসম্পন্ন পুরুষ নগেন্দ্রের জীবন কুন্দময় জীবনে পরিণত হলে তাঁর ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা দিল। বিষয়-আশয় দেখবার আগ্রহ নগেন্দ্রের রইল না। সুবিচারের আশায় প্রজাগণ এলে নগেন্দ্র তাদের ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। তঁর এই পরিবর্তনের কথা তিনিবন্ধুবর হরদেবকে জানিয়েছে 'আমি অধঃপাতে যাইতেছি'।

কমলমণি সূর্যমুখীর পত্র পেয়ে গোবিন্দপুরে এলেন। কুন্দেরও নগেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ কমলমণির দৃষ্টি এড়াল না। কমলের কথায় ও নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থে কুন্দ আপন দুঃখ অন্তরে চেপে রেখে স্থানান্তরে যেতে স্বীকৃত হলেন। বিষবৃক্ষের বীজ তখন সবে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং তার ক্রিয়া যাত্রাক্রমে নগেন্দ্র, সুর্যমুখী, কমলমণি ও কুন্দের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছদে দত্তগৃহে দেবেন্দ্রের পুর্নবার আবির্ভাব ঘটেছে কুন্দকে দেখবার মানসে। বুদ্ধিমতী সূর্যমুখী দেবেন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানবার ইচ্ছায় সেইদিন হীরাকে নিয়োগ করলেন। গৌণ কাহিনীতে এইখানে নায়িকা-রূপে হীরার প্রবেশ ঘটল। দেবেন্দ্রের পরিচয় পেয়ে কুন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা অনুমান করে সূর্যমুখী কুন্দকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন।

কুন্দপতঙ্গ হীরার গৃহে আশ্রয় পেলো। দেবেন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে হীরাকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কুন্দকে ক্রয় করতে চাইল। এই প্রস্তাবে হীরার 'পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল— কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল।' কারণ দেবেন্দ্রের রূপে সে নিজে মুগ্ধ হয়েছিল। তার এই আচরণ দুঃখিনী কুন্দের প্রতি মমতাবোধের জন্য নয়।

হীরা দেবেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট, তার হাতে কুন্দকে তুলে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আবার কুন্দের সাহায্যে সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে অর্থোপার্জনও সে করতে চায়। সকল সুখ-বঞ্চিতা হীরার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা হলো 'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।' কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হীরা নগেন্দ্রের কর্ণগোচর করালো যেন সূর্যমুখী কুন্দকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছেন। এতে বিষবৃক্ষে মুকলের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হলো। নগেন্দ্র অন্তরের কথা সূর্যমুখীর নিকট ব্যক্ত করলেন 'তোমাতে আমার আর সুখ নাই' এবং 'আমি অন্যগত প্রাণ হইয়াছি'। নগেন্দ্রনাথ দেশত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। মালতী গোয়ালিনী কুন্দের হীরার গৃহে অবস্থানের কথা দেবেন্দ্রকে জানাল। কিন্তু দেবেন্দ্রের আগমনের পূর্বে কুন্দ অন্তরের অপ্রতিরোধ্য প্রণয় প্রাবল্যের তাড়নায় নগেন্দ্রের উদ্যানে প্রবেশ করল ও সূর্যমুখী তাকে পুনর্বার গ্রহণ করলেন।

দেবেন্দ্র আপন কার্যসিদ্ধির জন্য হীরাকে উপযুক্ত পাত্রী ভেবেছিলেন কিন্তু হীরার তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্তি থাকলেও সে আত্মসচেতন। সে ভালোবাসার জন্য কলঙ্কের ভয় করে না, কিন্তু বিনামূল্যে সে নিজেকে বিকিয়ে দিতে রাজি নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনে ও অপরাপর জীবনে সর্বনাশকে ঘটিয়ে তুলেছে হীরা।

নগেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য থাকার জন্য এবং নগেন্দ্রের মনোবাসনা অবগত হয়ে সূর্যমুখী আপন অধিকার থেকে যে বঞ্চিত হয়েছেন তা বুঝতে পেরে নিজে উদ্যোগী হয়ে কুন্দ ও নগেন্দ্রের বিয়ে দিলেন। তাঁদের সুখ সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনে ভাঙন দেখা দিল। কুন্দ উপেক্ষিতা হলেন। নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি মোহজাল ছিন্ন হল। তিনি সূর্যমুখীকে ফিরিয়ে আনতে গৃহত্যাগ করলেন।

দত্তগৃহে কুন্দকে পুনরায় দেখতে এসে হীরার ষড়যন্ত্রে দেবেন্দ্র লাঞ্ছিত হলেন। হীরাও নিস্তার পেল না। বিষবৃক্ষে তার ভোগ্য ফল ফলল। দেবেন্দ্র হীরার সর্বনাশ করে পদাঘাতে তাকে প্রমোদোদ্যান থেকে বহিষ্কৃত করল। ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় হীরা এক চণ্ডাল চিকিৎসকের নিকট থেকে সদ্যঃ প্রাণাপহারী বিষক্রয় করল; উদ্দেশ্য হয় দেবেন্দ্র না হয় কুন্দনন্দিনীকে তা ভক্ষণ করানো। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রর যখন পুনর্মিলন ঘটল তখন হীরার প্ররোচনায় কুন্দ ঐ বিষপান করল। এখানেই মূল কাহিনী শেষ হয়ে গিয়েছে।

মূল কাহিনী শেষে বিষবৃক্ষের পরিণাম দেখিয়েছেন। হীরার উন্মত্ততা ও দেবেন্দ্রের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনি সংগতি রক্ষা করেছে ও পরিপূরক হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস আখ্যান পরিকল্পনায় ও মূল কাহিনির সহিত উপকাহিনির সমন্বয়ে এবং আখ্যানের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি প্রদর্শনে শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

হীরা-দ্রেবেন্দ্র উপকাহিনি স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে উঠেছে এবং এই উপকাহিনি উপন্যাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রয়োগ চাতুর্যের বিভিন্ন দিক থেকে হীরা-দেবেন্দ্র উপকাহিনি আলোচনা করলে দেখা যায় :

১। মূল প্রণয়ত্রিভুজের সঙ্গে লালসা-ঘৃণা-ঈর্ষার বন্ধনে আবদ্ধ হীরা ও দেবেন্দ্র মূলকাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়ে কাহিনীকে আরও জটিল করে তুলেছে।

২। হরিদাসী বৈষ্ণবীর জন্য বিতাড়িত কুন্দকে হাত করবার জন্য হীরা তাকে লুকিয়ে দেখেছিল। এই ঘটনা উপন্যাসের গতিপরিবর্তনে সাহায্য করেছে। গোবিন্দপুরের বাড়িতে কুন্দের প্রতি ঈর্ষাজাত ক্রোধে হীরার ব্যবহারে কুন্দের অস্তিত্ব দুর্বিষহ হয়ে উঠলে হীরা কুন্দকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে।

৩। মূল কাহিনীর জন্য হীরা-দেবেন্দ্রর যতটুকু ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ছিল তা অতিক্রম করেছে এ উপকাহিনী। তবে কামনা-লালসা-ঈর্ষায় মিশ্রিত এ উপকাহিনী স্বাধীনভাবে বিকশিত ও ঘনিষ্ঠ তাৎপর্যে জড়িত হয়ে উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে।

[খ] বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কমলমণির প্রসঙ্গ এবং হীরা দেবেন্দ্রের উপাখ্যানের ফলে মূল আখ্যানের ভারাক্রান্ততা, কেন্দ্রগত শিথিলতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসের মূল আখ্যানটি সহজ সরলরেখার মতো ঋজু তীব্র একাগ্র ভঙ্গীতে পরিণতির প্রতি অগ্রসর হয়। কোন কোন উপন্যাসে শাখা প্রশাখার জটিল বিস্তার অর্থাৎ পার্শ্বকাহিনির সাধারণ অবতারণাই এবং উপকাহিনির উপস্থিতি এবং উপকাহিনি ও শাখাকাহিনির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। উপকাহিনি মূল কাহিনির পরিপূরক হয় এবং মূলকাহিনির সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে; কিন্তু এর নিজস্ব বৃত্ত সম্পূর্ণতা শাখাকাহিনিতে থাকে না। পার্শ্বকাহিনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। মূল কাহিনিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির বা সাদৃশ্য অথবা বৈপরীত্যের ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে উপন্যাসে পার্শ্বকাহিনি উপস্থাপিত হতে দেখা যায়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কমলমণি প্রসঙ্গ এবং হীরা-দেবেন্দ্রের উপাখ্যান উপস্থাপিত। কমলমণি প্রসঙ্গকে পার্শ্বকাহিনি বলা চলে কিন্তু তা নিয়ে সংশয় আছে; কেননা, কমলমণি উপন্যাসের মূলকাহিনির অভ্যন্তর চরিত্র, সূর্যমুখীকে সঙ্গদান করে, কুন্দনন্দিনীকে সহানুভূতি দেখিয়ে সে মূল আখ্যানেই যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার তার পরিবার জীবনের চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে নগেন্দ্র সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর কাহিনির অংশ বলে মনে করা চলে না। কমলমণি, শ্রীশ এবং সতীশচন্দ্রের জীবনযাত্রার কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এই কাহিনিটি উপকাহিনির

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়, এমনকি একে পার্শ্বকাহিনি অপেক্ষা পার্শ্বপ্রসঙ্গ বলাই সঙ্গত।

কমলমণির পরিবার জীবনের কৌতুককর বাৎসল্যস্নাত চিত্রটি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে প্রণয়ের প্রখর সূর্যালোকে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ ছায়াপাত ঘটায়নি। সন্তানহীন দুর্মর যৌবন আপন কামনা বাসনাকে শান্ত সংযত করার রীতির সঙ্গে পরিচিত নয়। এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে যোগসূত্র রচনার প্রয়োজনীয়তাবশত বঙ্কিমচন্দ্র কমলমণি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাছাড়া দগ্ধ মরুর শুষ্ক দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ এই উপন্যাসে সরসকৌতুকের উপযোগী দু-একটি অংশের সংযোজন রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির দিক থেকেও প্রয়োজনীয় ছিল। অর্থাৎ মূলকাহিনির গতি পরিবর্তনে বা পরিণতিতে শাখাকাহিনি কোন প্রভাব বিস্তার করেনি; কিন্তু যে কাহিনি 'বিষবৃক্ষ'কে প্রভাবিত করেছে তা হলো হীরা-দেবেন্দ্র কেন্দ্রিক উপকাহিনি। এক্ষেত্রে ত্রিভুজ প্রেম গড়ে উঠেছে একদিকে নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও কুন্দকেন্দ্রিক; অপরদিকে কুন্দ, হীরা ও দেবেন্দ্রকেন্দ্রিক— আকারের দিক থেকেও কাহিনিটি ব্যাপক এবং আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। উক্ত কাহিনিটি মূল ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তবুও মূল উপাখ্যানের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে এর যোগ নিবিড় নয়। কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্যমুখী সমস্যার সূচনা বৃদ্ধি এবং পরিণতি হীরা-দেবেন্দ্র উপাখ্যান ব্যতিরেকেই হয়ত উপন্যাসের অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারত। তবে হীরার বিষপ্রদান, কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা, দেবেন্দ্রের ছদ্মবেশ ধারণ, সূর্যমুখী সংবাদ সংগ্রহ, কুন্দের গৃহত্যাগ, নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ প্রভৃতি অতিদ্রুত পরিণতির দিকে অগ্রসর হত কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলি উপন্যাসের অন্তরঙ্গ যোগসূত্র নিবিড় নয় বহিরঙ্গমাত্র।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরা-দেবেন্দ্রের কাহিনী স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত, উপন্যাসে উপকাহিনির এই স্বাতন্ত্র্য থাকাই স্বাভাবিক; কারণ উপন্যাসের মূলকাহিনি এবং উপকাহিনি নাটকের মূলকাহিনি বা উপকাহিনির মন্ত্রে নয়। উপন্যাসের গঠন তুলনামূলকভাবে শিথিল হওয়া অনুচিত। হীরা ও দেবেন্দ্রের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। ধনীগৃহের পাপী ও লম্পট দেবেন্দ্র অসংযম, ভোগবাসনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফল। তার চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক কুন্দের ভাবপ্রকাশে ইচ্ছুক হলেও ধর্মভাবনাহীন শিক্ষা তার চারিত্রিক অধঃপতনের হেতু— এ চিন্তা তার চরিত্র পরিকল্পনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। পরিহাসচঞ্চল এই যুবাপুরুষটি আপন দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতায় প্রকৃতিগত অসংযমের পথযাত্রী হন এবং পরিহাস সংলাপে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ভাবগম্ভীর পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে তরল করে তোলেন। দেবেন্দ্রের প্রাণাবেগ চঞ্চল জীবনযাত্রা বিষবৃক্ষের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যে দক্ষিণদেশাগত বসন্ত বাতাসের মতো ক্লান্ত চিত্তকে সঞ্জীবিত করে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি তুলনা ও বৈপরীত্যের ভাবপ্রকট করতে প্রয়াসী। নগেন্দ্রনাথ অবৈধভাবে কুন্দের দিকে আকৃষ্ট। তার প্রণয় সামাজিক নীতির দিক থেকে বিস্ময়, এই অসংযম গৃহশান্তি বিনষ্ট করে,

সমাজের স্থিতি বিচলিত করে। যে অপ্রতিহত গতি ও চিত্তাবেগে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর দিকে ধাবিত এবং যে প্রবল কামনায় তাড়িত দেবেন্দ্রনাথ ছদ্মবেশে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করে তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের লালসা শুধুই ভোগবাসনার দিকে, তার হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রশ্ন, বিবেকদংশন বা যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটেনি। তার আচরণ শুধুই ভোগবাদের ধারণাতে পূর্ণ। তার চরিত্রের মাধ্যমে মানব জীবনের এবং চরিত্রের কোন রহস্য প্রকাশিত হয়নি। তার জীবন কাহিনীর মধ্যে হাল্কা পরিবেশের সৃষ্টি করলেও মানবজীবনের এমন কোন দূরবগাহ রহস্য প্রকাশিত হয়নি, যাকে উপন্যাসের বিষয় রূপে গ্রহণ করা চলে। অন্যদিকে নগেন্দ্রের ভোগবাসনা প্রতিমূহূর্তে হৃদয়জগতে সংযম প্রয়াসের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত, প্রতিপদক্ষেপে আগমন এবং পশ্চাদভাবনার দ্বারা বাধাগ্রস্ত, অনুশোচনায় পূর্বকর্ম তিরস্কৃত, যন্ত্রণায় অস্তিত্ব বিদীর্ণ অথচ আত্মসংবরণে চিত্ত অসমর্থ। এইভাবে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা ও মানবচিত্র বিষয়ক রহস্য নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণ গুরুতর মানবিক জিজ্ঞাসা, ব্যক্তিবিশেষের কামনা বাসনা নয়; সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

হীরা চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ। হীরা সূর্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশেই ক্ষীণ মনে করে না দেবেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বে এই গূঢ় আত্মাভিমান ও কঠোর আত্মসংযম তাকে প্রেমের অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করতে শক্তি দিয়েছে। হরিদাসী বৈষ্ণবীর খোঁজে এসে দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং যে প্রেমকে সে এতদিন অস্বীকার করে এসেছিলো প্রথম দর্শনমাত্রই সেই প্রেম তার দেহমনকে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করে বসে। দেবেন্দ্র-হীরার প্রেম— প্রকৃতপক্ষে হীরার প্রেম ও দেবেন্দ্রের অভিনয়। দেবেন্দ্র তাকে দাসী মনে করেই কুন্দের প্রতি তার নিজের গোপন অনুরাগের কথা প্রকাশ করে ফেলে এবং কুন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে তার সহায়তা প্রার্থনা করে। তার মনোমধ্যে একটা বিষম ক্রোধ ও কুন্দের প্রতি বিজাতীয় হিংসা জাগিয়ে তোলে। অতঃপর সময় বুঝে কুন্দ-অস্ত্র প্রয়োগ করে সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটায়। এদিকে দেবেন্দ্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও জটিলতর হয়ে ওঠে। হীরার ওপর দেবেন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু দেবেন্দ্র হীরার প্রকৃত পরিচয় না জেনে একদিন দত্তবাড়ীতে গিয়ে হীরার কাছে কুন্দ সম্বন্ধীয় দুঃসাহসিক প্রস্তাব করতে গিয়ে দারোয়ানদের হাতে অপমানিত হয়। হীরার ওপর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প দেবেন্দ্রও কপট প্রণয়জালে শীঘ্রই লুব্ধচিত্ত ধর্মভয়হীন হীরা মক্ষিকাকে বন্দী করে ফেলে। হীরার আত্মসংযমের ক্ষমতা ছিল সত্য কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। ধর্মভ্রষ্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পদাঘাতে বিতাড়িত হয়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপমানিত হীরা পদাহত সর্পিনীর মতো

ফণা তুলে ধরে। তার আত্মহত্যার ইচ্ছা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে হত্যার সংকল্পে পরিণত হয়। একদিকে প্রবল নৈরাশ্য তাকে উন্মাদাগ্রস্ত করে তোলে, অপরদিকে প্রকৃত শয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি কুন্দের চরম দুঃখের মূহূর্তে তাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে ও তার হাতের কাছে আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে প্রণোদিত করে। হীরার হৃদয়মন্থনজাত ঈর্ষাফেনিল বিদ্বেষ হলাহলই সে কুন্দের মুখের কাছে এনে ধরে এবং কুন্দ সেই বিষপানের ফলেই মরণের পথে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের পরিণতিতে হীরা উন্মাদ, একটা প্রবল ক্রোধানলে দগ্ধ। পূর্বস্মৃতি, অপমানের বৃশ্চিকদংশন, দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ ক্রোধানল তার বিকারগ্রস্ত মনে তুমুল কোলাহল তোলে এবং সবছাপিয়ে তার অতৃপ্ত প্রেম পিপাসায় এক বিষাদ করুণ সুরে বেজে ওঠে। এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকারই তার ঈর্ষাদগ্ধ অভিমান বিকৃত বিদ্বেষ ক্রুর হৃদয়ের অন্তরতম বাণী।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরাকে 'ভিলেন'রূপে দেখা গেছে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত উন্মাদ প্রবৃত্তির জন্য অগ্নি জ্বলেছে সেখানেই হীরা সেই অগ্নিবিস্তারে সহায়তার মন্ত্রণা ও অস্ত্র পৌঁছে দিয়ে ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করেছে। সমগ্র উপন্যাসের পটভূমিকায় হীরার ভূমিকা নগণ্য নয়। হীরা দেবেন্দ্রের কলঙ্কলাঞ্ছিত ইন্দ্রিয় সুখ প্রধান প্রণয় কাহিনিটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র তার অভ্যস্ত সংযম ও মিতভাষিতার সঙ্গে কয়েকটি অর্থপূর্ণ আভাসও সুন্দর প্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। ঊনপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদে যখন মূলকাহিনি সমাপ্ত হয়েছে তখন পঞ্চাশতম পরিচ্ছেদের অবতারণা করে বঙ্কিম উপকাহিনী শেষ করেছেন। এখানে মূলকাহিনিকে কি উপকাহিনি অতিক্রম করে গেছে? প্রকৃতপক্ষে কাহিনীর শেষকথা বলার দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং ঔপনাসিক, হয়তো পাঠকের উপর ভরসা রাখতে পারেনি বলে। তিনি বলতে চেয়েছেন, কুন্দ-নগেন্দ্রের-সূর্যমুখীর সম্পর্ক সামাজিক, কিন্তু হীরা দেবেন্দ্র সম্পর্ক অসামাজিক; সেই অসামাজিক অসংযত জীবনের শাস্তি আরো তীব্র করেছেন। শিল্পী বঙ্কিমের থেকে নীতিবাদী বঙ্কিম প্রকট।

৯। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চিত্রসপ্তক উপস্থাপনার যৌক্তিকতা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপন্যাসের মূল বিষয়কে ব্যক্ত করেন। কখনও তাঁর এই প্রতীক প্রকৃতিজগৎ থেকে, কখনও বা পৌরাণিক সাহিত্যের অঙ্গন থেকে আহৃত হয়। প্রত্যেকটি প্রতীকই বিশেষ সম্ভাবনার সূত্রে উপন্যাসে উপস্থিত হয়ে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মূল ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম সাতটি চিত্রের উপস্থাপনা করেছেন। চিত্র সপ্তক উপস্থাপনার পর পরবর্তী মাত্র ছ'টি পরিচ্ছেদে উপন্যাসের বক্তব্য পরিসমাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসের রস যখন একান্ত ভাবে ঘনীভূত হয়ে প্রায় শেষ স্তরে উপনীত তখন চিত্র সপ্তক একটি বিশেষ তাৎপর্য ব্যক্ত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রূপকার্থে এই চিত্রসপ্তক প্রয়োগ করেছেন।

লেখকের একটি বিশেষ মনোভাব আলোচ্য চিত্রসপ্তক অবতারণার পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল; বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রসপ্তক সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে নিয়েছেন। সঙ্কলিত চিত্র প্রসঙ্গ গুলি হল— (১) তপস্যানিরত মহাদেবের কাছে উমার আগমন ও মদনের শরক্ষেপ। (২) পুষ্পকরথে রামসীতার লঙ্কাত্যাগ। (৩) অর্জুনের সুভদ্রাহরণ। (৪) সাগরিকার আত্মহত্যার উদ্যোগ। (৫) কন্টকাহত হবার ছল করে শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত। (৬) উত্তরার কাছ থেকে অভিমন্যুর বিদায়গ্রহণ এবং (৭) সত্যভামার তুলাব্রত। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে এই চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁদের আদৌ কোনো ধারণা ছিল না। এক অর্থে এই চিত্রগুলি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনের Irony of fate বলা যেতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসের চিত্রসপ্তক সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ এবং কুন্দনন্দিনী সম্পর্কিত জীবন বিপর্যয়কে অর্থান্তরিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রনাথ চিত্র প্রদর্শনের কালে স্মৃতির আলোকে তাঁর ঘটনাবর্তের আঘাত সংঘাতে আবর্ত পূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর জীবনে চিত্রসপ্তকের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার্য। নায়ক-নায়িকার জীবনে এই চিত্রগুলি এক অনতিক্রমনীয় প্রভাব সংক্রামিত করেছে। শিব উমা, রাম-সীতা, অর্জুন-সুভদ্রা, বাসবদত্ত-সাগরিকা, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, অভিমন্যু-উত্তরা, কৃষ্ণ-সত্যভামার যে চিত্রসমূহ নায়ক নায়িকার শয়ন গৃহে স্থান পেয়েছে প্রেমবৈচিত্র্যই মুখ্যত তাদের বিষয়বস্তু; প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি অনুভবের উদ্দেশ্যে আলোচ্য চিত্রগুলি উপন্যাসের মধ্যে অবতারণা করা হয়েছে। চিত্রগুলি ভারতীয় প্রেমাদর্শের প্রতীকও বটে। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর জীবনে দাম্পত্য প্রেমের ভারতীয় উচ্চাদর্শ আলোচ্য চিত্র সপ্তকের অবতারণার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে।

প্রথম চিত্র— বিষয়বস্তু কালিদাস বিরচিত কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত। মহাদেব ধ্যানরত, নন্দী প্রহরী, হরধ্যান ভঙ্গের জন্য নিযুক্ত মদন ও বসন্তপুষ্পাভরণে সজ্জিতা পার্বতী। বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, চিত্রের

বিষয়বস্তু নির্দেশের কালে সূর্যমুখীর স্মৃতিবিজড়িত জীবনের কথা নগেন্দ্রের অন্তরে উদিত হয়েছিল— "তাঁহার মনে পড়িল যে উমার কুসুম সজ্জা দেখিয়া সূর্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্যমুখীকে কুসুমময় সাজাইয়া ছিলেন, ... ইত্যাদি।" এই চিত্রে বসন্ত পুষ্পাভরণা পার্বতীর মধ্যে কুসুমময় সুর্যমুখীর চিত্র প্রকাশিত। কুমারসম্ভবে মন্মথের পুষ্পশরে মহাদেবের চিত্ত বিকার হলে তাঁর কোপানলে মদন ভস্মীভূত হয়েছিল। স্বয়ং মহাদেব স্ত্রীজাতির সন্নিধান পরিত্যাগের জন্য সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। কুন্দনন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট নগেন্দ্রনাথ কামপীড়িত মহাদেবের ন্যায় স্ত্রীজাতির সন্নিধ্যান পরিত্যাগে অভিলাষী। সূর্যমুখীর চরিত্রে পার্বতীর সাদৃশ্য অভিব্যক্ত।

দ্বিতীয় চিত্র — দ্বিতীয় চিত্রের বিষয়বস্তু মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের এয়োদশ সর্গ থেকে গৃহীত। রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করে আকাশপথে প্রয়াণ কালে সীতাকে রত্নাকরের শোভা দেখিয়ে উচ্চারণ করেন— "দূর থেকে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান তমালবন ও তালীবন শ্রেণীতে নীলবর্ণ বনভূমি লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বু রাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় শোভিত।" আলোচ্য চিত্রে শ্রীরাম ও জানকীর গভীর প্রেম ও পবিত্রতা প্রকাশিত। কিন্তু এই চিত্রে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পরবর্তী জীবনের একটি মূলকথাও সূচিত হয়েছে। লঙ্কাযুদ্ধের পর জানকীকে উদ্ধার করেও রাম-সীতা জীবনে যেমন শান্তিলাভ করতে পারেননি; নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর প্রথম যৌবন প্রেমের অবিমিশ্র আনন্দের স্রোত তাঁদের জীবনকে উচ্ছ্বসিত করেনি; কুন্দনন্দিনীর স্মৃতি তাঁদের অন্তরে ব্যথার সুর ধ্বনিত করেছে।

তৃতীয় চিত্র— তৃতীয় চিত্রের বিষয়বস্তু মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনী। কৃষ্ণের রথে আরোহণ করে অর্জুন ও সুভদ্রা পলায়নে উদ্যত হলে যদুবংশীয়গণ কর্তৃক অর্জুন রণে আহূত হন। এই অবস্থায় সুভদ্রা সারথ্য গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দেন। চিত্রটি পতি-পত্নীর পূর্ণ সহযোগিতার অপূর্ব উদাহরণ। কেবল সংসাব ক্ষেত্রে নয়, সমর ক্ষেত্রেও পত্নীর অপূর্ব সহযোগিতায় যে পতি জয়যুক্ত হয় সুভদ্রার সারথ্য তারই নিদর্শন। সুভদ্রা হরণের চিত্র দেখে সূর্যমুখী গাড়ি চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিপদ্‌কালে সুভদ্রার নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা এবং সূর্যমুখীর নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা সমান।

চতুর্থ চিত্র— চতুর্থ চিত্রের বিষয়বস্তু শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটিকা থেকে গৃহীত। সিংহলরাজা তাঁর কন্যা রত্নাবলীকে বৎসরাজ উদয়নের হস্তে সমর্পণের জন্য প্রেরণ করলে সমুদ্রপথে নৌকাডুবি হয় এবং কৌশাম্বীর এক বণিক ঐ কন্যাকে উদ্ধার করে বাসবদত্তার হাতে তুলে দেন। এই কন্যার পরিচয় হয় সাগরিকা নামে। সাগরিকা ও উদয়নের পরস্পর অনুরাগী হলে বিবাহ ও সাগরিকার যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটনে এই কাহিনির সমাপ্তি। প্রাক্-বিবাহ প্রেমের রূপ এবং পূর্বাগের চিত্র প্রকাশিত।

চিত্রটির মূল বক্তব্যে এবং উপন্যাসের বক্তব্য অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। আকস্মিক অগ্নিদাহে বাসবদত্তা ও সূর্যমখীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে ঘটনাগত সাদৃশ্য আছে। সাগরিকাই কুন্দনন্দিনীরূপে প্রতিভাত, সাগরিকা যেন বাসবদত্তার আশ্রিতা কুন্দনন্দিনীও তেমনি সূর্যমুখীর আশ্রিতা। আলোচ্য চিত্রে সূর্যমুখী, নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চম চিত্র— পঞ্চম চিত্রটির মূলে আছে মহাকবি কালিদাসের বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রায় সমাপ্তিতে শকুন্তলার একটি সংলাপ এবং দুটি সখীর সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের কাছ থেকে শকুন্তলার নিষ্ক্রমন। শকুন্তলা দুষ্যন্তের দৃষ্টি থেকে নিজেকে নির্বাসিত করতে বেদনার্ত। তাই কুশাঙ্কুরে চরণতল ক্ষত-বিক্ষত এবং কুরুবক শাখায় বল্কল সংলগ্ন এই ছলনায় কালক্ষেপে উদ্যত। আলোচ্য চিত্রে প্রিয়দর্শনের কামনা এবং কাল্পনিক কুশাঙ্কুর থেকে মুক্তির চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রিয়দর্শন ও মিলনকামনাতে সূর্যমুখীর অন্তর যে নগেন্দ্রনাথের জন্য ব্যাকুল হত তা শকুন্তলার চিত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত। পঞ্চম চিত্রে দুষ্যন্ত পরিত্যক্তা শকুন্তলার সঙ্গে নগেন্দ্র পরিত্যক্তা সূর্যমুখীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ চিত্র— যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত অভিমন্যুর জন্য উত্তরার ব্যাকুলতার চিত্র অভিমন্যুর যুদ্ধগমন এবং যুদ্ধে মৃত্যুবরণ মহাভারতের দ্রোণপর্বে বর্ণিত আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত এই ভাবে নেই। সম্ভবত চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত। রণক্ষেত্রগামী স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় উত্তরার স্পন্দিত হৃদয়ের যে অপূর্ব চিত্র রয়েছে তার ভেতর নারীর স্বভাবসুলভ পতিপ্রেম চমৎকারভাবে প্রকাশিত। সূর্যমুখীর পতিকল্যাণ কামনাও আলোচ্য চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। নৌকাযাত্রায় উদ্যত পতি নগেন্দ্রনাথের জন্য সূর্যমুখীর আকুলতা যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত স্বামী অভিমন্যুর জন্য আবেগাকুল বেদনাবিহ্বল উত্তরার মনোভাবকে সূচিত করে।

সপ্তম চিত্র— সপ্তম চিত্রটির মূলে আছে কাশীদাসী মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত সত্যভামার তুলাব্রতের কাহিনী। নারদের প্ররোচনায় সত্যভামা তুলাব্রত করেন। এই পৌরাণিক চিত্রটির সঙ্গে সূর্যমুখীর স্মৃতি চিরজড়িত। রুক্মিণী যেমন আপন অলঙ্কার মোচন করে সত্যভামাকে দিয়েছেন, সূর্যমুখীও তেমনি কুন্দনন্দিনীর ভোগের জন্য টাকাকড়ি ও সোনারূপা পরিত্যাগ করে পথের কাঙালিনী হয়েছেন। বঙ্কিম অবশ্যই সামাজিক উপন্যাসে একটি রোমান্সের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন এই চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে; চিত্রালীর বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শময় জগত পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করেছে। অভিমানিনী সত্যভামার অভিমানকে কুন্দনন্দিনীর অভিমান এবং রুক্মিণীর নিস্পৃহতাকে সূর্যমুখীর নিস্পৃহতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে আলোচ্য অংশের মূল বক্তব্য সত্যভামার তথা কুন্দনন্দিনীর পরাজয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর অতীত জীবনের সুন্দরালেখ্য 'স্তিমিত প্রদীপে' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। এই অংশে অঙ্কিত চিত্রগুলি

সংস্কৃত সাহিত্যের এবং পুরাতন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিষয়বস্তুর অনবদ্য রূপায়ণ। নরনারীর মিলিত জীবনের রূপ চিত্রগুলি সুনির্বাচিত নির্বাচনকারীদের মনোভাব এতে স্পষ্ট। কোন সন্তানহীন দাম্পত্য জীবনের উচ্ছ্বসিত পিতৃমাতৃ স্নেহ আত্মপ্রকাশের অনুযোগ লাভ করেনি। মুখ্যত সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনে নানা রূপ এখানে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের 'স্তিমিত প্রদীপ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে চিত্রসপ্তক উপস্থাপনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সমালোচকদের প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

১। "নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর অতীত জীবনের সুন্দর আলেখ্য 'স্তিমিত প্রদীপে শীর্ষক পরিচ্ছেদটির মধ্যে সূক্ষম ব্যঞ্জনার দ্বারা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। *** সূর্যমুখীর সহিত দাম্পত্য জীবনের চিরমধুর অধ্যায়গুলি নিস্তব্ধ শয়নমন্দিরে যেন মধুর হয়েছে। কক্ষের অভ্যন্তরে কয়েকটি চিত্র। কোনও চিত্রের বিষয়গুলিই বৈধ নায়ক-নায়িকা ভিন্ন অবৈধ নায়ক-নায়িকা নহে। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার বহুপ্রচলিত চিত্রও যে এই নির্বাচনের বাহিরে হয়েছে তাও সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের অন্তরের ভাববৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। নরনারীর মিলিত জীবনের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতাকে কোন চিত্রেই প্রকাশ করা হয়নি। *** বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্তিমিত প্রদীপ' রচনাতে প্রাচীন সাহিত্যপ্রীতি এই প্রকার সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার পুরাতন সাহিত্য প্রীতি কেবল নহে তিনি নতুন সাহিত্য সৃষ্টিও করেছেন। এ অংশে নগেন্দ্রনাথের চিত্তবিশ্লেষণ, সূর্যমুখীর চিত্তবিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর রচিত অলেখ্যদর্শনের সঙ্গে এই বিষয়ে 'স্তিমিত প্রদীপে'র আলোচনা করা যায়। মনে হয়, যে চিত্তবিশ্লেষণ ও পুরাতন সাহিত্য প্রীতি বিদ্যাসাগরের আলেখ্য দর্শনে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।" |কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র / সুধাকর চট্টোপাধ্যায়|

২। "এই চিত্রগুলির সাহায্যে উপন্যাসিক কলাকৌশলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, এবং ভাষারীতির ব্যবহারেই বা কি ধরনের বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথমত, ঔপন্যাসিক রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ছাড়াও সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারদের রচনা থেকে চিত্র বিষয়ে সঙ্কলনের আগ্রহ দেখিয়েছেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'ম এবং শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' থেকে প্রত্যক্ষ ঋণ গ্রহণ আছে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়গুলি সযত্নে নির্বাচিত। প্রেমের, বিশেষত দাম্পত্য প্রণয়ের বিচিত্র রূপ ও ভাব, যন্ত্রণা তৃষ্ণা আশঙ্কা ও লীলার কথাই ঔপন্যাসিক বলতে চেয়েছেন। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর প্রেম ও বিচ্ছেদের তীব্রতা নায়কের উপলব্ধি— এমনকি অস্তিত্বের অঙ্গাঙ্গী করে তোলার একটি অভিনব রীতিরূপেই এই চিত্রাবলী পরিকল্পিত।

তৃতীয়ত, ছবিগুলি বর্ণাঢ্য, গতিময়, ঐশ্বর্যপূর্ণ। যেন বর্তমান জীবনের উপরের প্রাচীন কালের এক উজ্জ্বল প্রাচুর্যের ধারাবর্ষণ। ভাষাও তদনুসারী তৎসম শব্দ ও

সমাসবদ্ধ পদে পূর্ণ, ধ্বনি ঝংকারময় ও উপমাদি অলংকারে সুসজ্জিত। বাক্যবন্ধে উত্থান পতনজনিত একটা ছন্দের তরঙ্গ অনুভূত হয়। তা হ্রস্বদীর্ঘ বাক্যাংশের বিন্যাস কৌশল এবং শব্দ পুঞ্জের গাঢ় ও লঘু উচ্চারণ পারম্পর্যের ফল। চিত্রাবলীর বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করেছে। বিচিত্র পাত্র পাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রাসঙ্গিক মুড সূক্ষ্ম ও সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

বঙ্কিম অবশ্যই সামাজিক উপন্যাসে একটি রোমান্সের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন এই প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।" *(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি/ক্ষেত্রগুপ্ত।)*

১০। বিষবৃক্ষ : পত্রব্যবহার ● প্রবণতা ও তাৎপর্য

উপন্যাসে চিঠিপত্রের ব্যবহার হয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; আখ্যারিকাংশে যে বক্তব্য বা উদ্দেশ্য সাধারণভাবে কাহিনী বা চরিত্রের দ্বারা উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় না, পত্ররচনার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়। পত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়ক; পত্রের মধ্যে মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় ব্যক্ত হয়। পত্র অনেক সময় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। উপন্যাসের বক্তব্য ও পরিবেশানুযায়ী চিঠিপত্র ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও চিঠিপত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যের বেশ কিছু উপন্যাসে পত্রব্যবহার প্রবণতা লক্ষ্যগোচর। বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সাহিত্যিক নিদর্শন উপস্থিত ছিল। সেই ঐতিহ্যের ধারক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে পত্রব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে চিঠিপত্রের ব্যবহার দেখা যায় ঘটনার যোগসূত্রে রূপে, গুপ্ত রহস্য প্রকাশের জন্যে বা সমস্যাকে জটিল করার জন্যে। "চিঠিতে মানুষ আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে সহজেই। কারণ নিকটতম ব্যক্তির কাছেই এসব চিঠি। চিঠিতে কথা বলা তাই অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। আবার বলা কথা কিছু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, লেখার দারুণ তাতে কিছু ভাবনা শৃঙ্খলা এসে যায়। তা ছাড়া একপাক্ষিক বক্তব্যের যে বিস্তার চিঠিতে সম্ভব সংলাপে তা অপরের বক্তব্য, যুক্তি ও আবেগ দ্বারা বারবারই খণ্ডিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে চিঠিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন অনেকখানি তীক্ষ্ম ভাবনার ফলে। *** তাছাড়া উপন্যাসে চিঠির ব্যবহার আর চিঠির মধ্যে দিয়ে গোটা উপন্যাস গড়ে তোলা দুটো আলাদা ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হয়েছে তাঁর মনোবিশ্লেষণের উদ্দেশ্যকে গল্পের সহজ বিশ্বাস্য গতির উপর যাতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। পাত্রপাত্রী যেন সাধারণ মানুষের মতো প্রয়োজনেই চিঠি লেখে এবং প্রয়োজনটা তাদের মনোভাব, ঘটনাসন্ধি, যাকে লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়া চাই।" (*বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ* / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে পত্রের প্রয়োগ প্রবণতা যত সার্থক ও তাৎপর্যবাহী, অন্যত্র ততখানি নয়।

উপন্যাস মানবজীবনের ভাষ্য রচনা করে। ঔপন্যাসিক সমস্ত উপাদানকেই উপন্যাসে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন। ফলে, তুচ্ছ, গৌণ উপাদানগুলিও উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণ বা ঘটনা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি রূপে পরিগণিত হয়। সাধারণত উপন্যাসে চিঠিপত্র গৌণ উপাদনরূপে চিহ্নিত। চিঠিপত্রগুলি পাত্র-পাত্রীর মনোভাব প্রকাশের সহায়ক সর্তরূপে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বসাহিত্যে অবশ্য চিঠিপত্র কেন্দ্রিক উপন্যাস দুর্লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে চিঠিপত্র কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার অনুপস্থিত বললেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে চিঠি ব্যবহারের

দ্বারা চরিত্র দ্বন্দ্ব, পরিবেশ প্রভৃতি পরিস্ফুটনে উপযুক্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে মোট চিঠির সংখ্যা ১৩। বিষবৃক্ষ পূর্ববর্তী উপন্যাসেরও চিঠির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার যোগ সূত্র তৈরী করা, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা, সমস্যাকে জটিল করা— প্রভৃতিতে চিঠির ব্যবহার ভিন্নজাতীয়। বিষবৃক্ষে চিঠিরই সংখ্যাও বেশি। সুতরাং উপন্যাসের গঠনকৌশলের দিক থেকে এটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। অধিকাংশ চিঠিই মাঝারি; তবে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ চিঠিও আছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চিঠির তালিকা ঔপন্যাসিকের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। চিঠির তালিকাটি নিম্নরূপ— (১) নগেন্দ্রের চিঠি হরদেবকে (পঞ্চম), (২) সূর্যমুখীর নগেন্দ্রকে (পঞ্চম), (৩) সূর্যমুখী কলমকে (একাদশ), (৪) হরদেবের নগেন্দ্রকে (দ্বাদশ), (৫) নগেন্দের হরদেবকে (দ্বাদশ), (৬) সূর্যমুখীর কমলকে (দ্বাদশ), (৭) সূর্যমুখীর কমলকে (পঞ্চবিংশ), (৮) নগেন্দ্রের শ্রীশকে (পঞ্চবিংশ), (৯) সূর্যমুখীর কমলকে (অষ্টবিংশ), (১০) নগেন্দ্রের হরদেবকে (দ্বাত্রিংশত্তম), (১১) হরদেবের নগেন্দ্রকে (ঐ), (১২) ব্রাহ্মচারীর নগেন্দ্রকে (পঞ্চত্রিংশত্তম), (১৩) ব্রাহ্মচারীর নগেন্দ্রকে (পঞ্চত্রিংশত্তম)। এই তালিকা ব্যতীত সূর্যমুখীকে লেখা নগেন্দ্রের এবং নগেন্দ্রকে লেখা শ্রীশের একটি করে, হরদেব এবং নগেন্দ্রর এক বা একাধিক চিঠির উল্লেখ আছে। তোরোখানি চিঠির মধ্যে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর লেখা পাঁচখানি করে, হরদেব ঘোষালের দুখানি চিঠি। ব্রহ্মচারী কর্তৃক নগেন্দ্রকে লিখিত পত্রটি ঘটনার যোগাযোগের জন্য। অবশ্য মধুপুরের গ্রাম থেকে গোবিন্দপুর, সেখানে থেকে কাশী চিঠিটির এই যাত্রাপথ গল্পে প্রয়োজনীয় কালব্যবধান তৈরি করেছে। অধিকাংশ চিঠির কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মনের গভীর বাতায়ণের পথরূপে ব্যবহৃত।

উপন্যাসে ব্যবহৃত তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিগুলি উপন্যাসের পঞ্চাশটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম বত্রিশ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। মনোবিশ্লেষণের জন্য ঔপন্যাসিক শেষাংশে ভিন্ন ভিন্ন রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেখানে অবশ্য চরিত্র ব্যাখ্যান অপ্রয়োজনীয় নয়। ধীর বিশ্লেষণ রীতি উপন্যাসের আলোচ্য অংশ পরিত্যক্ত। আটাশ অধ্যায়ে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর এবং বত্রিশ অধ্যায়ে সূর্যমুখীর খোঁজে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগের পর চিঠি লেখার বাস্তব ও মনোগত অবকাশ ছিল না।

চিঠিতে মানুষ সহজে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে। কারণ নিকটতম ব্যক্তির কাছেই পত্র প্রেরিত হয়। চিঠিতে কথা বলা অনেকটা স্বগতোক্তির ন্যায়। মুখে বলা কথায় যে বিশৃঙ্খলা থাকে, চিঠির লেখার ফলে সেই বিশৃঙ্খলা ভাবনাগত শৃঙ্খলায় রূপায়িত হয়। একপাক্ষিক বক্তব্যের বিস্তার চিঠিতে সম্ভব; কিন্তু সংলাপে অপরের বক্তব্য যুক্তি ও আবেগ দ্বারা খন্ডিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতি রূপে চিঠিকে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসে চিঠির ব্যবহার তাঁর তীক্ষ্ম ভাবনার ফলশ্রুতি। মনে হয়, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চিঠি ব্যবহারের কালে তাঁর মনে রিচার্ডসনের 'পামেলা' উপন্যাস রচনার কথা ছিল। তবে 'পামেলা' উপন্যাসে

চরিত্রের জটিল বিশ্লেষণ প্রবণতা অনুপস্থিত।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চিঠিপত্র ব্যবহারের কালে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের সহজ গতিকে বিনষ্ট করতে চাননি। মনোবিশ্লেষণ যেন কাহিনীর গতিকে ব্যাহত না করে সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন দৃষ্টি ছিল। পাত্রপাত্রী যেন সাধারণ আচরণের অঙ্গ রূপে চিঠি লেখে সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। চরিত্রগুলি যেন সাধারণ মানুষের মতো প্রয়োজনেই চিঠি লেখে— এ চিন্তা বিষবৃক্ষ রচনার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। এই প্রয়োজন ঘটনাসন্ধি, চরিত্রের মনোভাব, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

উপন্যাসে ব্যবহৃত চিঠিগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সূর্যমুখীর চিঠি। পঞ্চম অধ্যায়ে সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে প্রথমে যে চিঠি লেখে সেটাই উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রথম চিঠি। স্বামীকে চিঠি লেখা স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক; তবে ঔপন্যাসিক একে প্রয়োজনীয় করে তুলেছেন, কারণ নগেন্দ্রর দেশে ফিরতে দেরী হচ্ছিলো। চিঠিটি লেখিকার দিক থেকে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল কলকাতা থেকে নগেন্দ্রর চিঠি পেয়ে। নগেন্দ্রর যেকোনো চিঠির অবিলম্বে উত্তর না দেওয়া সূর্যমুখীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগেন্দ্রর এই চিঠিতে কুন্দনন্দিনী সম্পর্কিত তথ্য ছিল। চিঠির উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে, ভাষা দেওয়া হয়নি; সেই কারণে সংবাদের উল্লেখ মাত্র আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য সূর্যমুখীর মনের মাধ্যমে সেই চিঠি পাঠক যেন পাঠ করে। তার শব্দার্থের বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়া একমাত্র সূর্যমুখীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। নগেন্দ্রের কাছে যে ভাবনা অসম্ভব, বীভাকার ও দুর্নিরীক্ষ্য, সূর্যমুখী তাকে অনুভব করেছে। কিন্তু ঘটনার সত্যতায় সে সন্দিহান ছিল। এই চিঠি নগেন্দ্র এবং সূর্যমুখী দুজনেরই বহিরঙ্গ জীবন ও অন্তরঙ্গ জীবনের অতলান্ত গভীর জটিল সম্পর্কের নিদর্শন রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সূর্যমুখী কমলকে মোট ৪টি চিঠি লিখেছে। কমলের সঙ্গে তার অবশ্য সম্পর্কের পটভূমি ঔপন্যাসিক সযত্নে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সূর্যমুখীর গূঢ় মনোবেদনা প্রকাশের যোগ্যতম স্থান কমলিনী। যে ভাবনার যন্ত্রণা শ্বাসরুদ্ধকর, সমমর্মীর কাছে সেই ভাবনা বর্ণনা করে ঔপন্যাসিক হালকা হওয়ার জরুরী তাগিদ লক্ষ্য করেছেন। সর্বাপেক্ষা বিপদের কালে চিঠিগুলি যেন আশ্রয় প্রার্থনার মতো। একাদশ অধ্যায়ে কমলকে লিখিত প্রথম পত্রটি যেন নাটকীয় আকস্মিকতা নিয়ে প্রকাশিত। কুন্দনন্দিনী বিষয়ে নগেন্দ্রর মনোভাব সম্পর্কে ষষ্ঠ থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত কাহিনী নীরব। নগেন্দ্রর বাসনা তখনও অবচেতনাশ্রয়ী প্রাত্যহিক আচরণে বা কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়নি। সূর্যমুখীর মনোদর্পণে তার সূক্ষ্ম প্রতিফলন ঘটেছে— এই চিঠি তার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রকৃত পক্ষে এই চিঠি থেকেই উপন্যাসের আভ্যন্তর সংকটের সূচনা।

দ্বাদশ অধ্যায়ে সূর্যমুখীর চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। 'একবার এসো! ভগিনী! তুমি বই আর আমার হৃদয়ে কেহ নাই! একবার এসো!'— সংবাদ তথ্য বিহীন, মনের

গোপন বাসনা প্রকাশহীন আলোচ্য চিঠিটি যেন তীব্র আর্তনাদ। সংক্ষিপ্ততায় এর চিত্তবিদারী তীক্ষ্মতা রো বেড়েছে। পঁচিশ অধ্যায়ের চিঠিটিও দীর্ঘ নয়। আপাতদৃষ্টিতে নগেন্দ্র কুন্দবিবাহের সংবাদ এই চিঠিতে পরিবেশিত হলেও আবেগের তীব্রতা নেই; কিন্তু কথাগুলির ব্যঞ্জনায় অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে। আটাশ অধ্যায়ে সূর্যমুখীর শেষ চিঠি। এই চিঠিটিও কাহিনীর গ্রন্থি। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের সংবাদ এবং তার আলোকে লেখিকার মনের জটিল ভাব এতে প্রকাশিত হয়েছে।

সূর্যমুখীর চিঠিগুলি তার আত্মবিশ্লেষণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে নগেন্দ্রের অবচেতন মনের প্রবেশ সূত্রও বটে। নগেন্দ্রর চিঠিগুলির সাহায্যে ঔপন্যাসিক লেখকের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল দায়িত্ব নগেন্দ্রর চরিত্র বিশ্লেষণ। নগেন্দ্র হরদেবকে চারটি চিঠি লিখেছে, শ্রীশকে একটি। উপন্যাসে হরদেবের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, নগেন্দ্রকে চিঠি লেখাই তাঁর কাজ। লেখক মাত্র কয়েকটি রেখাঙ্কনে তাঁর পরিচয় প্রদান করেছেন,— 'হরদেব ঘোষাল নামে তাঁর এক প্রিয় সুহৃদ দূরদেশে বাস করিতেন।' ... ... 'হরদেব বড় বিজ্ঞ'। এই পরিচয় ব্যতীত সমগ্র উপন্যাসে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। পাঠক চিঠির মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় লাভ করে। এ জাতীয় চরিত বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত। উদ্দেশ্যমূলক বলেই এরা অভিপ্রায়সাধক ও নিষ্প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটি গঠনের দ্বারা দুটি চিঠি লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর এই দুটি চিঠি তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশক সর্ত।

সামাজিক উপন্যাসে অতিলৌকিক বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আর্বিভাব সম্ভাবনার সুযোগ বিরলদৃষ্ট। সূর্যমুখীর উদ্ধার কর্তার ভূমিকায় যে ব্রহ্মচারীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাঁর ভূমিকা গৌণ ও যন্ত্রবৎ। হরদেব ঘোষালের চরিত্র পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিকের একটি প্রবণতা সক্রিয়। তবে হরদেব ঘোষালের মহাপুরুষত্ব বিজ্ঞ দার্শনিকতায় কোনো আলৌকিক শক্তিতে নয়। বত্রিশ অধ্যায়ে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি রূপজ মোহ ও গুণজ স্থায়ী প্রেমের পার্থক্য নির্ণয়ে সচেষ্টা হয়েছেন। চিঠিটি দীর্ঘ নয় এবং উপস্থাপনার দিক থেকে উল্লেখ্য নয়। বিজ্ঞতা ও যুক্তিপ্রাণতার পটভূমিকায় নগেন্দ্রর চিত্তদান ও আবেগোন্মত্ততা তীব্র হয়ে উঠেছে। তবে হরদেব ও নগেন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ব্যাকুলচিত্ততার যে নিদর্শন আছে এবং তাঁর অপর চিঠিটি যে প্রীতির উত্তাপে পূর্ণ, তাতে মানুষটি অস্পষ্ট আদর্শবাদ থেকে ব্যক্তিত্বে সুস্থিত হয়েছে।

হরদেবকে লিখিত নগেন্দ্রর প্রথম চিঠিতে রূপমোহের অঙ্কুর। চিঠিটির প্রতি বাক্যে যে সকল ও নিষ্পাপ সৌন্দর্যপ্রীতি আছে তার ভেতর থেকে অবচেতন গুহাটির অস্পষ্ট অবয়বের ইঙ্গিত মিলেছে।

নগেন্দ্রর দ্বিতীয় চিঠি— 'আমার উপর রাগ করিতে না, আমি অধ:পাতে যাইতেছি'— নায়ক চরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ। প্রবৃত্তির প্রবল ও অনিবার্য গতি এবং বিবেকের সংঘাত আলোচ্য পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত।

শ্রীশকে লিখিত পত্রের দীর্ঘ অংশ জুড়ে বিধবা-বিবাহের পক্ষে যুক্তি দেওয়া

হয়েছে। নগেন্দ্র যেন শ্রীশকে লক্ষ্য করে নিজের বিবেককে নিবৃত্ত করবার জন্য যুক্তি জাল বিস্তার করেছে। কিন্তু চিঠির প্রারম্ভে আর্তনাদের মতো বিবেকপীড়ন— 'ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না— অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি! ঘৃণাস্পদকে অবশ্যই ঘৃণা করিবে।' আবার পরবর্তী অংশে প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য গতি— 'যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব'। এইভাবে চরিত্র বিশ্লেষণে চিঠিগুলি নিপুণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বত্রিশ "অধ্যায়ে সূর্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্রর মনোভাব বিশ্লেষণের ও আবেগ প্রকাশের জন্য দুটি চিঠির অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম চিঠিতে যন্ত্রণাভোগ ও আত্মভাব ব্যাখ্যানের চেষ্টা এবং দ্বিতীয়টিতে বিদীর্ণ হৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাস ব্যক্ত। দুটির মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ হরদেবের পূর্বোক্ত দীর্ঘ চিঠিটি থাকায় বিন্যাস কৌশলে বিপরীত মেজাজের সঙ্গে সংঘাতের ভাব প্রকাশিত হয়েছে।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানিকে এক হিসেবে পত্রোপন্যাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমের আর কোনো উপন্যাসে এত বেশি সংখ্যক পত্রাদি ব্যবহৃত হয়নি। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে সংলাপের পরিবর্তে তাদের পরস্পরকে লিখিত চিঠি পত্রগুলি অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাটিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বৃহৎ উপন্যাসটিতে প্রধান চরিত্র তিনটির মুখ দিয়ে কথা খুব সামান্য বলানো হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে নগেন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমুখীর কটি কথা হয়েছে? নগেন্দ্র কুন্দকে ভালবাসল, তাকে বিবাহ করল এবং পরিশেষে তাকে ত্যাগ করল; কিন্তু উপন্যাসখানিতে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দর কথোপকথন নেই বললেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মনের ছবি এঁকেছেন এবং তাদের লিখিত চিঠিপত্রগুলির মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন।" *(বঙ্কিমসাহিত্য/ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।)*

১১। বিষবৃক্ষ : অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকতা

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে বিভিন্ন ভাবে অলৌকিকতার অবতারণা করা হয়েছে। সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ, ভবিষ্যৎ-গণনা, যোগবলদ্বারা স্বপ্ন প্রদর্শন, অন্ধত্ব মোচন, দেবীপ্রতিমা এবং স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান ইত্যাদি বিষয় অবতারণার মধ্যে দিয়ে অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক সূত্রে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের জীবনে এক অলৌকিক কাহিনীর কথা শোনা যায়। বাল্যকালে মৃত ভেবে আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সেখানে রহস্যময় নৌকো থেকে এক সন্ন্যাসী নেমে আসেন এবং তাঁকে অলৌকিক উপায়ে জীবিত করে তোলেন। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি মৃত্যুকালে তাঁকে দর্শন দেবেন। সন্ন্যাসী মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে দর্শন দেন। (*দ্র: বঙ্কিমজীবনী*— শীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, উক্ত সন্ন্যাসী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে যাদবচন্দ্রের প্রায়ই সাক্ষাৎ হত। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে পরিচয় হয়েছিল তিনি তাও জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে দুবার সন্ন্যাসী-সান্নিধ্য ঘটেছিল বলে জানা যায়। নেওয়াতে চাকরি করা কালীন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল যিনি প্রায় রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মনে হয় *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সন্ন্যাসীর চরিত্রাঙ্কনে তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র আর একজন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসেন। সেই সন্ন্যাসী তাঁকে একটি রুদ্রাক্ষ দান করে পুজো করতে বলেন। পরবর্তীকালে সেই সন্ন্যাসীর আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রে সন্ন্যাসী-সান্নিধ্য একটি পরিচিত বিষয়। *রজনী* উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, অনেক অভিজ্ঞতার পর তিনি ঐ জাতীয় ঘটনার চিত্রাঙ্কন করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জলপড়া, মানত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে রাধানাথের বিগ্রহ ছিল; তিনি ঐ বিগ্রহকে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের উৎস বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের আরোগ্য কামনা করে রাধানাথের কাছে অলঙ্কার বন্ধক রাখতেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উক্ত বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তির কথা জানা যায়। কোনো সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র নাস্তিক থাকলেও পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধর্মভক্তি অঙ্কুরিত হয়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় যোগব্রহ্ম ইত্যাদিতে গভীর আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করতেন, মন্ত্র, যোগ ইত্যাদি দ্বারা মানুষকে বশীভূত করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন জীবনচরিতকার মনে করেন যে, তিনি ভূত-প্রেত দর্শন করেছিলেন। মালদহে অবস্থানকালে ঘরে অদৃশ্য ব্যক্তির করাঘাত শুনতে পান এবং

এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বঙ্কিমজীবনী থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত বক্তব্যকে অনেকেই যথাযথ বলে মনে করেন না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসানুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের আমদানি করেছেন। সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত*— ১. "কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে কোনো প্রশংসা নাই।" ২. "কাব্যে অতিপ্রাকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এবং নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যেসকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রাকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।"

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত অভিমত তাঁর উপন্যাসে অলৌকিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি। সেগুলি সর্বত্র 'স্বভাবানুকারী' বা 'নিয়মের অধীন' না হওয়ায় তাঁর উপন্যাসে অলৌকিকতার ব্যবহার সমালোচকগণ কর্তৃক ত্রুটিরূপে নির্দেশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের আলোচনায় দেখা যায় যে, তিনি কাহিনিগ্রন্থনে যে কয়েকটি বিশেষ প্রকরণকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অলৌকিকতা অন্যতম। সামাজিক উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকতার ভূমিকা নগণ্য হলেও রোমান্সে অলৌকিকতার অনুপ্রবেশের সুযোগ বেশি। জীবনজিজ্ঞাসামূলক উপন্যাস আর রূপকথা বা ভূতের গল্প এক জিনিস নয়। অলৌকিক ঘটনা উপস্থাপনার পটভূমিকায় যদি মনস্তত্ত্বগত বা পরিবেশগত তাৎপর্য না থাকে তবে উপন্যাসে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপন্যাস একান্তরূপে বস্তুনিষ্ঠ রচনা। এখানে কল্পনার অবকাশ কম। যে জীবন আমাদের একান্ত পরিচিত, উপন্যাসে তারই প্রকাশ ঘটে। উপরন্তু ঔপন্যাসিকের বিশেষ সৃজনী ক্ষমতার গুণে আমরা জীবন-স্বরূপ বা জীবনসত্যের পরিচয় লাভ করে থাকি। বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হ'তে পারে কিন্তু যদি তা প্রতীক-ধর্মী এবং কোথাও বা চরিত্রের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় তবে তা পাঠকমনে গ্রহণযোগ্য হয় এবং বুদ্ধির আলোকে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করে আরও অধিক আনন্দ লাভ করা যায়। যা প্রত্যক্ষগোচর এবং বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ তাকে মন মেনে নেয়, কিন্তু যা অভিজ্ঞতার অতীত, বিচারবুদ্ধির বাইরে তার প্রতিও মানুষের আকর্ষণও কম নয়। অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনা মানুষকে কাছে টানে। উপন্যাসে এর ব্যবহার চলতে পারে যদি তা সুপ্রযুক্ত হয় এবং বাস্তব রসকে অতিক্রম না করে।

জীবনবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করেছেন, কিন্তু কোথাও তা উপন্যাসের রসহানি ঘটায়নি, বরং পাত্র-পাত্রীর মানসিক প্রবণতা প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্র দুই রীতিতে করেছেন। যেখানে তাঁর কল্পনাশক্তি

প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে অতিলৌকিককে সুনিপুণভাবে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। তার ফলে সুবিন্যস্ত কাহিনীর মাঝে অতিলৌকিক তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। রামানন্দ স্বামী কর্তৃক 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে যোগবলের ব্যবহার, বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। কপালকুণ্ডলার ভৈরবী দর্শনও তার চরিত্রের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছে। আবার সামাজিক উপন্যাসে যেখানে কল্পনার প্রাধান্য নেই সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সংযতভাবে, পরিমিতি রক্ষা করে অতিলৌকিকের ব্যবহার করেছেন এবং তা প্রতীকী-ধর্মে উজ্জ্বল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস সমূহে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার না করলেও কয়েকটি ছোটগল্পে, নিশীথে, কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতিতে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারকে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিশেষ সহায়ক করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তিনটি জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র অতি প্রাকৃতের ব্যবহার করেছেন। প্রথম ব্যবহার উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এবং এখানেই যেন শিল্পী বঙ্কিম সুকৌশলে উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দিয়ে গেলেন, আর দ্বিতীয়বার অতিলৌকিকের ব্যবহার দেখি উপন্যাসের সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ। তৃতীয়বার ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে নগেন্দ্রের স্বল্পস্থায়ী অর্ধজাগর স্বপ্নে।

কলকাতাগামী নৌকাযাত্রাকালে নগেন্দ্রনাথ প্রবলঝড়ের মুখে পড়লেন এবং স্ত্রীর অনুরোধের কথা স্মরণ করে এবং মাঝি রহমৎ মোল্লার অনুরোধে তীরে অবতরণ করে আশ্রয় লাভের মানসে সেই ভয়ঙ্করী দুর্যোগময়ী রাত্রিতে গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। এখানে প্রকৃতির যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা নগেন্দ্র যে গৃহে আশ্রয় নিলেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সঙ্কেতদ্যোতক পরিবেশ রচনা করেছে। ঝিল্লিরবের শব্দ, বৃক্ষাগ্র থেকে বৃক্ষপত্রের উপরে বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতন শব্দ, পথে অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চরণ শব্দ, বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধূননের শব্দ— এসব মিলে একটা অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। নগেন্দ্র যে গৃহে এসে আশ্রয় নিলেন সেখানে সকল জিনিস দারিদ্র্যব্যঞ্জক। শয্যায় মুমূর্ষু এক বৃদ্ধ ও সেবারতা এয়োদশবর্ষীয়া কন্যা কুন্দনন্দিনী।

মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তার অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। কন্যাও প্রস্তর মূর্তির মতো একদৃষ্টে মৃত্যু- মেঘাচ্ছন্ন পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। বৃদ্ধের মৃত্যু হলো। পিতার মৃতদেহ কোলে নিয়ে কুন্দনন্দিনী একা বসে রইল। দিনরাত্রি জাগরণের ফলে আপন বাহুর উপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়লো। সে স্বপ্ন দেখলো যে, প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হয়েছে। এতবড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ এর আগে দেখে নি। এর দীপ্তি ভাস্বর অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে চাঁদ নেই। তার পরিবর্তে কুন্দ দেখলো এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। তাঁর মুখমণ্ডল কারুণ্যে পূর্ণ, অধর স্নেহপূর্ণ হাস্যে স্ফুরিত। কুন্দ চিনতে পারলো সেই মূর্তি তার পরলোকগতা মাতৃমূর্তি।

তিনি তাকে ক্রোড়ে ধারণ করলেন। তিনি তার ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা জ্ঞাপন করে তাকে তার সঙ্গে উজ্জ্বল প্রজ্জলিত নক্ষত্রলোকে আহ্বান করলেন। কুন্দ যেতে অস্বীকৃত হলে কুন্দ ভবিষ্যতে যদি মনঃপীড়ায় ধূলিশয্যা গ্রহণ করে জননীর কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয় তখন তিনি পুনর্বার দেখা দিয়ে তাকে নিজের কাছে আসবার জন্য আহ্বান করবেন।

জননী কুন্দনন্দিনীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দুটি মনুষ্যমূর্তি দেখালেন এবং এদের থেকে তাকে সাবধান থাকবার নির্দেশ দিলেন। কুন্দ দেখল একজন দেবনিন্দিত পুরুষ, উন্নত প্রশস্ত ললাট, সরল, সকরুণ কটাক্ষ। জননী বললেন, 'ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহোদয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ।' দ্বিতীয় মূর্তি এক পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী এক যুবতীর। জননী বললেন, 'এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।'

প্রকৃতপক্ষে এই অতিপ্রাকৃত নিতান্ত সঙ্কেতদ্যোতক। বঙ্কিমচন্দ্র 'ছায়া পূর্বগামিনী' এই নামে এই অধ্যায়কে চিহ্নিত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের জীবনে নিয়তি পূর্বনির্দিষ্ট, প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য। মানুষ আপন চেষ্টার দ্বারা এর হাত এড়াতে পারে না। কুন্দ যখন স্বপ্ন দেখেছে তখন সে নিতান্ত বালিকা, সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞা। একদিন এই বালিকা যখন যৌবনে পদার্পণ করবে, তার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে প্রবাহিত হবে এর সঙ্কেত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। কিন্তু এই অতিলৌকিকের দ্বারা উপন্যাসের বাস্তব ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়নি, কেননা তা ঘটনার ধারা নিয়ন্ত্রন করেনি। নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়ে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন। কুন্দের জীবনে শুরু হলো আর এক পর্ব দুঃখের ইতিহাস। নগেন্দ্রকে স্বামীরূপে লাভ করে কুন্দ ভেবেছিল তার সুখের সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ফলে গভীর দুঃখের মাধ্যমে সে উপলব্ধি করলো সকল সুখেরই সীমা আছে। নগেন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হলো, তিনি সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের জন্য কুন্দকে দায়ী করলেন। উপেক্ষিতা কুন্দ বুঝলো নগেন্দ্রের ভালোবাসা সে পায়নি।

দীর্ঘদিন পরে সূর্যমুখীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ফলে বহু প্রতীক্ষিত নগেন্দ্র সুর্যমুখীর মিলন হলো। অবহেলিত কুন্দ ভাবলো 'এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?

চার বৎসর পূর্বে কুন্দ স্বপ্নে যে জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি দর্শন করেছিল সেই আলোকময়ী প্রশান্ত মূর্তি আবার আবির্ভূতা হলেন। এবারে তিনি চন্দ্রমণ্ডল মধ্যবর্তিনী নন। বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদ মধ্যে অবতরণ করেছেন। তার চারিদিকে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্য মূর্তি অল্প হাসছে। ঐ হাস্যনিরত মুখের সঙ্গে কুন্দ হীরার সাদৃশ্য দেখলো। জননীর করুণাময়ী কান্তি গম্ভীর ভাবাপন্ন; জননী তাকে বললেন যে, পূর্ব কথা স্মরণ করে তিনি পুনর্বার আবির্ভূতা হয়েছেন। সংসার সুখে যদি তার অনাসক্তি জেগে থাকে তবে যেন সে তাঁর সঙ্গে আসে। দুঃখিনী কুন্দ মার সঙ্গে যেতে চাইল। মাতা প্রসন্ন হয়ে অন্তর্হিতা হলেন। নিদ্রাভঙ্গ হলে কুন্দ দেবতার উদ্দেশে প্রণাম

নিবেদন করে বললো, 'এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক'। এরপর বিষকন্যা হীরা তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যেতে প্ররোচনা জোগালো।

জননীর নীল নীরদ মধ্যে অবতরণ, তাঁর চারদিকে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গ, করুণাময়ী কান্তির গম্ভীর ভাব গ্রহণ— এ সকলই কুন্দের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রকাশিত হয়েছে।

"কুন্দের মাতার আবির্ভাবের কথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। তাঁহাকে দুইবার দেখা যায়— প্রথমবার উপন্যাস আরম্ভে আর একবার উপসংহারের প্রাক্কালে। এই লোকান্তরিতা মহিলার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব হ্যামলেটের পিতার প্রেত মূর্তির আগমন ও পুনরাগমনের চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার আসার কারণ— সন্তানের শিথিল সংকল্পকে দৃঢ় করা। কিন্তু এই সাদৃশ্যের অন্তরালে গভীর পার্থক্যও আছে। হ্যামলেটের পিতা হ্যামলেটকে এমন তথ্য জানান যাহা রাজকুমারের জানা ছিল না এবং এই তথ্যই তাহার কার্যবলীর (অথবা নিষ্ক্রিয়তার) সূচনা করিয়াছে। এই হিসাবে প্রেতমূর্তির আবির্ভাব নাটকবর্ণিত ঘটনাস্রোতের অংশবিশেষ। কুন্দের মাতা ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু তাহার কন্যাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু নিয়তি মুখ-পত্র। নিয়তি যে ঘটনাচক্রকে অনিবার্য বেগে চালিত করিতেছে তাহাই তিনি জানাইয়াছে— ইহার অধিক প্রভাব বিস্তার করেন নাই।" *(বঙ্কিমচন্দ্র / সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)।*

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর ছায়ামূর্তিকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অতি প্রাকৃতের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে নগেন্দ্রনাথের স্বপ্ন অর্ধজাগর ও স্বল্পস্থায়ী। সূর্যমুখীর অপঘাত মৃত্যুসংবাদ নগেন্দ্রকে বেদনার্দীর্ণ করেছে। অনুশোচনায় দগ্ধ নগেন্দ্র স্বপ্নলোকে আশ্রয় নিতে চেয়েছে— যে স্বপ্নলোক ক্ষণস্থায়ী। "এই স্বপ্নে সূর্যমুখী স্বর্গের ঈশ্বরীরূপে কল্পিত এবং নগেন্দ্র স্বয়ং নরকের অসুরদের দ্বারা নিগৃহীত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্বপ্নদ্রষ্টার মনোভাব ও হৃদয়াবেগ যেন বড় সোজাসুজি স্বপ্নটির চেহারায় প্রতিফলিত। হঠাৎ একে সর্বজনীন নীতিভাবনাজাত বলেও ধারণা হতে পারে। যেনরূপে স্বপ্নোচিত বিকার নেই। কিন্তু কিছু ভিতরে তাকালে এখানেও অনেকটা স্বপ্নসম্ভব রূপকের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। নগেন্দ্রের মানসযন্ত্রণা ও বিবেকদংশনের তীব্রতা তমসা পূর্ণ নরকবন এবং অসুরদের বেত্রাঘাতে রূপকায়িত হওয়ায় অনুভূতির আতিশয্য ব্যক্ত হয়েছে। স্বর্গের দেবীরূপে সূর্যমুখীর চিত্রও আসলে নগেন্দ্রের জটিল মনোভাবের এক ধরনের রূপক। সূর্যমুখী তার অপ্রেমে তথা পার্থিব বঞ্চনায় অপঘাত মৃত্যু বরণ করেছে। বাস্তবে তা পূরণ করা আর সম্ভব নয়, নায়কের অবচেতনাজাত স্বপ্ন তাকে রাজরানির ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে সেই বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করতে চাইছে। অনুশোচনা, পাপবোধ এবং চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা মাত্র নেই এমন কামনার তির্যক চিত্র নগেন্দ্রের মূর্ছিতাবস্থার এই স্বপ্ন।

আধুনিক স্বপ্নতত্ত্ব বিদ্যা আবিষ্কৃত হবার আগে স্বপ্নরূপকে গহন মনোজগতের এ জাতীয় জটিল রূপরচনা উচ্চ প্রতিভার নিদর্শন।" *(বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাস : শিল্পরীতি* / ক্ষেত্র গুপ্ত)।

কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নের কারণ সম্ভবত হতাশা ও আশ্রয়হীনতা; ফলে মাতার স্নেহমমতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তারই রূপায়ণ প্রথম স্বপ্নে। কুন্দের দ্বিতীয় স্বপ্ন তার মনে মৃত্যুবাসনা জাগিয়ে তুলেছে, যার কারণ জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 'কুন্দের স্বপ্নে, স্বপ্নোচিত অবাস্তবতা, অসংলগ্নতা তথা রূপবিকার নেই।' মূলত আশ্রয় লাভের ব্যাকুলতা থেকেই সে মৃতা মাতাকে স্বপ্নে দেখেছে। স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে অলৌকিক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টাও লক্ষ্যগোচর। ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে রোমান্সরস সৃষ্টির ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক দিতে চেয়েছেন। তবে সামাজিক উপন্যাস বলে এর প্রয়োগ সম্ভাবনা কম। কুন্দের জীবনে অনির্দেশ্য নিয়তির ভূমিকা যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করবে এমন ইঙ্গিতও স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দিতে চেয়েছেন।

১২। বিষবৃক্ষ • কৌতুকরস

"তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুদ্ধ হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়েছেন।" — *রবীন্দ্রনাথ*

অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় হাস্য-কৌতুকরস মানুষের আদিম, সনাতন, সাধারণ প্রবৃত্তি। সাধারণভাবে মনের প্রফুল্লতা হাস্যরসে অভিব্যক্ত হয়। হাস্যকৌতুকবোধ আপেক্ষিক এবং তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। হাসির কারণ মূলত আনন্দানুভূতি। হাস্যকৌতুকরস সম্মিলিতভাবে উপভোগের সামগ্রী। অদ্ভুত, উদ্ভট ও বিস্ময়জনক ঘটনা বা চরিত্র হাস্যোদ্রেক করে। অসঙ্গত, বিসদৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা চরিত্র হাস্যকৌতুক উদ্রেকের কারণরূপে পরিগণিত হয়। স্থান-কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন চরিত্র বা ঘটনা হাস্যকৌতুকের উদ্রেক করে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা যেমন হাস্যকৌতুকের কারণ তেমনি ভুল বা অন্যমনস্কতাও কৌতুক সৃষ্টির কারণরূপে পরিগণিত হয়।

বাংলায় হাস্যকৌতুক শব্দটি একত্রে উচ্চারিত হলেও সাধারণভাবে হাস্যরসকে করুণ হাস্যরস (Humour), বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস (Wit), ব্যঙ্গরস (Satire), এবং কৌতুকরস (Fun) এই কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাস্যরসের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কৌতুকরসের আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকরসের সংজ্ঞা নির্ণয়কালে সমালোচক বলেন; " যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রবণতা বা আমোদিপ্রয়তা কোন সূক্ষ্মতর কলাকৌশলের বা গভীর জীবনানুভূতিব নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্রকল্পনার সহাযতায় আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে সেখানে কৌতুকরসেরই প্রাধান্য।" (*বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*/অক্তিতকুমার ঘোষ)। কৌতুকের জগৎ অনিয়ম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জগৎ। তবে কৌতুকরসের জগৎ যে সর্বদাই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলার জগৎ হবে এমন নয়। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য হাস্যতত্ত্বে হাস্যরসের এমন শ্রেণীবিভাগ থাকলেও বাংলা কৌতুকশব্দটি ব্যঙ্গকৌতুক, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি রূপে প্রচলিত আছে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিচন্দ্রই সর্বপ্রথম হাস্যরসের ধারা আনয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাঁব হাস্যরস বহুধাবিচিত্র ও

বহুধাব্যাপ্ত। কখনও তা সমবেদনায়, কারুণ্যে অভিহিত; আবার কখনও তা তীব্রব্যঙ্গ বিদ্রূপে কণ্টকিত। উপন্যাস অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রে লোকরহস্য, *কমলাকান্তের দপ্তর*, *মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত*— এই তিনটি গ্রন্থে হাস্যরসের অমলজ্যোতি কারুণ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপে কৌতুকে বিকীর্ণ হয়ে আছে। তবে তাঁর উপন্যাসেও হাস্যরসের প্রয়োগ বা উপস্থিতি অনুল্লেখ্য নয়। "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্যরস জীবনরসেরই অঙ্গীভূত। সেখানে বীর, করুণ ও শৃঙ্গাররসের সহিত হাস্যরসও চলমান জীবনের সহিত সহজ ও সচলভাবে মিশিয়া গিয়াছে। *** বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীতে যে হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায তাহা খুবই সূক্ষ্ম, জটিল ও মিশ্রিত; তাহা কোথাও লেখকের টীকাটিপ্পনী এবং কোথাও বা ঘটনাচরিত্র অথবা সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।*** তাঁহার উপন্যাসে হাস্যরস অন্য রসের অধীন, সেখানে ঘটনা ও হৃদয়বৃত্তির আনন্দ-বেদনা-রহস্য মিশ্রিত ধারার মধ্যে হাস্যরস একটি উপধারার মত্রে মিশিয়াছে, ক্ষণিকের বুদ্বুদছটা ও কলোচ্ছ্বাসে তাহা মূল ধারাকে একটু আলোড়িত ও উল্লসিত করিয়াছে মাত্র। সেজন্য নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্য উপন্যাসের রসধারা হইতে দূরে সরিয়া হাসির উদ্ভট ও মৌলিক উপাদান অন্বেষণ করিবার সুযোগ লেখক পান নাই। ঘটনা ও চরিত্রের আত্যন্তিক উৎকেন্দ্রিকতা ও বিস্ময়কর উদ্ভটত্ব তাঁহার উপন্যাসে বিশেষ নাই।" (পূর্বোক্ত)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কৌতুকরসাত্মক চরিত্রের উপস্থিতি কম, তিনি নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ নিপুণতা দেখাতে পারেননি। যেখানে কৌতুকরসাত্মক চরিত্র (যেমন, *মৃণালিনী* উপন্যাসের কালা জনার্দন) সৃষ্টি করেছেন, সেখ নে চরিত্রটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে কৃষ্ণকান্ত পরিহাসপ্রিয় হলেও প্রীতিস্নিগ্ধ ও উদার হৃদয়। আবার *রজনী* উপন্যাসের হীরালাল ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র। ঘটনা বয়নে ও চরিত্র সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরস অন্বেষণ করেছেন সামাজিক জীবনের নানা উপকরণের মধ্যে। পুকুরঘাটে পল্লীবাসিনী রমণীদের পরনিন্দা, পরচর্চায়, জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরে চাকর-চাকরানিদের তুমুল হট্টগোলে, অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের হাস্যরসিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। পরিহাসনিপুণা নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বাকচতুরা ও পরিহাসনিপুণা নারী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ***শৈবলিনী, বিমলা, মতিবিবি, দেবী চৌধুরাণী, গিরিজায়া, শান্তি, লবঙ্গলতা প্রভৃতি চরিত্রে উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যায়। শৈবলিনী, মতিবিবি, দেবী চৌধুরাণী, শান্তি প্রভৃতি চরিত্র মূলক প্রণয়রসাত্মক হইলেও তাহাদের পরিহাস্যপ্রয়তা ও বাক্‌চাতুর্যের নৈপূন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লরেন্স ফস্টরকে লইয়া শৈবলিনীর রসিকতা ও টমাস সাহেরকে লইয়া শান্তিক অবজ্ঞামিশ্রিত পরিহাস প্রভৃতি বাঙালী মেয়ের দুঃসাহসিক রসবোধ ও অসংকোচ প্রগলভতার দৃষ্টান্তস্থল।" (পূর্বোক্ত)

বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসে কৌতুকরসের অবতারণা করা হয় স্বাদবৈচিত্র্য, ঘটনাবৈচিত্র্য

আনয়নের জন্যে, কখনো কখনো কৌতুকরস আবার স্বল্পকালীন বিরামের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে ভাঁড় জাতীয় চরিত্র নেই। "গম্ভীর রসের উপন্যাসেরও বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক উপাদান রাখতে চাইতেন। স্বাদ-বৈচিত্র্য ঘটাতে, বিরোধী রসের সংঘাতে কোন গম্ভীর ভাবাগের তরঙ্গিত করে তুলতে লেখক এই উপাদানকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। তাকে সংযমের বেড়া ভেঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেননি। চন্দ্রশেখরে রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিতে ব্যক্তিচিত্তের তীব্র দাহের কথা বলা হয়েছে। এরূপ গল্পে কৌতুকের ভূমিকা কমে আসার কথা। আগে অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেমন কপালকুণ্ডলায় তিনি লঘুহাস্যকে দুই একটি গৌণ পাত্রের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যমাত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বিষবৃক্ষে অবশ্য তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং মৃদুহাস্যের কিছু সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন। চন্দ্রশেখরে এই উপাদান বিষবৃক্ষের চেয়েও সঙ্কীর্ণ, তবে কপালকুণ্ডলার মতো প্রায় পরিত্যক্ত নয়।" (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি/ক্ষেত্র গুপ্ত)।

কমেডি বা হাস্যরসের দুটি ধারা প্রচলিত। একটি হলো নর-নারীর অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে যে কৌতুক-রস সৃষ্টি হয়; আর দ্বিতীয় ধারায় মানুষের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যে হাস্যরস উতরোল হয়ে উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্রথম ধারার অনুসারী। জীবনের সংগতি হলো হাস্যরসের মূল উৎস। কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ বা স্বভাবে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে অপরের মনে তা কৌতুক বোধ জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই জীবনের আদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপরীত আচরণ করলে অন্য হৃদয় তাতে কৌতুকরসজনিত আনন্দ লাভ করে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, গুপ্ত কবির হাস্যরস ছিল ভাঁড়ামির নামান্তর। সেই হাস্যরসকে শিল্পী বঙ্কিম পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্মল, সংযত ও শুভ্র হাস্যরসের প্রবর্তন করলেন।

উপন্যাসে হাস্যরসের ক্ষেত্রে বিস্তৃত নয়। মানবজীবনকে পরিস্ফুট করা উপন্যাসের প্রধান কথা। উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই জীবন দর্শনের পরিপূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। সেইজন্য চরিত্রের বৈষম্যমূলক আচরণ, জীবনযাত্রার অসঙ্গতি, শাণিত বুদ্ধির প্রতিযোগিতাকে আশ্রয় করে হাস্যরস সৃষ্ট হয়ে থাকে। কোথাও এটি স্নিগ্ধ, মনোরম ও উপভোগ্য, অপরকে অনাবিল আনন্দ দান করাই এর উদ্দেশ্য, এর মধ্যে বিশেষ কোনো নৈতক তাৎপর্য নাও থাকতে পারে। আবার কোথাও বা তা ব্যঙ্গাশ্রয়ী ও বিদ্রূপপূর্ণ। বিদ্রূপ কখনো পরিহাসে উজ্জ্বল আবার কখনো তীক্ষ্ণ আক্রমণে দীপ্ত। চার্লস ল্যাম্ব অসংগতির ছবি এঁকেছেন কিন্তু তার পশ্চাতে আছে লেখকের গভীর সহানুভূতি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে হাস্যরস সমবেদনার আলোকে এক নতুন বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সুইফ্‌টের রচনায় আছে শাণিত বিদ্রূপ।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসেও বঙ্কিম চরিত্রের অসংগতিজনিত কৌতুকরস আহরণ করেছেন।

নৌকাযাত্রাকালে নগেন্দ্র নদীতীরে ঘাটে স্নানার্থীদের মধ্যে কৌতুককর দৃশ্য অবলোকন করেছেন। স্নানের ঘাটে প্রাচীনদের বক্তৃতা, মধ্যবয়স্কদের শিবপূজা, যুবতীদের ঘোমটা পরা অবস্থায় ডুব দেওয়া, ধার্মিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ধর্মকর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একদিকে গঙ্গাস্তোত্রপাঠ এবং তারই ফাঁকে স্নানসিক্তা যুবতী রমণীকে দেখে নেওয়া, নারকেল গাছে রাজমন্ত্রীর মতো চিলের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ, বকের কাদা-ঘাঁটা, রসিক ডাহুকের ডুব দেওয়া, হঠাৎ ঝড়ের সংকেতে নাবিক রহমৎ মোল্লার নদীর তীর কাছে থাকার দরুণ নিশ্চিন্ততা ও সাহস, বাতাসের দাপটে তার মাথায় টুপি উড়ে যাওয়া— এসকল বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ মনোভঙ্গির আলোকে আপাত সংগতির মধ্যে অসংগতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্তের অন্দরমহলে আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনায়, রন্ধন শালায় স্ত্রীলোকদের স্ত্রীলোকসুলভ কাজ ও কথোপকথনে, অতিথিশালায় বিভিন্ন ধরনের লোকের আগমনে 'নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা' কল কল ধ্বনিতে বিচিত্র ও বিপরীত ধারার সমাবেশে এক সঙ্গতিহীন ঐকতানের মধ্যে কৌতুকাবহ দৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার সূর্যমুখীর একান্ত স্নেহের পাত্র তারাচরণ তাঁর কৃপায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী পান। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চর্তুদিকে বিস্তৃত ছিল ও তিনি সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে বক্তৃতা দিতেন। স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁর এত উদার মনোভাবের কারণ হলো তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। লিবরালিটি দায়িত্ববোধের অভাবে জমে উঠতে পারে না।

অন্দরমহলে স্ত্রীলোকদের হরিদাসী বৈষ্ণবীর রূপের বিচার, গানের তাল বোধের অভাব নিয়ে সমালোচনা— প্রভৃতি পাঠকমনে হাস্যরসের উদ্রেক করে।

অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ বৈষ্ণবীর প্রথমে খুব সুখ্যাতি করলো; তারপর একজন এক একটা খুঁত বার করতে লাগলো :

'স্ত্রীলোকগণের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত স্থির হইল, যে বৈষ্ণবীর নাকটা চাপা রংটা ফেঁকাসে, চুলগুলি মোটা, কপাল উঁচু, ঠোঁট পুরু, গড়নটাও ভাল নয় এবং তাহার গলার সুরও মোটা ও তাহার একটুও তাল বোধ নাই।'

মহিলাদের এই সংকীর্ণ মনোভাব কৌতুকাবহ।

দেবেন্দ্রর তামাক সেবন ও মদ্যপান বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধির সংঘাত জনিত হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধির সংঘাতজনিত হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ বস্তুকে অলংকরণের বিশ্লেষণে অসামান্য করে তোলার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।

দেবেন্দ্র যেখানে তামাক সেবন করতে গিয়ে হুঁকোর স্তুতি করেছেন :

'হে হুঁকো! হে আলবোলে! হে কুণ্ডলাবৃত ধুমরাশি সমুদ্‌গারিণি! হে ফণিনী-নিন্দিত দীর্ঘনল সংসর্পিণি! হে রজত কিরীটমণ্ডিত শিরোদেশে-সুশোভিনি! কি বা

তোমার কিরীট বিশ্রস্ত ঝলমলায়মান! ... ... হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজন শ্রমহারিণী অলসজন-প্রতিপালিনী ভার্য্যাভর্ৎসিত-জনচিত্তবিকার বিনাশিনী। প্রভুভীতজন-সাহস-প্রদায়িনি! মূঢ়ে তোমার মহিমা কে জানিবে!"

এখানে কৌতুকরস বুদ্ধিগ্রাহ্য।

দেবেন্দ্রের মদ্যপানের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় : —

"তখন সেই অমল শ্বেত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্য গগনশোভিরক্তাম্বুদতুল্য বর্ণ বিশিষ্টা দ্রব্যময়ী মহাদেবী, ডেকান্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিত হইলেন। কাট্‌গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড জগ তাম্রকুণ্ড হইল এবং পাকাশালা হইতে এক কৃষ্ণকুর্চ পুরোহিত হট ওয়াটার প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট মটন এবং কাটলেট নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল!"

নগেন্দ্রনাথের অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারের সঙ্গে সূর্যমুখীর কথোপকথন ও রোহিণীকে পরীক্ষা না করে ঔষধ দানে কিছুটা কৌতুকের আভাস পাওয়া যায়।

নগেন্দ্রভগিনী কমলমণি ও তার স্বামী শ্রীশচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে নির্মল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

হীরা সূর্যমুখীর কথায় ও পুরস্কার লাভের আশায় হবিদাসী বৈষ্ণবীর আসল পরিচয় জানতে গিয়ে দেবেন্দ্রর নিকটে ধরা পড়ে গেল। দেবেন্দ্র হীরাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দেবীস্তোত্র পাঠ করলেন। এখানে দেবেন্দ্রের মনের সরসতার প্রকাশ ঘটেছে।

হীরার কথাতেও কৌতুকরসের প্রকাশ ঘটেছে। দেবেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা হীরা দেবেন্দ্র তাকে ডেকেছেন, এই সংবাদ তাঁর সই গঙ্গাজলকে দিতে এলো। সে বললো,— 'ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমার দেখা পাই, কিন্তু এখন কেন?'

হীরার অসুখের কথা শুনে ডাক্তার তার হিষ্টিরিয়ার জন্য কাষ্টর অয়েল দিলেন। প্রতিবেশীর প্রশ্নের উত্তরে হীরার আয়ি উত্তর দিল 'হীরের ইষ্টিরস হয়েছে। তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম; সে একটু কেষ্টরস দিয়েছে। তা হাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?' লোকব্যুৎপত্তির এই উদাহরণ কৌতুককর।

বঙ্কিমযুগে যখন হাস্যরস পরিমার্জিত ছিল না তখন তিনি জীবনসমুদ্র মন্থন করে হাস্যরস আহরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু যুগের অসংগতি ও বৈসাদৃশ্যকে অবলম্বন করে তাঁদের রচনায় হাস্যরস পরিস্ফুট করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম ছিলেন জীবনশিল্পী, তিনি মানব জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার আচার-আচরণের বৈষম্য থেকে হাস্যরসের উপাদান গ্রহণ করেছেন।

১৩। বিষবৃক্ষ : নিসর্গ প্রকৃতির ভূমিকা

সাহিত্য সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই নিসর্গ-প্রকৃতি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নিসর্গ বৈচিত্র্য সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। চরিত্রের মানসিকতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, জটিলতা, সম্পর্ক, হৃদয়ের যে কোনও ভাব উন্মোচন ক্ষেত্রে নিসর্গ-প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেও নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনাও প্রভাব লক্ষ্যগোচর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসেই প্রকৃতি আছে। বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রকৃতি প্রাণসত্তা নিয়ে উপস্থিত। কখনও সে নিসর্গ রহস্যময়ী বিশ্বশক্তি, কখনও চিদানন্দের উৎস, কখনও জীবনের ধাত্রীরূপা। তাঁর কাছে প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যের লীলাচঞ্চল মূর্তি নয়, তা সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে মানবজীবনের সঙ্গে।

১. নদী :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নদী বিশাল, কূলহীন; ঔপন্যাসিক এ নদীর কোনও নাম না বললেও মনে হয়, এ নদী গঙ্গা। নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে যে নদীতে নৌকারোহণে গমন করছিলেন সেখানে আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি নগেন্দ্র দত্তকে এক অপরিচিত বনময় গ্রামপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। নগেন্দ্রনাথ সেখানে উপনীত হয়ে এক জীর্ণ অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে স্তিমিত দীপালোকিত মৃত্যু শয্যায় এক বৃদ্ধ— এমনই এক পটভূমিতে নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনীর কৈশোর সৌন্দর্য প্রথম দেখলেন। 'বিষবৃক্ষে'র নদীযাত্রা ও ঝড়বৃষ্টি নিঃসন্দেহে দুর্দিনের প্রতীক হলেও এ অংশটির যে সৌন্দর্য আছে তা উপেক্ষা করা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের নদীপথ বর্ণনায় বেশ কিছু সময় ব্যয় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের আনন্দেই নদী ও নদীতীরের কৌতুকময় জীবন্তচিত্র রচনা করেছেন। এই জাতীয় চিত্রধর্মী বর্ণনা মূলকাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, এই বর্ণনাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবদৃষ্টি ও চিত্রনিপুণতার পরিচয় প্রকাশিত : "নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে— ছুটিতেছে-বাতাসে নাচিতেছে— রৌদ্রে হাসিতেছে— আবর্তে ডাকিতেছে। জল আশ্রান্ত, অনন্ত ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহবা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহবা মারামারি করিতেছে....."।

২. বাপীতট :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাপীতট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাপীতট ও কুন্দ যেন সমসূত্রে গ্রথিত। অনাদৃতা কুন্দ আর স্নেহময়ী প্রকৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে বাপীতটের বর্ণনা যেন কবি বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি : "প্রদোষকালে

উদ্যাসমধ্যস্থ বাপীতটে ..... বকুলের তলায় সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবর হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।..... আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরস্থ : বকুলপত্র মালায় মর্মরশব্দ করিতেছিল"। আলোচ্য উপন্যাসে আত্মমগ্ন কুন্দনন্দিনী মূর্তিমতী সৌন্দর্য আর সরলতার প্রতীক; বাপীতটে শীতল জল, সুগন্ধি বায়ু, প্রস্তরসোপান, বকুলতলা, বিচিত্র পুষ্পসমারোহ ইত্যাদির বিচিত্র পরিবেশে কুন্দনন্দিনীর রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন অশ্রু ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর প্রেমসংকট ও মৃত্যুবাসনার সঙ্গে জলের সংযোগ অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় 'বিষবৃক্ষে'ও অনুপস্থিত নয়। দীঘিকেন্দ্রিক মানসদ্বন্দ্ব বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নিপুণ সৌন্দর্য অঙ্কিত। প্রেমিকার চরিত্র ও প্রেমের প্রকৃতি দীর্ঘিকাতটের নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে সমসূত্রে বিজড়িত। কুন্দর কোমল করুণ, নির্বাক প্রেমের পরিবেশটিও ঔপন্যাসিকের স্নিগ্ধ লেখনীতে রূপায়িত। কুন্দ ও নগেন্দ্রের পারস্পরিক হৃদয়সংবাদ বিনিময়ের জন্য বাপীতট উপযুক্ত স্থান। এই প্রাকৃতিক পরিবেশেই নায়ক-নায়িকার প্রেমের স্বরূপ প্রকাশিত; নির্বাক কুন্দর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা ও দুর্লভ প্রলোভনের লগ্নও বাপীতটেই উন্মোচিত।

৩. পুষ্প :

পুষ্পরাশি পরিবৃত গ্রামীণ প্রকৃতির সাহচর্যে ও সংস্পর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে। বাংলাদেশের সুগন্ধি ও বৈচিত্র্যমন্ডিত পুষ্পরাজি তাঁর মনকে সৌন্দর্য পিপাসু ও রোমান্টিক করে তোলে। গ্রামের অর্জুনদীঘির পাড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে রচিত পুষ্পোদ্যান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'অধঃপতন সঙ্গীত' ও 'জলে ফুল' কবিতাদুটি তার পুষ্পোদ্যানের ও অর্জুনদীঘির প্রভাবে রচিত বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের নায়িকাদের চেতন-অবচেতন মনের বিশ্লেষণ অনেকক্ষেত্রে পুষ্পপ্রসঙ্গ আনয়ন করেছেন। রজনী, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাধারানী, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি উপন্যাসে পুষ্পরাজি এবং নায়িকা প্রায় অভেদাত্মক হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুষ্পারাজির ভূমিকা যথাযথ অর্থেই স্মরণীয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপকরণ রূপেই নয়, নায়িকার রূপ-গুণ বর্ণনায় ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পুষ্পের ভূমিকা বঙ্কিম-উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটনে পুষ্পরাজি যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি সংস্কৃতরীতির অনুসরণে বেশ কয়েকটি অলঙ্কার সৃষ্টিতেও প্রয়াসী হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' নগেন্দ্রনাথের গৃহে যে বকুলবৃক্ষ ছিল, কুন্দনন্দিনী সেই বকুলবৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়েছিল নগেন্দ্রকে দেখবার জন্য। এ তথ্য উপন্যাসের ৩৩ পরিচ্ছেদে আছে। "বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বকুলবৃক্ষ ও বকুলফুলের ভূমিকা বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে, পটভূমি রচনায় ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অসাধারণ।

বঙ্কিম মানসকন্যা কুন্দ কবিহৃদয়ের সমস্ত মমতায় নিষিক্ত। স্নিগ্ধ ও সুচিন্তিত সরলতায় কুন্দ যেন স্বর্গস্খলিতা দেবকন্যা"। (বঙ্কিম /জয়ন্তী সাহা)

সমালোচকের বক্তব্যের পক্ষে দুটি উদাহরণ :

১. 'প্রদোষকালে উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী।'

২. 'পুষ্পরিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তর খচিত লতামন্ডপ ছিল।

দুই ধারে দুইটি বহুকালের বড় বকুলগাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে, একাকিনী বসিয়া।'

আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত কুন্দ যখন সমবেদনাহীন, সমব্যথী হীন তখন একমাত্র কোমল, সুন্দর পুষ্পরাজি তাকে স্নেহচ্ছায়া দান করেছে।

'শীতল বায়ু সরোবর পার হইয়া ইন্দীবর কোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া আকাশ চিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপাত্রমালায় মর্মর শব্দ করিতেছিল। বকুল পুষ্পকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল'।

বকুল ও অন্যান্য পুষ্পরাজির পরিবেশে কুন্দনন্দিনীর সুকুমার ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন প্রকাশিত তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনার সৌন্দর্য ও নিপুণতাও প্রকাশিত।

এমনকি প্রতিহিংসাপরায়ণ হীরাদাসীর আমলেও মল্লিকা ফুল বিকশিত। পুষ্প প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষে' ভাবগত উপমার উপস্থিতি ও লক্ষ্যগোচর। যেমন— 'কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল'।

৪. বিহঙ্গ :

বিহঙ্গ, নিসর্গজগতের অন্যতম উপাদান হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শুধুমাত্র নৈসর্গিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত না হয়ে প্রতীকী দ্যোতনায় রূপায়িত। বিশেষ পটভূমিকে প্রকাশিত বা অলঙ্কৃত করার জন্যে বঙ্কিম-সাহিত্যে বিহঙ্গের উপস্থাপনা ঘটেছে। তবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিহঙ্গের যে ভূমিকা ও অবতারণাগত তাৎপর্য তা অন্যত্র দুর্লভ।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রভাতকালীন সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে কোকিলের কুহুতান শোনা যায় পাপিয়া ও অন্যান্য পাখিদের কলধ্বনির সঙ্গে। কুন্দ নগেন্দ্রের উদ্যানে তাঁর দর্শনের জন্য যখন প্রতীক্ষানিরতা, বঙ্কিমের বর্ণনায় :

১. 'তখন পাপিয়া..... ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গন্ডগোল করিতে লাগিল।'

২. 'কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কলাবনে লুকাইয়া গলা বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।'

৫. ঝড়-মেঘ-বৃষ্টি-রাত্রি-প্রভাত :

'বিষবৃক্ষ' সমস্ত মানব মানবীর পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বলে এখানে নিসর্গের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃতি জগতের দুর্যোগের আলোড়ন অনেক সময় মানুষের গৃহজীবনকে অস্থির করে তোলে। আসার নৈসর্গিক ঝঞ্ঝার বিরতি ঘটলেও কখনও তা আবার মানব জীবনে আলোড়ন সঞ্চারিত করে দেয়। ঝড়-মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির ভূমিকা মানবজীবনে কখনও দুর্যোগ, কখনও প্রশান্তর ইঙ্গিত বয়ে আনে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের আলোচনায় দেখা যায় তার সূচনায় দুর্যোগ, মধ্যে দুর্যোগ, অন্তে দুর্যোগের পরিসমাপ্তি। উপন্যাসের প্রারম্ভে মেঘাবৃত রাত্রি; আর সমাপ্তিতে সূর্যালোকিত প্রভাত।

উপন্যাসে প্রকৃতির এই যে দুর্যোগময়তার বলি কুন্দনন্দিনী— উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। "পবিত্রতায়, সরলতায়, কুন্দ স্বর্গীয় কুসুম, একটি গাঢ় দুর্যোগের সন্ধ্যায় আশ্রয়স্বজনহীনা এই বালিকা আকস্মিকভাবে এই কাহিনীর সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে, আর একটি দুর্যোগরাত্রির শেষে সংসারের অন্ধকার কোণে অনাদরে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই উপন্যাসের ঘটনাসমূহের গতিপরিণতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করলে মনে হয়, কিশোরী নায়িকাটিকে লেখক নিবিড়তম মমতায় সৃষ্টি করে গভীরতম বেদনায় প্রায় মৌনী করে রেখেছেন, তাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য নৈসর্গিক দুর্যোগের পটভূমিকা বারবার প্রয়োজন হয়েছে। অপ্রগল্‌ভা কুন্দর নির্বাক্ অথচ নির্মম অন্তর্দ্বন্দ্বকে সবাক করে তুলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কতখানি সক্ষম হয়েছে, কোনও মানবিক উপকরণ দ্বারা তা বোধ হয় সম্ভবপর হত না। অবশ্য অঙ্কন করে কুন্দনন্দিনীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা রচনা ছাড়াও লেখক উপন্যাসের অন্যতর প্রয়োজনও পূরণ করেছেন, ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, প্রতীকী তাৎপর্য বিন্যাস করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যের কেন্দ্রেই কুন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি ও চিত্রশিল্পীর মন সজাগ হয়ে উঠেছে তখনই, যখন নিসর্গ দুর্যোগের পটভূমিকায় পটচিত্রটি হয়ে উঠেছে কুন্দনন্দিনী। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাকৌশল নৈসর্গিক দুর্যোগচিত্র, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী উপস্থাপনা এবং পটভূমির ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুসমঞ্জস হয়ে উঠেছে। বর্ণনার চিত্রধর্মী নৈপুণ্য কাহিনীর অন্তর্গত ভাবকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।"

(বঙ্কিম বীক্ষা / জয়ন্তী সাহা)

জ্যৈষ্ঠের এই তুফান, মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ এ যেন সাংকেতিক— কাহিনীমধ্যস্থ দুর্ভাগ্য, বিপর্যয়ের পূর্ব সংকেত। এখানে দুর্যোগ বাহ্যিক হলেও, বর্ণনায় বস্তুগত বৈশিষ্ট্যই মুখ্য। বর্ণনা লঘুভার থেকে ক্রমশ গভীরতা লাভ করে যেন একটা ভীষণতার অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে :

"ঝড় ক্ষণকাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল।...

আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময় হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপীসকল, সহস্র। সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল.... নববারি সমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল।.... ঝিল্লীরব..... রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব..... বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপথের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ,..... পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষবিধূনন শব্দ....।"

এই দুর্যোগেরই পরবর্তী অংশে গভীর অন্তর্বেদনায় নির্বাক কুন্দের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা প্রকাশিত : "নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ..... নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা, বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপথে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহে কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল।"

আবার সূর্যমুখীর তিরস্কারে অভিমানিনী কুন্দের নগেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ করে নিশীথে অপরিচিত পথে একাকিনী যাত্রায় একদিকে তীব্র অভিমান, অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে তার বার বার ফিরে আসা, সম্মুখে আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন নিষ্ঠুর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ঘন দুর্যোগময় মেঘমন্দ্রিত রাত্রির পটভূমিতে নিঃসঙ্গ অজানা পথে পথযাত্রিণী কুন্দনন্দিনী যেন একটি কঠিন দুর্ভাগ্যের পরম করুণ ও কাব্যিক চিত্রপট।

এই অংশের বর্ণনাভঙ্গী যেন কুন্দের ভাগ্যের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে :

'রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য...। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে— তাহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে— তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। .... ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সার্সী খুলিল। .... নগেন্দ্র..... নগেন্দ্র.... চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথাও যাও?'.... পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, 'কোথাও যাও?' ...কুন্দ চলিল..... আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল— মেঘসকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল— বিদ্যুৎ হাসিল— আবার হাসিল— আবার! বায়ু গর্জিল, মেঘ গর্জিল— বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?'

এই ঝড়, বৃষ্টি, মেঘাড়ম্বর বাস্তব হলেও মনস্তাত্ত্বিক, কুন্দনন্দিনীর দুর্ভাগ্য ও মানসদ্বন্দ্বের প্রতিফলন।

কুন্দের বিষপানে মৃত্যুর রাত্রিও সমাপ্ত হয়েছে দুর্যোগে ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে, নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর জীবনে দুর্যোগ এসেছিল কুন্দর সঙ্গে সঙ্গেই। আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে কুন্দ

নগেন্দ্রর সংসার থেকে যখন অপসৃত কাহিনীরও মেঘও প্রভাত আলোয় সূর্যমুখীকে ফিরে পেয়ে সংসার আনন্দিত হল। এই রাত্রিতে যে বাত্যা এবং বর্ষণ তা সম্পূর্ণই প্রতীকী।

'এখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না, পূর্বদিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল।'

রাত্রি 'প্রভাত' প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। হিংসা, মৃত্যু, মৃত্যুর মুহূর্ত, ভীতি, অনিশ্চয়তা, প্রণয়ের উন্মাদনা, বেদনা, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্তই রাত্রিতে অধিক প্রকাশিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

"অপমানিত কুন্দ প্রেমের সকরুণ দুর্বলতায় অশান্ত হৃদয়কে, সবল শাসিত করে অভিমানে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করলেন। বাইরে ঘন দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি, কুন্দর অন্তরেও সেই তমিস্রার ছায়া। একান্ত অসহায় কিশোরী, সম্মুখে মৃত্যুর মত্রে ভয়ঙ্কর এক অজানা পথ, অনিশ্চয়তার শঙ্কায় বিভীষিকাময় তথাপি 'কুন্দ চলিল।' ভীষণতায় গাম্ভীর্যে রাত্রির এই চিত্রটি পাঠকের কল্পনাকে শিহরিত করে। কুন্দর নিদারুণ অসহায়তা আর রাত্রির অন্ধকার এবং দুর্যোগের ভীষণতা দুই-এর বৈপরীত্য এই রাত্রির বর্ণনায় সুপরিস্ফুট। নিশীথিনীর এই মসীময়ী মূর্তির একটি মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা আছে। এই পটভূমি কুন্দর ভাগ্যের অনিশ্চয়তা ও তার মানসদ্বন্দ্বের পরিচায়ক।"

(বঙ্কিম বীক্ষা / জয়ন্তী সাহা)

"রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাক্‌চিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে, ফুটিতেছে। ..... আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে..... আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ির চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, ... বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচীভাষায় কুন্দর মাথার উপর কথা কহিতেছে। .... কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে, ... আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল— মেঘসকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল— বিদ্যুৎ হাসিল..... বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল, বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?"

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ঘনবর্ষার তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে পথ চলতে চলতে যখন দিশাহারা তখন তিনি শায়িত মনুষ্য শরীর অনুভব করলেন। পথিপার্শ্বে শায়িতা মুমূর্ষু নারী স্বয়ং নগেন্দ্রপত্নী সূর্যমুখী। ঘনঘোর রজনীতে ভাগ্য বিড়ম্বিত সূর্যমুখী পথভ্রষ্টা— তাঁর জীবন লক্ষ্যহীন, পরিণামহীন। এমন এক রাত্রিতে তাঁকে মরণাপন্ন অবস্থায় পথিপার্শ্বে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র সূর্যমুখীর বেদনাকে মর্মবিদারী করে তুলেছেন।

"বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় না। .... ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল— অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল— পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। ....রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী আকাশেব মুখে

কৃষ্ণাগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে। সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়"।

সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রনাথ তাঁর সন্ধানে গোবিন্দপুর যান। সেখানে সূর্যমুখীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি শোকার্তচিত্তে যখন শিবিকায় ফিরছিলেন তখন শিবিকাদ্বারপথে দেখলেন কার্তিকী জ্যোৎস্নার রূপ— যা একান্ত সুন্দর নিষ্ঠুর! স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠল। এইরকম কত মোহিনী রাত্রি নগেন্দ্র সূর্যমুখীর দাম্পত্য-জীবনের সুখ-স্মৃতিতে বিধৃত, কত আনন্দ, কত ভালোবাসা এই চন্দ্রকিরণস্নাত নিশীথের সঙ্গে বিজড়িত। আজ শোকাহত অনুতপ্ত নগেন্দ্র তাই এই সৌন্দর্যকে সহ্য করতে পারছেন না— তাঁর কৃতকর্মের জন্য গ্লানি এবং সূর্যমুখীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় রূপসী রাত্রি তাঁর কাছে একান্ত হৃদয়হীনায় পরিণত হয়েছে।

"রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রি নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। ..... পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল।..... জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না....।"

নগেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের আর একটি শুক্লপক্ষের রাত্রি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে। নগেন্দ্র গঙ্গাবক্ষে; নৌকারোহণে কাশীত্যাগ করে রাণীগঞ্জ চলেছেন মৃতপ্রায় সূর্যমুখীর সন্ধানে। 'নিশা চন্দ্রহীনা' কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, পৃথিবী সজ্জিতা। প্রকৃতির এই আনন্দযজ্ঞ নগেন্দ্রনাথের বক্ষে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা ধরিয়ে দিল।

"....নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে— গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেইদিকে আকশে নক্ষত্র!— অনন্ততেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে....। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ! নীলাম্বরবৎ স্থির নীল তরঙ্গিনীহৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। ..... আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত— আকাশ, নগর, নদী— সকলই জ্যোর্তিবিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য তাহার আজি সহ্য হইল না।"

১৪। বিষবৃক্ষ : শিল্পরীতি • ভাষা

কাহিনী, আখ্যায়িকা, চরিত্র ইত্যাদি উপন্যাসের বিষয়ভুক্ত। এগুলিতে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে। শিল্পরীতি হল উপন্যাসে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার নির্মাণশৈলী, উপন্যাসের প্রাকরণিক সাফল্যের প্রসঙ্গই এখানে বিবেচিত হয়। নাটকীয়তা, ভাবাদর্শ, ভাষা ব্যবহার, সংলাপ, প্রকৃতিচিত্র ইত্যাদি শিল্পরীতির বিচারে আলোচ্য। এগুলিকে উপন্যাসের রূপতত্ত্বের উপাদান বলা চলে। অবশ্য রূপতত্ত্বের প্রধানতম মৌলিক উপাদান হল আখ্যায়িকার বয়ন-কৌশল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রূপতত্ত্বঘটিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকার নির্দেশ করলে দাঁড়ায় যে, তিনি কাহিনী গ্রন্থনে বা আখ্যায়িকা গঠনে বৃত্ত-ভঙ্গির অনুরাগী। পাত্রপাত্রীর আভ্যন্তর হৃদয় বা বহিরঙ্গ ঘটনাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব সেখানে প্রাধান্য পায়। একাধিক উপকাহিনী মূল কাহিনী গ্রন্থনের কালে জটিলতার সৃষ্টি করে। তাঁর কাহিনীগ্রন্থনে ঘটনাবাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের বিবৃতি বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান তাঁর শিল্পরীতির উৎকর্ষের পরিচয়বাহী। তিনি সংলাপে সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করেন। নাট্যরীতির প্রতি তাঁর প্রবণতাও দুলর্ক্ষ্য নয়। তাঁর উপন্যাসের বর্ণনারীতি পরিবেশগত ও মানবসংসার কেন্দ্রিক। পরিবেশ বর্ণনায় থাকে প্রকৃতি এবং গৃহ আসবাব ইত্যাদির রীতি পরিচয়। আর মানবসংসারের বর্ণনা কেন্দ্রীভূত থাকে রূপ, পরিচ্ছেদ ও প্রসাধনের কথায়। তাছাড়া কাহিনী ও চরিত্রের সার্থক রূপায়ণের জন্যে তিনি চিঠি, উইল, গান, স্বপ্ন, অতিলৌকিক সংকেত, জোতিষীর গণনা, সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষের উপস্থিতিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপতত্ত্বের জন্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি বিশেষ তাৎপর্যবাহী ও সার্থকতাবাহী। এর মাধ্যমে পটভূমির ভাবরস যেমন সৃজিত হয়, তেমনি মানব-স্বভাবের অন্তর্জগৎ পাঠকের গোচরে আসে। বঙ্কিম-উপন্যাসে রূপতত্ত্বের প্রয়োগ স্মরণীয় কৃতিত্বের দাবি রাখে।

উপন্যাসের শিল্পরীতি ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যে বলেছেন :

"বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত উপন্যাসের ভাষা অতিসচেতন মননের ফল। ....ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যপন্থী।..... বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতির মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন।.... কিন্তু উপন্যাস শিল্প। তার মধ্যে কোন সাধারণ আদর্শ সর্বজনীন অনুসরণযোগ্য ভাষারীতির সন্ধান করা চলে না। তা মূলত শিল্পীর ব্যক্তিগত এবং শেষপর্যন্ত অনুকরণের বাইরে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বিচিত্র মনোভাব, প্রবৃত্তিতরঙ্গ, রূপবর্ণনা, ঘটনাগতি সৃষ্টির অভিপ্রায় ভাষার নানা ধরনের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কোথাও ভাষা চঞ্চল, দ্রুতগতি, কখনও মন্থর। কখনও বিপরীত লয়ের উত্থান-পতন। ছোটবড়ো নানা আকাশের বাক্য তিনি মিশিয়েছেন, নানা জাতের শব্দে যোজ্যতা ঘটিয়েছেন। আবার কখনও প্রশ্নাত্মক নির্দেশক বিস্ময়বোধক বাক্য

একে অপরের গায়ের উপরে পড়েছে, এবং অর্ধসমাপ্ত বাক্যের প্রয়োগেও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সংলাপের ভাষায় নাটকীয় তৎপরতা, স্থিরচিত্রে ভাষার কৌশলে গতিময়তা সৃষ্টি, সংক্ষিপ্ত কথার নিগূঢ় ব্যঞ্জনাধর্ম এবং বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা ও বস্তুনিষ্ঠা লক্ষণীয়। আবার সে ভাষা যখন অলঙ্কৃত যখন চিত্রময় তখন ঐশ্বর্য বর্ণাঢ্যতা প্রকাশই লক্ষ্য।"

উপন্যাসে ঘটনার সুবিন্যাস ও বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র প্রস্ফুটিত করা হয়। ঔপন্যাসিক নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র, অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তাদের পরিণতি দেখান, তথাপি তাঁর অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ থেকেই যায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাব ও ভাবনা রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। বর্তমানে উপন্যাসে চরিত্র-বিশ্লেষণকে অত্যধিক মূল্য দেওয়ায় পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অপরাপর ব্যক্তিত্ব অজানা থেকে যায়। কিন্তু স্থান বিশেষের সজীবতা আছে কারণ তা চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্থান বর্ণনা উপন্যাসে কোথাও শুধু অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়, আবার কোথাও তা বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনারীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হ'লে দুটো দিক থেকে তা বিচার্য। একদিকে তাঁর বর্ণনা বহিরাশ্রয়ী স্থান ও পাত্র-পাত্রীকে অন্যদিকে চরিত্র-আশ্রিত স্থানকে নিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি সজাগ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে জীবনরস রসিকের দৃষ্টিতে পরিবেশ রচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি সংযত, গম্ভীর ও বিশ্লেষণধর্মী। উভয় ধারা পৃথক পাত্রে প্রবাহিত হয়ে কাহিনী ও চরিত্রকে ব্যাপ্তি দান করেছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের কলকাতাগামী নৌকাযাত্রাকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে গ্রাম বাংলার ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্ন-পত্রাবলী'তে এই ধারা অনুসরণ করেছেন। তবে উভয়ের বর্ণনারীতিতে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা ব্যক্তি নিরপেক্ষতাহেতু নির্লিপ্ত, কৌতূহলী ও সেখানে বস্তুরস প্রাধান্যলাভ করেছে। আর 'ছিন্নপত্রাবলীতে' রবীন্দ্রনাথ বাংলার নদী ও পল্লী জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা কালে নদীপ্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর নদীতীরের বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, উপন্যাসে প্রযুক্ত তাঁর ভাষা বিষয়ানুগ ও প্রকাশক্ষম। উপন্যাসে প্রযুক্ত তাঁর ভাষার অন্যতম উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। কোনও সুষ্ঠু প্রকাশ ও বিষয়ানুগতা মুখ্য নয়; সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ভাষা ব্যবহারের বঙ্কিমচন্দ্র কখনো কখনো ভাষাগত সরলতা বর্জন করে ভাষাকে অলংকার বহুল করেছেন। লঘু ও গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় ভাষা নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কখনো কখনো তৎসম শব্দের বাহুল্য, সমাসবদ্ধ শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, যুক্তাক্ষরের প্রাচুর্য, উপমাদির ব্যবহার, ভাষার বয়নে সংস্কৃতানুসারিতা ইত্যাদির সঙ্গে অলংকৃত বাক্য, তদ্ভব ও দেশি শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদির প্রয়োগও অনুল্লেখ্য নয়।

'নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে'— ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—

রৌদ্রে হাসিতেছে— আবর্তে ঢাকিতেছে। জল অশান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়।' আর নদী-তীরে 'মাঠে মাঠে, রাখালের গোরু ঠেঙাইতেছে, কৃষক লাঙল চবিতেছে, গোরু ঠেঙাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে।' নদীর ঘাটে সমবেত স্নানার্থীর বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। গ্রাম-বাংলার দরিদ্র্য কৃষকদের কুল-কামিনীদের বর্ণনা একান্ত বস্তুনিষ্ঠ রূপে তিনি চিত্রিত করেছেন। নদীর ঘাটে প্রাচীনরা বক্তৃতা দিচ্ছেন, মধ্যবয়সীরা শিবপুজো করছেন আর লজ্জাশীলা যুবতীরা ঘোমটা দিয়ে ডুব দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা গঙ্গাস্তব পাঠ করাবার ফাঁকে ফাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যুবতীদের দেখে নিচ্ছেন। আকাশে রৌদ্রতপ্ত সাদা মেঘ ছুটে চলেছে, নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়ছে, নারকেল গাছে ছিল বসে রাজমন্ত্রীর মতো চারদিক দেখছে, বক কাদা ঘাটছে, ডাহুক রসিকের মতো ডুব দিচ্ছে আর পাখী কেবল উড়ছে। হাটুরিয়া নৌকো হটর হটর করে যাচ্ছে, খেয়া নৌকো গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে।

'ইতিমধ্যে আকাশে ঝড়ের সংকেত দেখা দিল। আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাতা একটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। ... ...

ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি করিতে আরম্ভ করিল। ...ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা করিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছিঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে।'

প্রকৃতির তাণ্ডবময়ী ভয়ঙ্করী রূপ দেখে নগেন্দ্রনাথ নৌকায় থাকা নিরাপদ নয় বিবেচনা করলেন। কিন্তু ঝড়ের ভয়ে নৌকা থেকে অবতরণ করলে মাঝিদের কাছে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হবার জন্য তিনি দ্বিধা করছিলেন, এমন সময়ে মাঝি রহমৎ মোল্লার কথায় তিনি নৌকা থেকে নামলেন।

নিরাশ্রয় নদীতীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নগেন্দ্রনাথ আশ্রয় সন্ধানে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি দেখলেন :

'আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষ কালেই ঘনতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জন বিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল— স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে পূর্বোক্ত চিত্র এঁকেছেন। বৃক্ষাগ্র থেকে বৃক্ষপত্রে বারিবিষ্ট পতনজনিত শব্দ, অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদ সঞ্চারের পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচন হেতু পক্ষ বিধূনন ধ্বনি, শমিতপ্রায় বায়ুর গর্জন তিনি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দকে নিয়ে তাঁর গ্রামে গোবিন্দপুরে এলেন তখন

দরিদ্র বালিকা কুন্দ বিস্মিত হয়ে জমিদার গৃহের বিলাসিতা দেখছে। এই গৃহের ভেতরে ও বাইরে তিন তিন করে ছয় মহল। এক একটি মহল যেন বৃহৎ পুরী। প্রথমে সদর মহল, ফটক দিয়ে তৃণশূণ্য রক্তবর্ণ প্রশস্ত পথে যেতে হয়। এর দু'দিকে নবতৃণবিশিষ্ট ভূমি ও কুসুমাচ্ছাদিত মণ্ডলাকৃতি বৃক্ষসমূহ। সম্মুখে উচ্চ দেড়তলা বিশিষ্ট নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের বামে ও দক্ষিণে সারি সারি একতলা কোঠা। এখানে দপ্তরখানা, কাছারী, তোষাখানা ও ভৃত্যবর্গের আবাসস্থল অবস্থিত। ফটকের দুই ধারে দ্বাররক্ষকদের বাসস্থান।

এর পরে অতি প্রশস্ত পূজাবাড়ী ও অতিথিশালা। পূজাবাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হয়। তার পারে ঠাকুরবাড়ী। 'সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাট-মন্দির", তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারী দিগের থাকিবার ঘর অতিথিশালা।' অতিথিশালা বিচিত্র লোকে পরিপূর্ণ।

বর্হিমহলের পশ্চাতে তিনটি অন্দরমহল। কাছারী বাড়ীর পেছনে নগেন্দ্রনাথ, তাঁর ভার্যা ও পরিচারিকাগণের বাসস্থান। এই মহলটি পরিপাটি করে নির্মিত। পূজাবাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর, আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ,— 'নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা কল কল করিতে ও সকলের মিলিত কলবরে 'সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।'

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে রন্ধনশালার বর্ণনা দিয়েছে। পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, পশুশালা প্রভৃতির বর্ণনায় বস্তুরসের পরিচয় পাওয়া যায়।"নগেন্দ্রর বাড়ির অবস্থান্তর তার চিত্তরূপান্তরের সমান্তরাল। রূপকধর্মী কোন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এই গৃহের ঐশ্বর্য বিশালতা বহুলতা আনন্দ-তরঙ্গ হাস্যধারা নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের প্রতীক। সেই জীবন ও প্রেমের বিপর্যয়ে গৃহ শূন্য শ্রীহীন ভগ্ন। আবার ভগ্নগৃহের সংস্কারে পুনর্মিলনের ভূমিকা রচনা করেছে। অপরপক্ষে কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের একবার মাত্র প্রণয়ালাপ উদ্যানে। নিজ হৃদয় দিয়ে কুন্দের সুখানুভব ও বেদনাশিহরণ উদ্যানে। কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহের নয়, উদ্যানের। তার অবস্থানে গৃহের হাস্য ঔজ্জ্বল্য ও পূর্ণতা ফিরে আসে না। শুধু গৃহবর্ণনা, উদ্যান চিত্ররচনা ও তাদের বিন্যাস-কৌশলে অনায়াসে বঙ্কিম এরূপ একটি গূঢ় ভাবের সঙ্কেত দিয়েছেন।" *(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্র গুপ্ত)*

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি যে বর্ণনার ধারা প্রকাশ করেছেন, তা চরিত্রাশ্রিত এবং চরিত্রের পরিচয়মূলক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কন্যার ভবিষ্যৎ কল্পনায় কাতরতা ও মৃতদেহের পাশে কিশোরী কন্যার নিদ্রার যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা সংযত ও ভাবালুতা বর্জিত— 'শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাহার শব পড়িয়াছিল, সেইখানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। *** দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার

তন্দ্রা আসিল। কুন্দ-নন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্ত হস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্মতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহুপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।'

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা স্মৃতিচারণের পথে নগেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। এই বর্ণনার বিরলতা বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ করেছেন শ্রীশ ও কমলমণির মেঘবৃষ্টি ও সূর্যালোকিত দাম্পত্য জীবনের অপূর্ব বর্ণনা দিয়ে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কুন্দের মানসিক আলোড়নের পটভূমিকা রচনা করেছে সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা, পুষ্পোদ্যান, দীঘির চারিপাশের বৃক্ষসমূহ, খদ্যোতমালার আলোকস্ফুরণ, বকুল ফুলের নিঃশব্দ বর্ষণ। আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে মৃত মানুষের দীপ্ত প্রকাশ, মৃত্যুর পরে নক্ষত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে কুন্দের মানসিক অস্থিরতা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা-রীতি কোথাও পরিমিতির সীমা লঙ্ঘন করেনি। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ বর্ষীয়া কুন্দের গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ, নগেন্দ্রের শয়নগৃহের কাছে তার উপস্থিতি, অন্ধকারে খদ্যোতের আলো, মেঘাবৃত আকাশ, ঝাউগাছগুলোকে নিশাচর পিশাচের মতো বোধ হওয়া, কালপেঁচার ডাক, কুন্দের মনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বর্ণিত হয়েছে। "তখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল।...নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সং সং শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কোথা যাও'? তাল গাছ তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল 'কোথা যাও'? পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, 'কোথা যাও'? এই অংশের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'এর ভাষা এবং চিত্রকল্প দই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন ঘন দ্বিরুক্তি, কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস, কুন্দনন্দিনীর প্রায়-অপ্রকৃতিস্থতার পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিমের গদ্যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় কাব্যের স্পন্দন আসে।"

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারী কর্তৃক সূর্যমুখীর উদ্ধার বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রাত্রির পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাত্রিংশতম পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তিতে নগেন্দ্রের শোক নিসর্গ চিত্রের বৈপরীত্যে প্রকাশিত হয়েছে। নগেন্দ্রের মনে হচ্ছিল 'পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে সে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন।' মনুষ্যগণ হাস্য-পরিহাসে রত, পৃথিবী অনন্তগামিনী, সংসার স্রোত অপ্রতিহত, জগতের এই ঔদাসীন্য তাঁর শোককে আরও প্রবল ও গভীর করে তুলেছে।

ঊনত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুর পটভূমিকায় কুন্দের চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনাশক্তির সাহায্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। 'কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দ কুসুম শুকাইল।' আবার, শেষ দৃশ্যে উন্মাদিনী হীরার চিত্তচাপল্যহেতু গীতিও দেবেন্দ্রের কর্ণনা মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনা সংস্থাপনে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে কাহিনী

বর্ণনায় অভ্রান্ত বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাই নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায়। নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে চন্দ্রকর অথবা পুষ্পসৌরভ কুন্দের মধ্যে যেন শরীরী হয়েছে। তার মধ্যে দেখা যায় শান্ত অভিব্যক্তি। সূর্যমুখীও তার রূপের প্রশংসা করেছে।

সূর্যমুখীর রূপ পূর্ণচন্দ্রতুল্য, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। —"সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ সমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখার মধ্যস্থ স্থূলকৃষ্ণ তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকার ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট।'

কমলমণির বয়স অষ্টাদশ বৎসর। কমলের সৌন্দর্য গৌরবের সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। সে সুন্দরী, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। সে দেখতে খর্বাকৃতি; মুখখানি মেঘেঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরে ঝুলে রয়েছে। সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁপ 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে বলেছেন, " ক্ষুদ্র পিনদ্ধ দেহ ভঙ্গিতে এবং ফণাধরা সাপের মতো চুলের আধ ঢাকা সুশ্রী শ্যামবর্ণ মুখের সঙ্গে তার কর্ম তৎপরতা ও বুদ্ধিদৃপ্ত চতুরতা তথা কুটিলতার সহজ সাযুজ্য অনুভব করা যায়। অবশ্য তার রূপবর্ণনাকে পরিবর্তমানা চরিত্রের আয়না করে তোলা সম্ভব হয়নি"। নগেন্দ্রনাথ যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশ বৎসর মাত্র। জননী কর্তৃক প্রদর্শিত চিত্রে কুন্দ তাঁকে দেবনিন্দিত পুরুষ মূর্তিরূপে দেখেছিল। উন্নত, প্রশস্ত ললাট, সরল, সকরুণ কটাক্ষ, মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা ও অপরাপর মহাপুরুষ লক্ষণ। দেবেন্দ্রের বয়স পঞ্চাবিংশ, আকৃতি কিশোরের ন্যায় এবং কান্তি পরম সুন্দর। আবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের 'স্তিমিত প্রদীপ' অংশে যে চিত্রসপ্তকের বর্ণনা আছে তার লিপিকুশলতায় চিত্রগুলি কমিয়, জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। "ভাষাও তদনুযায়ী তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধপদ পূর্ণ, ধ্বনি ঝংকারময় ও উপমাদি অলংকারে সুসজ্জ। বাক্যবন্ধে উত্থানপতনজনিত একটা ছন্দের তরঙ্গ অনুভূত হয়।" *(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্র গুপ্ত।)*

আধুনিককালের উপন্যাস অতিমাত্রায় মননধর্মী হবার ফলে বর্ণনা-রীতি এখানে প্রাধান্য লাভ করে না। "বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিপ্রবণতা বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষাতেও ছায়াপাত করেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা এবং তাঁর প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে তফাত কেবল এইখানে যে উপন্যাসের ভাষা অলংকৃত, তীব্র বিশেষণ সচকিত উচ্চগ্রামের কল্পনার জন্য সদাপ্রস্তুত। তা না হলে প্রবন্ধের ভাষায় যে সতর্ক যুক্তিশীল নৈয়ায়িকতা তাঁর উপন্যাসের ভাষাও আত্মার দিকে থেকে তারই আত্মীয়।"(*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* / সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অথচ যাকে আমরা প্রকৃতি বলি তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এবং তা চরিত্রসমূহের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁর উপন্যাস-সমূহে বর্ণনা-রীতির মাধ্যমে স্থান ও চরিত্রকে সমন্বিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো যে, বিশেষ পরিবেশ নিরপেক্ষ চরিত্রের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রসমূহ স্থান ও কালের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

১৫। বিষবৃক্ষ : ইন্দ্রিয়পরতা ● প্রণয়পিপাসা ● পাপপুণ্য বোধ

১. "জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়"। — *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

২. "কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষ কাম ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়।" — *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্য সম্ভবত উদ্ধৃত উক্তি সমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হল ইন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকার করা। রিপুর আক্রমণ সত্ত্বেও অবিচলিত মনুষ্য প্রকৃতি দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হবে না। রিপুর শূন্যতাকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রকে তার ধনৈশ্বর্য, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি দিক থেকে বিচার না করে চিত্ত সংযমের দিক থেকে বিচার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চিত্ত সংযমের অধিকারী মানুষই যথার্থ মানুষ। মানুষ রিপুর অধীন। তিনি মনে করেছেন : "সকলেরই এক একটা বহ্নি আছে— সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে। ...জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। ...রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। ...এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।" বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র নানা বহ্নির বশীভূত এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নানা ইন্দ্রিয়বহ্নিতে উদ্দীপ্ত।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, কুন্দ, হীরা-প্রত্যেকটি চরিত্র কোনো না কোনো রিপুর দ্বারা আক্রান্ত। উপন্যাসটি রূপবহ্নি, ভোগ-বহ্নি ও ঈর্ষাবহ্নির রূপায়ণ— নানা বহ্নির আকার 'বিষবৃক্ষ'। নগেন্দ্রর পাশাপাশি দেবেন্দ্র ও হীরার চরিত্র উপস্থাপনার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নানা বহ্নির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র একই বংশোদ্ভূত হলেও উভয় বংশে পুরুষানুক্রমে বিবাদের ফলে নগেন্দ্র জমিদার, আর দেবেন্দ্র একজন সাধারণ ব্যক্তি দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ হলেও দেবেন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে অতৃপ্তি নিবারণে প্রবৃত্ত হল। দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট, যেমন আকৃষ্ট নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রের প্রভূত ঐশ্বর্য, মান, যশ এবং সূর্যমুখীর মতো স্ত্রী-থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্র কেন কুন্দর প্রতি আকৃষ্ট হল তা বিতর্কের। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের আকর্ষণকে বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবে দেখেননি। কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের আকর্ষণ কীরূপ তা দেবেন্দ্রের সংলাপেই ব্যক্ত— "আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন প্রথম

তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরপ দগ্ধ করিতেছে।" দেবেন্দ্রের গৃহ-পরিবার-পরিজন-ধন-সম্পদ-মান-যশ কিছু নেই; তার কাছে তার জীবন অর্থ শূন্য। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের বোধই তাকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে গেছে। দেবেন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি উপন্যাসে অপ্রকাশিত থাকেনি।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনের বো কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বন্ধু হরদেব ঘোষালকে লেখা পত্রে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর নয়ন বর্ণনায় লেখে— "বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু— চক্ষু দুইটি শরতের মতো সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে— সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না— আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না।" কুন্দের প্রতি আকর্ষণের ফলে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সংসার জীবনে বিপর্যয় আবির্ভূত হল। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, বিষপানে কুন্দর মৃত্যু, হীরার জীবনে করুণ পরিণাম ইত্যাদি অনিবার্য অমোঘতায় নেমে এল। কিন্তু দেবেন্দ্র সংসারে একক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্য কোনো সংসারে বিপর্যয় আনয়ন করেনি। নগেন্দ্রের চরিত্রে নানা পরিবর্তনের ফলে সূর্যমুখীর জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল। সমস্ত পূর্ণতা ও প্রাপ্তির মধ্যেও একটি চরিত্রে বিষবৃক্ষের বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপ ধারণ করে এবং তা থেকে উৎপাদিত ফল কোন বিপর্যয়ের লেলিহান শিখায় সংসার বিপর্যস্ত করে দেয়— নগেন্দ্র তারই উদাহরণ। নগেন্দ্র চিত্ত সংযমের চেষ্টায় ব্রতী হয়নি। নগেন্দ্র অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, সত্যবাদী, পরোপকারী, প্রিয়ংবদ, ন্যায়নিষ্ঠ, দাতা, মিতব্যয়ী, হিতকারী, বিজ্ঞ, নম্র, অথচ সে শেষ পর্যন্ত রূপজ মোহে বন্দী। তাকে কোনোদিন লোভের বশবর্তী হতে হয়নি বলে লোভ সংবরণ করার মানসিক শক্তি তার হয়নি। ইন্দ্রিয়বহ্নিতে নগেন্দ্রনাথের চরিত্র দগ্ধ হয়েছিল। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রণয় পরিত্যাগ করে, কুন্দনন্দিনীর রূপজমোহে আকৃষ্ট হয়েছিল। চিত্ত সংযমে তার আগ্রহ থাকলেও চিত্তদমনে সে অসমর্থ ছিল বলে তার চিত্তপ্রাঙ্গণে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দ্রুত বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র হীরা ঈর্ষাবহ্নির উদাহরণ। উপন্যাসের উনিশ, বিশ ও একুশ পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে 'হীরার রাগ', 'হীরার দ্বেষ', 'হীরার কলহ— বিষবৃক্ষের মুকুল', অর্থাৎ হীরার রাগ, দ্বেষ, কলহ বিষবৃক্ষের মুকুল। সকলেই রিপুকর্তৃক বিচলিত হয় বলে হীরার পক্ষেও বিচলিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। হীরার রাগের প্রথম ও প্রধান কারণ দেবেন্দ্র কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট, হীরার প্রতি নয়। দ্বিতীয় ও অন্যতম কারণ সূর্যমুখী। সে বলেছে— "সূর্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট— সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ"। হীরার চরিত্রে রাগ-দ্বেষ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সে কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে না

দেওয়ার কথা ভেবেছে; এমনকি নগেন্দ্র সূর্যমুখীর কলহে সে সূর্যমুখীর খাতির করবে না— এমন কথাও ভেবেছে।

হীরার চরিত্র একদিকে যেমন ঈর্ষাবহ্নিতে প্রজ্বলিত, অন্যদিকে সে তেমনি দেবেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট। হীরা দেবেন্দ্রকে আপন মন সমর্পণ করলেও দেবেন্দ্রের ইন্দ্রিয়াসক্তির কাছে সে আত্মসমর্পণ করেনি। সে তাকে জানিয়েছে— "আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখীলোক, গতর খাটাইয়া খাই— কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই।" হীরা বাল্যবিধবা এবং দাসীমাত্র। তার অন্তরে দেবেন্দ্রের প্রতি আকুলতা যত গভীরই হোক না কেন, যখন সে বুঝেছে দেবেন্দ্রের মন প্রেমপ্রীতিহীন এবং তার আকর্ষণ কেবল হীরার রূপযৌবনের প্রতি, তখনই সে দেবেন্দ্রকে নিজের মন থেকে তাড়িয়ে দিতে ইতস্তত করেনি। বিপরীত দিকে কুন্দ নিজেকে নগেন্দ্রের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। অথচ হীরা দেবেন্দ্রের আসক্তির কাছে নতি স্বীকার করেনি। সে দেবেন্দ্রর আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। "ভালবাসার জন্য হীরার চিত্ত সর্বদা পিপাসিত কিন্তু সে জন্য সে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। এ বিষয়ে হীরা চিত্তসংযমে সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে"। *(বঙ্কিম সাহিত্য / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)*। হীরার বক্তব্য এ সত্যকে সমর্থন করে— "আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকু ভালবাসিতেন তা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না— *** আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না— সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? *** আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়তো ভুলিয়া যাইবেন, নয়তো যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন— এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।" দেবেন্দ্রের চিত্ত সংযমে প্রবৃত্তি ছিল না; নগেন্দ্রের চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি থাকলেও ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু চিত্তসংযমে হীরার ক্ষমতা ছিল। ঔপন্যাসিক হীরার মনোভাবনায় লিখেছেন— "কার্পাসবস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্মভীতি এবং লোকলজ্জা, এক বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; *** হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতা শালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে"। হীরা কামরিপুর আক্রমণ দমন করতে পারলেও ঈর্ষাবহ্নিকে সে প্রশমিত করতে পারেনি। কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ অসহ্য হল। ঈর্ষাবশত কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার ক্রোধ আর তা থেকে কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশ সাধনে তার প্রবৃত্তি। হীরার জীবনে সর্বনাশ

এসেছে— সে একসময় দেবেন্দ্রর কপট প্রেমাভিনয়কে যথার্থ প্রেম-ভালবাসা বলে মনে করেছে। সবশেষে ঈর্ষাবশত সে কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে প্রবৃত্ত করিয়েছে। উপন্যাসের অন্তিম লগ্নে হীরার হাহাকার, কুন্দের মৃত্যু সমস্ত মেলে ঈর্ষাবহ্নি ও রূপবহ্নির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি।

সূর্যমুখীকে আলোচ্য উপন্যাসে মানবহ্নির উদাহরণ বলা যেতে পারে। নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনী রূপ ও কামবহ্নির, হীরা ঈর্ষাবহ্নির আর সূর্যমুখী মানবহ্নির উদাহরণ। সূর্যমুখী গর্বিত স্বভাবা ছিলেন তাঁর কিছু মৌন অহঙ্কার ছিল। ফলত, তিনি স্বামীর অনুরাগ ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুলতা বা আগ্রহ দেখাননি। কোনো অনুরোধ— উপরোধের দ্বারা, কোনো ভাববিলাসমূলক নিবেদনের দ্বারা স্বামীর পলাতক প্রেমকে ধরে রাখার চেষ্টা না করে কুন্দর হাতে তুলে দিয়ে কঠোর অবিচলিত আত্মসংযমের সঙ্গে মানবহ্নির পরিচয় প্রদান করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাপপুণ্যবোধ সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষণ কালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে যথার্থভাবেই বলেছেন— "পাপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটা সহজ সঙ্কোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল; সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই, আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্যায় প্রতিদিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিহ্ন পুঞ্জীভূত করিয়া চিত্রকে মসীময় করিয়া তোলেন নাই, সর্ববিধ তথ্য বিস্তার সযত্নে বর্জন করিয়াছেন। কেবল পদস্খলনের পূর্ববর্তী অবস্থাগুলিকে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রাণপণ প্রলোভন দমনের চেষ্টাটিকে সুরুচি ও রসজ্ঞানের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; পাপের পঙ্কিল প্রবাহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ, প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী আবর্তসৃজন অনুভব করেনে নাই। কেবল স্বল্পকাল ব্যাপি চেষ্টার পর এই পঙ্কিল প্রবাহকে সূর্যালোকে তুলিয়া, তাহার পর এক অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূল লইয়া গিয়া, প্রায়শ্চিত্ত পর্বতের শিখরদেশ হইতে মৃত্যুর অতল শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কানে বাজিতে থাকে, একটা প্রা-াবেগচঞ্চল, বিপুল শক্তির অতর্কিত অন্তর্ধানের বিরাট শূন্যতায় আমাদের চিত্ত উদভ্রান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনের ক্রিয়া লেখক আমাদের দেখিতে দেন না।"

১৬। বিষবৃক্ষ : দাম্পত্য জীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে দাম্পত্যজীবন বেশ সুস্থিত নয়, পার্থিব জীবনের জৈব বাসনা-কামনার চিত্র স্থূলভাবে তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা সন্তানহীন। বঙ্কিমসাহিত্যে নরনারীর দাম্পত্য জীবনে সন্তানের অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয় বেশ দুরূহ। তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা— কপালকুণ্ডলা, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্র, নবকুমার, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, প্রতাপ, প্রফুল্ল সকলেই নিঃসন্তান। বিবাহিত জীবনে সন্তানের আবির্ভাব স্বাভাবিক। সংসারের অর্থ শুধু বিপরীত লিঙ্গের সহবাস নয়; সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠার অন্য নাম সংসার। মাতৃত্বে নারী শরীরের পরম ও চরম বিকাশ; তাই এই পরিপূর্ণতা নারীকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। মর্ত্য ভূমির মানুষ তো আলো-শিশু-পাখি-গান একসঙ্গে পেতে চায়। সন্তানহীনা জননীর ক্রন্দন করিব সাহিত্যিকদের লেখনী স্পর্শে অমরত্ব অর্জন করে। দুঃসহ বেদনার জ্বালা শিশুর আবির্ভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনে সন্তানের অনুপস্থিতি কী প্রজননহীনতা অথবা অন্য কিছু! সন্তানহীন দম্পতির প্রেম কীভাবে সার্থক হতে পারে? প্রজনন বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা বংশ বৃদ্ধি— এর জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পুরুষত্ব ও নারীত্বে অভিষিক্ত হতে হবে। বন্ধ্যাত্ব স্ত্রীর পক্ষে যেমন তেমনি হীনবীর্য পুরুষও সাংসারিক অশান্তির কারণ। সন্তানের আগমনে দাম্পত্য জীবনে স্থিতাবস্থা আসে, পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে নরনারী জীবন, স্বামী-স্ত্রীর জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঔপন্যাসিকের নায়ক-নায়িকা নিঃসন্তান। প্রজননহীনতা যদি না থাকে তাহলে কি তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় প্রগতিশীলতার বাহক হতে গিয়ে তাঁদের ও তাঁদের মতো অনেকের নায়ক-নায়িকা সন্তানহীন। অথবা এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি যে, সন্তানহীনতা উপন্যাসের মূলকাহিনী পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ক্ষেত্রে সন্তানহীনতা কাহিনী পরিকল্পনায় যতখানি গুরুত্বপূর্ণ অন্যত্র সম্ভবত তা নয়।

আলোচ্য উপন্যাসে তিনটি দাম্পত্য জীবনের কথা আছে—

১. তারাচরণ কুন্দনন্দিনী।

২. নগেন্দ্র-সূর্যমুখী এবং

৩. কমলমণি-শ্রীশ।

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে তারাচরণ ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ; ঐ পরিচ্ছেদেই 'বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাটিল। তাহার পর কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল, উপন্যাসের যে পরিচ্ছেদে তারাচরণের বিবাহ সেই পরিচ্ছেদেই মৃত্যু; বিবাহ ও মৃত্যুর মধ্যে তিনবছর অতিবাহিত হয়েছে অথচ তাদের সন্তানাদি নেই। কাহিনীর আখ্যায়িকা নির্মাণের জন্যই সম্ভবত ঔপন্যাসিক

বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি বিষয়ের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য ও সন্তানহীন করা। উপন্যাসের প্রয়োজনের দিক থেকে দৃষ্টি রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই পথটি যখন নিলেন তখন কুন্দনন্দিনী ও তারাচরণের জীবনে সন্তান-সম্ভাবনার সুযোগ যে দুর্লভ নয়, অলভ্য তা বলাই বাহুল্য।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীও নিঃসন্তান। সুর্যমুখীর প্রায় ছাব্বিশ বছর বয়সে কুন্দনন্দিনী দত্তবাড়িতে প্রবেশ করে। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর বিবাহিত জীবনও বেশ কিছু দিনের; উপন্যাসের সূচনায় কুন্দর বয়স ছিল তের, সূর্যমুখীর ছাব্বিশ। তারপর কাহিনীতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কুন্দর বিবাহ ও বৈধব্য ঘটার পর নগেন্দ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; ক্রমশ তা গভীরতর হয়েছে। স্বামী নগেন্দ্রের কুন্দর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা সূর্যমুখী যে পত্রে কমলমণিকে লেখেছে তখন কুন্দর বয়স সতের-আঠারো বছর। —"তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭/১৮ বৎসর হইয়াছে।" অর্থাৎ সূর্যমুখীর বয়স চিঠি লেখার কালে ত্রিশ-একত্রিশ বছর। উপনাসের এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত সূর্যমুখী নিঃসন্তান। বঙ্কিমচন্দ্র কী পরিকল্পনা অনুয়ায়ী সকলকে সন্তানহীন করেছেন! সমালোচক মনে করেন— "এই সন্তানহীনতা উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিকল্পনায় বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এখানে আকস্মিকতার প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে। তিন বৎসর যেতে না যেতেই হঠৎ জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু; অপরদিকে কুন্দনন্দিনীরও কোনো সন্তান নেই, নগেন্দ্রনাথও নিঃসন্তান। কাহিনী নির্মাণে বঙ্কিম সচেষ্ট ভাবেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই কুন্দ-নগেন্দ্রর প্রণয়বীজ বিনা বাধায় সহজেই রোপিত হয়েছে, আর নিঃসন্তান সূর্যমুখীও এতদিনের সংসার পরিত্যাগ করে যেতে কোনো দিক থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।" *[বঙ্কিম সাহিত্য / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য]*। নগেন্দ্র-কুন্দর অবৈধ প্রেমজীবনে সন্তান-সম্ভাবনার যে কোনো সুযোগই নেই সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাতেই ব্যক্ত।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনের বিপরীত দিকে আছে কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের 'অনাবিল, একাত্ম, হাস্যপরিহাসমধুর কপটমান অভিমানপূর্ণ' দাম্পত্যজীবন। এখানে শিশু সতীশচন্দ্র তার মনোহর শৈশবচাপল্যের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। সূর্যমুখী-নগেন্দ্র নিঃসন্তান হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ গভীরতর হয়েছিল। মনে হয়, একটি সন্তান থাকলে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ অসম্ভব হত। শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির দাম্পত্যজীবন কৌতুকমাধুর্যে পূর্ণ, বাৎসল্যরস পূর্ণ পরিবার চিত্ররূপেই পরিগণিত হতে পারে। সূর্যমুখী ও কমলমণি প্রসঙ্গে দাম্পত্য প্রেমের দুটি পৃথক রূপ চিত্রিত। শ্রীশ-কমলমণির দাম্পত্যজীবন নানা বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করার ফলে একটি বিস্তৃত প্রেমচিত্র এখানে প্রকাশিত। শ্রীশ-কমলের "দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও আনন্দ উপন্যাসে যেমন স্বতন্ত্র সুর বাজিয়েছে, তেমনি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবন যন্ত্রণার বিপরীত পটভূমি রূপেও স্থাপিত থেকেছে। তাদের বাৎসল্য

নগেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের ঐ বিশেষ শূন্যতার প্রতি নীরব ইঙ্গিত করেছে।"*[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্র গুপ্ত।]*

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সন্তানহীনতা সম্ভবত ঔপন্যাসিকের পরিকল্পনা প্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্র অবৈধ প্রেমের চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্যকে মুখ্য করতে চেয়েছেন বলে এবং কাহিনীর আখ্যায়িকা অংশকে দ্রুত পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে যাবেন বলে আলোচ্য উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে সন্তানহীনতার আয়োজন করেছেন।

১৭। বিষবৃক্ষ : সঙ্গীত ● প্রয়োগ ও তাৎপর্য

নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠলেও উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহার সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। গ্রিক নাটকের রূপবন্ধে সঙ্গীত নাটকের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। অবশ্য নাটক ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করায় এবং সংলাপের প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ভূমিকার গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে, প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এমনও ভাবতে শুরু করেন যে, নাটকে সঙ্গীত থাকলেই তা মেলোড্রামায় রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ ধারণা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণিত হয়ে যায় বিভিন্ন বাংলা নাটকের গানের ব্যবহারে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের প্রয়োগ। রূপক-সাংকেতিক নাটকে গানের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের নাটকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। নাটকে সঙ্গীত ব্যবহার সম্পর্কে তত্ত্ব গড়ে উঠলেও এবং উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহারের ঔচিত্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব গড়ে না উঠলেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ* প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসে গানের ব্যবহার আছে। অবশ্য *বিষবৃক্ষ* উপন্যাস গানের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও *আনন্দমঠ*-এ গান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের গান মূলত দেবেন্দ্র-হীরা উপকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এবং সে গানে তরলতা ও হাস্য যত বেশি, ততখানি প্রবৃত্তির-সুবৃত্তির আলোড়ন ও ট্র্যাজিক আর্তনাদ নেই। হীরার গানে স্বৈরিণীসুলভ চটুলতা আছে, যদিও তার কণ্ঠে গীত জয়দেবের দুইটি পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে প্রণয়বিহ্বল দিনগুলির স্মৃতি-দীর্ণ একটি হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে "বঙ্কিম পাঠককে গান শোনাতে চাননি।— তার মনে একটা ভাবাবেগের, সুরঝংকারের উন্মাদনা আনতে চেয়েছেন। জাতীয় মন্ত্রে পাঠকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করা বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। গানের ব্যবহার সেদিক থেকে তাঁকে সাহায্য করেছে।" *[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্র গুপ্ত]*। *মৃণালিনী* রচনার কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র গানের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত সংযতচিত্ত নাট্যকারের ন্যায় উপন্যাসে সঙ্গীতের প্রয়োগ করেছেন। "বঙ্কিমের উপন্যাসে গানের ব্যবহার একটা রীতিমত শিল্পবৈশিষ্ট্য। অনেক বইয়ে তিনি গানকে কাজে লাগিয়েছেন ভাবসঞ্চারণের একটি নতুন যোগসূত্ররূপে, পাঠক ও পাত্রপাত্রীর মধ্যে হৃদয়সংযোগের একটি অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে।" *(পূর্বোক্ত)* উপন্যাসে সঙ্গীতের বা কবিতার ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের সীমাবদ্ধতা কতটা তা আলোচনার বিষয়।

"উপন্যাসের সঙ্গে গদ্যভাষার হরগৌরী সম্পর্ক। উপন্যাসের সঙ্গে গদ্যভাষার যোগ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু উপন্যাসে ও গদ্য পরস্পর একাত্ম হ'লেও উপন্যাসের গদ্যভাষায় কাব্যের আমেজ সৃষ্টি করা যায় না, অথবা যদিও করা যায় তা' সর্বত্র নিন্দনীয় এমন উক্তি করা অনুচিত। উপন্যাসের গদ্য অবয়বে মাঝে মাঝে কাব্যের

পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে উপন্যাসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা চলে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ *শেষের কবিতা*-র নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝবার জন্য ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে।' অর্থাৎ উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার বক্তব্য বিষয়কে আরও মনোগ্রাহী ও প্রাঞ্জল করে তোলে। উপন্যাস তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শব্দরীতি গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন এই রীতি গদ্যধর্মী না কাব্যধর্মী সম্ভবত এটা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মহৎ ঔপন্যাসিক বা মহৎ কবি যে কোনো মাধ্যমের দ্বারা বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। উপন্যাসের আবেগের বেগকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাব্যভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *শেষের কবিতা*-র আখ্যানবস্তুতে চরিত্রগত বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কবিতার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি তবে কবিতা ব্যবহারের দ্বারা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত গদ্য বক্তব্যের কাব্যভাষ্য রচনা করতে চেয়েছেন? সম্ভবত উত্তর অস্ত্যর্থক। এছাড়াও রোমান্টিক তরুণ প্রাণের আবেগ প্রকাশের জন্যও তিনি কবিতার ব্যবহার করেছেন।" *[রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা / ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়]*। কেননা, "শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। এই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি তার সঙ্গে অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই বলি রস। অর্থাৎ যে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। ...আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই বেগ আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়, আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে... এই জন্য বাক্য যখন আমাদের অনুভূতি লোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী / ১৪শ খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ]

উপন্যাসে কবিতা ও সঙ্গীত ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণত ভিন্ন না হলেও, উভয়ের উদ্দেশ্য এক হলেও উপস্থাপনায় এরা ভিন্নতর। কেননা, সঙ্গীতে সুরের যে মুখ্য ভূমিকা থাকে কবিতায় তা দুর্লভ। উপন্যাসে কবিতা ও সঙ্গীতের ব্যবহার চিত্রধর্মীতায় প্রায় সমস্তরের হলেও সুরগত বক্তব্যধর্মিতায় এক নয়। প্রসঙ্গত, নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারে নাট্যকারের স্বাধীনতা, প্রয়োগধর্মিতা, উপস্থাপনাগত কৌশল ইত্যাদি প্রসঙ্গও আলোচিত হওয়া উচিত। "নাটকের পাত্রপাত্রী গান গাইতে পারে। গানের ভাষা ও সুর পাঠকের মধ্যে এবং তার সঙ্গে গাইবার রীতি দর্শকের মনে সরাসরি যে প্রতিক্রিয়া জাগায় সেটুকু নিয়ে নাট্যকারকে কাজ চালাতে হয়। আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় আলোক সম্পাত ঘটিত কিছু কলাকৌশলের দ্বারা গানের সময়ে অতিরিক্ত ফললাভের চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু

ঔপন্যাসিককে নাট্যরীতির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এমন দাবী চলতে পারে না। কোনো ব্যক্তির মুখে গানের ভাষা না দিয়ে শুধু তার ব্যাখ্যা বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনামূলক উপস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট পাত্র পাত্রীর হৃদয়তন্ত্রীর অনুরণনটি ঔপন্যাসিক করে নিতে পারেন। নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। যেমন আধুনিক চলচ্চিত্র পরিচালক গানের 'চিত্র' রচনা করতে গিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে গানের ভাব ও ভাবসঙ্গ তথা মানসপ্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হন, গায়কের অবস্থানের সীমা ছাড়িয়ে যান, শ্রোতার মুখ্যবয়বের সূক্ষ্মরেখা ধরতে চান, অথবা প্রতীক দ্যোতনার সাহায্য নেন— ঔপন্যাসিকও তেমনি নিজস্ব শিল্পরীতিতে, অর্থাৎ ভাষায় বর্ণনায় ঘটনার বিবরণে গানের সুর ভাব-তাৎপর্যকে অনেক দূর পর্য. প্রসারিত করতে পারেন।" *(পূর্বোক্ত / ক্ষেত্র গুপ্ত)*। উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উপন্যাসে সঙ্গীত ত্যজ্য নয়; এবং তার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা উপন্যাস নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে। উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার চরিত্র প্রকাশের যেমন অন্যতম বাহন, তেমনি ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক ও লৌকিক তথ্য সংবাহকের ভূমিকাও তার করায়ত্ত। উপন্যাসে সঙ্গীতের ভূমিকা অগৌণ না গৌণ তা নির্ভর করবে ঔপন্যাসিকের সঙ্গীত ব্যবহারের প্রবণতার ওপর। কাহিনিকথনের জীবনাসক্তিকে রূপায়িত কবার জন্যে, উপন্যাসের গদ্যভাষার মনোধর্মিতাকে আরও ব্যঞ্জনাময় অথবা স্পষ্ট করার জন্যে উপন্যাসে সঙ্গীত ব্যবহার ত্যজ্য নয়, বরং উপস্থাপনার বা প্রয়োগের কৌশলে অভিনবত্ব বহন করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার ও প্রয়োগ-তাৎপর্য *মৃণালিনী* এবং *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে যেমন সুবিস্তৃত; তেমনি প্রযুক্তিতেও বহুল বৈচিত্র্য মণ্ডিত।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পরিবেশিত গীতের সংখ্যা দশ। নয়, পনের, সতের, উনিশ ও পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে সঙ্গীতগুলি পরিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে নয়ের পরিচ্ছেদে তিনটি, পনের ও সতের পরিচ্ছেদে দুটি করে, উনিশ পরিচ্ছেদে একটি এবং পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে একটি সঙ্গীত আছে। দশটি সঙ্গীতের মধ্যে দেবেন্দ্রের গাওয়া আটটি গান এবং হীরার গাওয়া দুটি গান। নবম পরিচ্ছেদে সঙ্গীতের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি মোট তিনটি; আর পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে সর্বাপেক্ষা কম-মাত্র একটি।

দেবেন্দ্রের গীত সঙ্গীত সংখ্যা : ৮

দেবেন্দ্র কর্তৃক নবম অধ্যায়ে গীত সঙ্গীতগুলি হল যথাক্রমে -

১. শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব বলে হে।

২. আয়রে আয় চাঁদের কণা।

৩. শ্যামাবিষয়ক গানের উল্লেখ মাত্র আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীত সঙ্গীতগুলি যথাক্রমে—

১. কাঁটা বনে তুলতে গোলামি কলঙ্কের ফুল।

২. স্মৃতিশাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্যের পায়ে ধরে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে গীত সঙ্গীতগুলি যথাক্রমে—

১. আমার নাম হীরামালিনী।

২. বয়স তাহার বছর ষোল।

ঊনবিংশ অধ্যায়ে গীত সঙ্গীতটি হল—

১. এসেছিল বক্‌না গরু পর গোয়ালে যাবনা খেতে।

হীরা মালিনী সমগ্র উপন্যাসে দুটি গান গেয়েছে— উনিশ ও পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে। উনিশ পরিচ্ছদে তার গানটি হল : মনের মত রতন পেলে যতন করি তায়। আর পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে তার গানটি হল : স্মরগরলখন্ডনং সম শিরসি মন্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারং।

দেবেন্দ্র যে সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ একথা বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে দেন উপন্যাসের চতুর্বিংশ ও ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে। চতুর্বিংশ অধ্যায়ের স্বল্পরেখাঙ্কিত ভাষায় ঔপন্যাসিক দেবেন্দ্রের গানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন : "দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। *** দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন।"।

ষষ্ঠত্রিংশত্তম অধ্যায়েও আছে : "দেবেন্দ্র সকল কথা ত্যাগ করিযা, তানপুরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখ: দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। *** তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথম বসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরার দুর্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্তি প্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল।"

হরিদাসীর ছদ্মবেশে দেবেন্দ্রর গীত 'শ্রীমুখ পঙ্কজ— দেখ্‌বো বলে হে' বেশ দীর্ঘ কীর্তন; শ্রীরাধার মানভঞ্জনে ছদ্মবেশী কৃষ্ণের গান। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িকার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিরীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ করিল, শ্রীমুখপঙ্কজ— দেখ্‌বো বলে হে"। এটি কীর্তনাঙ্গের গান। এখানে দেবেন্দ্র হরিদাসীর ছদ্মবেশে গানটি গেয়েছে। ছদ্মবেশী কৃষ্ণ যেমন রাধার জন্য বাসনা প্রকাশ করেছে, তেমনি ছদ্মবেশী দেবেন্দ্রও কুন্দের জন্য স্বীয় মনোবাসনা সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। ঐ অধ্যায়ে দেবেন্দ্রের শ্যামা বিষয়ক গানের উল্লেখ আছে; কিন্তু সে কী গান গেয়েছিল তা বলা নেই : "হরিদাসী এক অপূর্ব শ্যামাবিষয়ক গাইলে সূর্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূর্বক বিদায় করিলেন।" কিন্তু উক্ত পরিচ্ছেদে গীত তৃতীয় সঙ্গীতটিতে কীর্তনের পরিবর্তে খেমটার সুর ও তালে কুন্দের প্রতি প্রণয়বাসনার

অকৃত্রিম ও সরাসরি প্রকাশ ঘটেছে : " আয়রে চাঁদের কণা। তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোনা।" এই সঙ্গীতে দেবেন্দ্রের 'লালসাবিকৃত লঘুচিত্ততা প্রকাশিত'।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদেও দেবেন্দ্র হরিদাসীর ছদ্মবেশে গেয়েছে, 'কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল'— এ গানটিও কামনার আরক্ত সংরাগে পূর্ণ। আর দ্বিতীয় গীতটি দুই চয়ণের ব্যঙ্গাত্মক গান— 'স্মৃতি-শাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্যের পায়ে ধোরে।' সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র স্বয়ং দুটি গান গেয়েছে, এখানে আর হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ নেই। এ গান দুটি দেবেন্দ্র গেয়েছে মত্তাবস্থায়। দুটি গানই দেবেন্দ্র শুয়ে পড়ে চোখ বুজে গেয়েছে। এখানে দেবেন্দ্রের গানের মধ্য দিয়ে হীরামালিনীর স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। ঊনবিংশ অধ্যায়েও দেবেন্দ্র ব্র্যাণ্ডি পানের পর প্রকৃতিস্থ হয়ে এক চরণের ব্যঙ্গাত্মক গান গেয়েছে— 'এসেছিল বক্‌না গোরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে।'

সমগ্র উপন্যাসে হীরা মাত্র দুটি গান গেয়েছে। ঊনবিংশ অধ্যায়ে একটি এবং পঞ্চাশতম অধ্যায়ে একটি। ঔপন্যাসিক কিন্তু গায়িকারূপে হীরার পরিচয় কোথাও প্রদান করেননি; কিন্তু সেই পরিচয় উপন্যাসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কেননা, দেবেন্দ্রের সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারে প্রধান যোগাযোগ ছিল গান। ঊনবিংশ অধ্যায়ে হীরা অবশ্য একা গান গায়নি; সে আর মালতী দু'জনে অন্ধকারে গান মিলিয়ে গেয়েছে,— 'মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।'। গানটিতে স্বৈরিণীর চিত্তভাবব্যঞ্জকতা প্রকাশিত। হীরার প্রথম গানে স্বৈরিণীসুলভ চটুলতা প্রকাশ, দ্বিতীয় গীতটির উপস্থাপনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। হীরা উন্মাদ অবস্থায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের দুটি চরণ বার বার গান করেছে— 'স্মরগরলখন্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং'। উপন্যাসের অন্তিমে দেবেন্দ্র রোপিত বিষবৃক্ষের ফল যখন ফলতে আরম্ভ করেছে, যখন দেবেন্দ্র দুনিবার্য রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন উন্মাদিনী হীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করলো। 'অবেলীসংবদ্ধ ধূলিধূসরিত' হীরাকে চেনা দেবেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হীরা আত্মপরিচয় প্রদান করলে বিস্মিত ও বিমূঢ় দেবেন্দ্রকে তার দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পূর্বতন স্মৃতির কথা : ' এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া গাহিয়াছিলে— 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।' 'গীতাগোবিন্দ' কাব্যের দুটি চরণের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে "তার প্রণয়বিহ্বল দিনগুলির স্মৃতি দীর্ণ করে একটি হাহাকার যেন প্রকাশ পেয়েছে এবং ব্যঞ্জনায় গোটা উপন্যাসে মন্থন করে উত্থিত প্রণয়ের বিষবাষ্প পাঠকচিত্তের শ্বাসরোধী পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছে।" *[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি / ক্ষেত্রগুপ্ত]*।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেবেন্দ্রই মূল গায়ক। সঙ্গীতগুলি দেবেন্দ্র-হীরার উপকাহিনীর সঙ্গে প্রধানত জড়িত। তবে দেবেন্দ্রের গানের মনোভাব কুন্দের প্রতি প্রধাবিত বলে তার গানগুলি উপন্যাসে মূল কেন্দ্র বিন্দুকেও স্পর্শ করে গেছে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে,

সূর্যমুখী-নগেন্দ্রে ও কুন্দনন্দিনী কেন্দ্রিক মূল আখ্যানে— যেখানে তিনটি চরিত্রের হৃদয়বেদনা তীব্র মর্মভেদী বিমূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন সেখানে দেবেন্দ্র গান উপনীত হতে পারেনি। দেবেন্দ্র-হীরার সঙ্গীতে কামনা ব্যঞ্জকতা, চটুলতা, স্বৈরিণীসুলভ মনোভাব প্রকাশিত হলেও উভয়ের ট্র্যাজিক সংঘটনে গানের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক ও উপন্যাসেও যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ।

১৮। বিষবৃক্ষ : নীতিবাদ ● প্রচারধর্মিতা

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার যুগে কটি প্রধান উপন্যাস লিখেছেন তাতে অবৈধ প্রণয়ের সমস্যাই মুখ্য। প্রেমই বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান বিষয়। এই প্রেমের শক্তি এবং সামাজিক ন্যায়-নীতি-সংযমের বাধা মানুষের চরিত্র কিভাবে প্রকাশ করে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানবপ্রেম একটা বিস্ময়কর উপাদান। তার আলোকে মনুষ্যচরিত্রের অভ্যন্তরলোকের যে রহস্য প্রকাশ পায়, বঙ্কিম তা ভেদ করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনব্যাপী উপন্যাস-সাধনায়। যখন তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি বঙ্গীয় সমাজজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হল। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না বটে, কিন্তু তার সমালোচনা করলেন, তার সুপ্তি ও জড়তা ভেঙে দিতে চাইলেন। এই চিন্তাধারা তাঁর উপন্যাসেও প্রতিফলিত। এই পর্বে রচিত উপন্যাসে সমাজবিধি ও প্রণয়াবেগের দ্বন্দ্ব রূপায়িত। সমাজের বাস্তব পটভূমিতে দাঁড় করানোর ফলে তা শুধু উপলব্ধিমাত্র নয়, প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসে একটি সমাজ সমস্যার অবতারণা করেছেন। এই সমস্যা বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে। আপাত দৃষ্টিতে একথা মনে হওয়া সম্ভব যে, তিনি সমাজ সংস্কারের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। এখানে প্রচারধর্মিতার সুরও স্পষ্ট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মহৎ-শিল্পী। সমাজের সমস্যা তাঁর মনকে আলোড়িত করলেও তিনি একে সংস্কারমুক্ত মন এবং সমবেদনাস্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছিলেন। এই হেতু উপন্যাসের সমস্যা প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে লিখেছিলেন 'আমরা বলিব বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে। সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে। তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের একটা গভীরতর তাৎপর্য আছে। আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য বর্তমান। এখানে আংশিকভাবে বৈষম্য দূর করবার চেষ্টা করা হলে তা সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল সকলের উন্নতি সাধন। সুতরাং বঙ্কিম বিধবা-বিবাহকে যে সমর্থন করতে পারেননি তার কারণ হলো সকল ক্ষেত্রে সাম্য স্থাপিত না হলে বিধবা-বিবাহ প্রচলন অথবা বহুবিবাহ প্রথা রোধ প্রভৃতির সার্থকতাহীন হবে।

উপন্যাসে একস্থানে সূর্যমুখী তার পত্রে কমলমণিকে লিখেছেন :

'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মুর্খ কে?'

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন যে দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কর্ম নহে। তাঁর বক্তব্য হলো : 'যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।'

সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন কারণে বিধবা-বিবাহের নিন্দা ও সমর্থন করেছেন। সূর্যমুখীর আপত্তির কারণ হলো বিধবা-বিবাহ সমাজ নীতির প্রতিকূল বলে নয়, তা হলো ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হলে পতির উপরে তার নিঃসপত্ন অধিকার নষ্ট হবে। এই কারণে সে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেননি। তবে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহকে নীতি-বিরুদ্ধ বলে মনে করেননি। এই বিবাহ যে সমাজসম্মত নয় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন যেখানে তিনিই সমাজ, সেখানে সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্ন নিরর্থক।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। নগেন্দ্রনাথের এই বিবাহ শুধু পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্য বিনষ্ট করবে না, সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঘাত করে এক অনভিপ্রেত অমঙ্গলকর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে। কুন্দ বিধবা, এই হেতু নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিবাহ সামাজিক দৃষ্টিতে আপত্তিকর, বঙ্কিমচন্দ্র এই মনোভাব নিয়ে সমস্যা বিচার করেননি। তিনি দেখেছেন যে, নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণের রূপোন্মাদনা এবং কুন্দের আকর্ষণ হলো ভক্তি মিশ্রিত অনুরাগ। কুন্দের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করেছেন যে, সকল সুখের সীমা আছে। আত্মসুখ যেখানে উদগ্র হয়ে ওঠে, অপরের সুখকে বিনষ্ট করতে চায় পরিণামে তা কল্যাণকে আঘাত করে। নগেন্দ্রনাথ দাম্পত্য জীবনকে অস্বীকার করে সূর্যমুখীকে বলেছিলেন, 'তোমাতে আমার আর সুখ নাই,' এই রূপোন্মাদনা কল্যাণ ধর্মকে আঘাত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বিষবৃক্ষ নামের দ্বারা মনে হ'তে পারে যে, কাহিনী রচনায় আনুষঙ্গিকভাবে একটি সামাজিক উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এসেছিল। কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখীকে নিয়ে পারিবারিক জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল গৃহধর্মের প্রতিকূল। এই জীর্ণ কথাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন একথা সত্য নয়— 'ওটা হঠাৎ পুনশ্চনিবেদন। বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টারূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সংস্কারমুক্ত মন এবং সমবেদনা স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে নরনারীর জীবনকে দেখেছিলেন। তাঁর বড় কৃতিত্ব হলো তিনি উপন্যাসে প্রবর্তন করেছিলেন একটি নূতন রূপ। এই রূপে প্রতিমায় তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিল্পী বঙ্কিমের নিকটে মানব-জীবনের রূপ ও রহস্য এনেছিল পরম বিস্ময়। সুতরাং সমাজ সংস্কারের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হননি।

বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" রচনা করবার কিছু পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সমর্থক

ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, আলোচ্য উপন্যাসে এই সামাজিক সমস্যাটি উপস্থাপিত হয়েছে। বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হয়েছে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু সুখভোগ তার অদৃষ্টে ছিল না। বিবাহের অল্পকাল মধ্যে তাকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হল। এর মধ্য দিয়ে একটি সমাজঘটিত প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়। কুন্দনন্দিনী বিধবা হয়েও নগেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল দৃষ্টভঙ্গীতে এ পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তার এই প্রেম অবৈধ— তার বিবাহ আইনত সিদ্ধ হলেও নীতির দিক থেকে পাপ। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ বিশ্বাস করতেন বলেই কি কুন্দের জন্য আত্মহত্যার ব্যবস্থা করেছেন? কিন্তু এই জাতীয় অভিযোগ স্থূল সাহিত্যরুচির পরিচায়ক। কারণ,— বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আভ্যন্তর সাক্ষ্যে এরূপ কথা বলা চলে না। প্রথমত, কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য কোন বিশেষ মানসপ্রশ্ন সৃষ্টি করেনি। কুন্দ একবারও নিজের মনে পাপবোধজনিত দংশন অনুভব করেনি। বিধবার প্রেম পাপ, বিবাহ অন্যায়— হৃদয়াবেগের প্রবলতায় সে ধর্ম নষ্ট করেছে, এইরূপ অনুশোচনা তাকে পীড়িত করে নি। নগেন্দ্র বা সূর্যমুখীরও কুন্দের বৈধব্যের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় নি, দ্বিতীয়ত, কুন্দনন্দিনীর চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবিন্যাস তথা অপরাপর যে সব চরিত্রের সংস্পর্শে সে এসেছে তাহাদের ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েনের ফলে তার আত্মহত্যা এক অপরিহার্য পরিণতি রূপে দেখা দিয়েছে। কুন্দের ন্যায় কোমলচরিত্র তরুণীর পক্ষে নগেন্দ্রনাথেব সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটাই ছিল স্বপ্নের মতো। সেই বিবাহের পূর্বে নগেন্দ্রনাথের পরিবারে যে ঝড় তার আঘাত সে পেয়েছিল। কিন্তু তার ব্যাপকতা তখনও সে অনুভব করতে পারেনি। অবশেষে যখন সব বিপদ বাধা লঙ্ঘন করে তার বিবাহ-অনুষ্ঠান হল এবং স্বয়ং সূর্যমুখী সেই বিবাহের ব্যবস্থা করল, তখন তার মনে হয়েছিল সব ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে এইবার বোধ হয় সে শান্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবত দেখল সেই পরিবারে আগুন। সূর্যমুখী গৃহত্যাগেও নগেন্দ্রনাথের তার প্রতি বিরূপ তার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। তার কাছে জীবন একটা অর্থহীন অস্তিত্বে পর্যবসিত হল। মনের যখন ঠিক এই অবস্থা তখন হীরাদাসী হাতের কাছে বিষ যোগাল। কুন্দ আত্মহত্যা করল। হীরার বিষ যোগানও শুধু ঘটনা মেলাবার বহিরঙ্গ চেষ্টা নয়। সম্পূর্ণভাবে তা তার চরিত্রভঙ্গীর ফলশ্রুতি। কুন্দের উপরে বিদ্বেষবশে নয়, বিশ্বাবিধানের প্রতি বিদ্বেষবশেই তারা খল চরিত্র সর্পবৎ দংশনোদ্যত হয়। কাজেই কুন্দের আত্মহত্যা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ঘটনা— বঙ্কিমের কোনোরূপ নীতিভাবনার আরোপ এখানে ঘটেনি।

হীরা বা দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে না। দেবেন্দ্রনাথ লম্পট। তার ইন্দ্রিয়ানুরক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট আচার-আচরণের সহিত দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। উহার প্রেমের স্পর্শমাত্র ছিল না। সুতরাং তার শেষ জীবনের চিত্রটির দ্বারা কোনোরূপ মোহমুদ্গরের বাণী প্রচারের চেষ্টা হয়নি।

হীরাচরিত্র বঙ্কিমের একটি পরীক্ষামূলক চরিত্র। তার মধ্যে বিশুদ্ধ পাপের একটা চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস বঙ্কিম পেয়েছেন। তার প্রণয়কে বঙ্কিম একান্ত ইন্দ্রিয়ানুগ বাসনা রূপে

নিন্দা করেছেন। তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এই স্বৈরিণী রমণীর হৃদয়টিকে পরম যত্নে বঙ্কিম তুলে ধরেছেন। পাপকে সোজা ভাষায় ভর্ৎসনা করলেও, চরিত্রসৃজনে তার অন্তররহস্যের সন্ধান করেছেন পরম সহানুভূতির সঙ্গে। পরিণামে হীরা পাগল হয়ে গেছে। এ পরিণতিও মনস্তত্ত্বসম্মত; অচরিতার্থ কামনার তীব্র দাহ বুকে বহন করে দীর্ঘদিন যাপনের মানস প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াই সংগত।

কিন্তু এই উপন্যাসের আসল নৈতিক প্রশ্ন এসেছে নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বঙ্কিম কিন্তু মোটেই রক্ষণশীলতার পরিচয় দেননি। বরং উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মানবমুক্তির , হৃদয়ের প্রাধান্যস্থাপনের যে অভিযান চলছিল তার একটি উত্তম প্রকাশ ঘটেছে এখানে। হিন্দুর স্মৃতিসংহিতা চিরকালই নৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে ধিক্কার দিয়েছে। তার বহুগামিনী মনোভাব কঠিন শাস্ত্রীয় শ্লোকে প্রতিহত হয়েছে। পাপিষ্ঠা রমণীর নরকভোগের বহুবিধ নির্দেশ আছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে লাম্পট্য একটা সমাজস্বীকৃত ব্যাপার। বিবাহিত পুরুষের অপর নারীতে আসক্তির মধ্যে অবৈধ কিছুই নেই। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলেও তার পিছনে কিন্তু বিপুল জনসমর্থন যুক্ত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বিষবৃক্ষ" এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" দুটি উপন্যাসেই পুরুষের লাম্পট্য তথা বহুবিবাহকে নৈতিকতার আদালতে অভিযুক্ত করেছেন। নগেন্দ্রনাথের দুই বিবাহের বিরুদ্ধে সমাজের নালিশ জানাবার ছিল না। কারণ,— 'উহা সমাজানুমোদিত'। কিন্তু আপন অন্তরের মধ্যে সে বাধা পেয়েছে। তারা আঘাতে আঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, অনুশোচনার দাহে দগ্ধ এবং কামনার আকর্ষণে বিহ্বল হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রণয়বিষয়ে প্রগতিশীল ভাবনার সৃষ্টি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' অর্থাৎ এখানে নীতিবাদী বঙ্কিমের জয় ঘোষিত। ফলে প্রশ্ন থেকে যায়, সাহিত্য ও নৈতিক জীবনের সম্পর্ক কোথায়? "সাহিত্য থেকে সমাজের নৈতিক জীবন কতটা পরিশুদ্ধ হল তা নীতিশাস্ত্রের কথা, সাহিত্যের ফলশ্রুতি নয়। অবশ্য একথাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল যে, সংযমের অভাবে সুস্থ জীবন কীভাবে ভেঙে যায় তার একটি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী উপস্থাপিত করা। সৎ মানুষও অসংযত কামনাকে দমন করতে না পারলে কোন্ অন্ধকারে তালিয়ে যায়, তার দৃষ্টান্ত নগেন্দ্রনাথ। অবশ্য বিধবা কুন্দের প্রতি কামনা ত্যাগ করতে না পারলেও, মোহমদির অধঃপাতের সোপান বেয়ে একেবারে ডুববার পূর্বে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি কুন্দকে যথারীতি বিবাহ করেছিলেন, দু'জনের মধ্যে কোনো অশুচি সম্পর্ক ছিল না। তাঁর প্রধান অপরাধ, চিত্তসংযমে অসমর্থ হয়ে সূর্যমুখীকে দুঃখ দিয়ে পুনরায় বিবাহ করলেন। অবশ্য সূর্যমুখী স্বামীর সুখের জন্যই নিজে উপযাচিকা হয়ে কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী সতীত্বের এই অপমান আর সহ্য করতে পারলেন না। যেখানে স্বামী তাঁকে দেখে আর সুখ পান না, সেখানে স্বামিসান্নিধ্য ত্যাগ করাই তাঁর কর্তব্য— নিবিড় প্রেমের নিবিড় অভিমান।***

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন না, কিন্তু কুন্দের বিবাহ তাঁকে বিরস করে তোলেনি, তার প্রতি সহানুভূতি, তার নবজাগ্রত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি ছিল বলেই কুন্দের আত্মহত্যা রোহিনীর শোচনীয় পরিণামের মতো নয়, সে আত্মহত্যা অভিমানক্ষুব্ধ স্ত্রীর স্বেচ্ছায় আত্মবিনাশ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নীতিশাস্ত্র ও সমাজশাসনের দণ্ড তুলে শাস্তি দিতে অগ্রসর হননি। তার আত্মত্যাগই তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতির পাত্রী করে তুলেছে।***

বঙ্কিমচন্দ্র কি সামাজিক ও পরিবারিক আদর্শের মহিমা উচ্চতর করার জন্য নীতির যূপকাষ্ঠে নর-নারীর স্বাধীন সুস্থ কামনাকে বলি দিয়েছেন? তা যদি হত, তাহলে তিনি বিধবা কুন্দের প্রতি এত সহানুভূতি দেখাতে পারতেন না। অবশ্য দেবেন্দ্র-হীরার প্রণয়কে তিনি দূষিত কলুষিত বলে মনে করতেন, তাদের পরিণাম ভয়াবহ হলেও অস্বাভাবিক নয়। লম্পট দেবেন্দ্র কুন্দকে হস্তগত করতে গিয়ে পরিচারিকা হীরাকে কৃত্রিম প্রণয়ের ভাণে মুগ্ধ করে তার দেহে মনে বিষ ঢেলে দিয়েছে। তাদের দুর্বলতা ও কৃতকর্মই এই ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্য দায়ী। অবশ্য 'বিষবৃক্ষ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হতে পারে, মানুষ স্বহস্তে-রোপিত বিষবৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়। সেই বিষবৃক্ষ হচ্ছে তার অন্তরশায়ী দুর্বাসনা বা চিত্তের অসংযম। নগেন্দ্রনাথের মনে সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা জাগ্রত না হলে গোবিন্দপুরের জমিদারভবনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা দিত না। কাজেই মানসিক সংগ্রাম সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের ক্ষণিক ভ্রান্তি তাঁকে গভীর খাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্ভবত সূর্যমুখীর প্রভাব ও স্মৃতি তাঁকে ততটা নিম্নে নামতে দেয়নি। তিনি দেবেন্দ্রের মতো চরিত্রহীন লম্পট নন, কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালের মতো নিছক রূপলোলুপ নন, তাই বিধবা কুন্দকে বিবাহ করে প্রবৃত্তিকে কতকটা সংযত করতে পেরেছিলেন। সূর্যমুখীর গৃহদাহের মৃত্যুর সংবাদে তাঁর চেতনার সবটাই ওলট-পালট হয়ে গেল, পাপবোধ তাঁকে অনুক্ষণ অনুসরণ করতে লাগল। তিনিই নিষ্পাপ সাধ্বী স্ত্রীর নির্মম ঘাতক। মনের অনুতাপে তিনি তুষানলে দগ্ধ হতে লাগলেন"। / *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : অষ্টম খণ্ড / অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)*

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে মানবচিত্তের বিচিত্র রহস্যের সন্ধানে বিমূঢ় হয়েছেন। কোনরূপ নীতিভাব প্রচার করতে বসেননি। সমাজশক্তি এই উপন্যাসে ক্রিয়াশীল নগেন্দ্রর বিবেকবোধ এবং সূর্যমুখীর মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে সমাজ একটা নির্বিশেষ শক্তিরূপে কাজ করতে পারে না। ঔপন্যাসিক সেরূপ চেষ্টা করলেই উপন্যাসের শিল্পরূপে হানি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন নি। সমাজবিবেক নগেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্রের অঙ্গ হয়ে একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। আবার সূর্যমুখীর চরিত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তার অন্যবিধ ব্যক্তিক প্রকাশও ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের শক্তিকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন আর প্রেমের রহস্যকে একটি বিশেষ মানুষের হৃদয়ঘটিত ব্যাপার রূপে দেখিয়েছেন। নগেন্দ্রেই সেই ব্যক্তি। নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ জীবনই পেয়েছিল। কিন্তু কি কারণে কুন্দনন্দিনীকে পাবার জন্য তার ব্যাকুল হয়ে উঠল, তার উত্তর নগেন্দ্রনাথ

অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পায় নি। সে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে— এই হৃদয়চাঞ্চল্য সে দমন করতে চেয়ে পারেনি। নগেন্দ্রের মধ্যেই প্রেমের সর্বনীতিবিবেকমুক্ত শক্তি এবং সামাজিক নৈতিক আদর্শের সংগ্রাম চলেছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা সংগত নয়। সমালোচক মনে করেন : "বঙ্কিমের ব্যাপক সহানুভূতি বিষবৃক্ষে যেমন রূপায়িত হয়েছে আর কোথাও তেমন নয়। বঙ্কিম পাপের চিত্র-অঙ্কনে পরাঙমুখ ছিলেন বলে গোবিন্দলাল-রোহিনীর প্রসাদপুরের জীবনের কোনো আলেখ্য রচনা করেননি। একথা বিষবৃক্ষের প্রসঙ্গে অচল। দেবেন্দ্রের পাপচারী জীবনের প্রতিচিত্র বঙ্কিম অঙ্কন করেছেন। এবং নীতিবাদী বঙ্কিম বিষবৃক্ষে পাপ-বিশ্লেষকের ভূমিকায় কখনো কখনো উপস্থিত থাকলেও এবং মাঝে মাঝে নীতিপ্রচারকের ভূমিকায় অবতরণ করেও, দেবেন্দ্রের জীবনের জটিলতা। হীরার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সমস্তই শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন।" *(বাংলা উপন্যাসের কালান্তর/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)।*

আসলে "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের মুখ চেয়ে মানুষের হৃদয়বেগকে রুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু সমাজশক্তি যে মানব-অন্তরে জাগ্রত থাকায় তার কামনার পিছনে সংশয়, মুক্তগতির পিছনে বন্ধনের সৃষ্টি করতে পারে তাও দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক জীবনের বার্তাবহ যে শিল্প সেই উপন্যাসে শিল্পের প্রথম স্রষ্টা; তিনি একই সঙ্গে শিল্পী, নীতিপ্রবক্তা ও সমাজের নেতা। তাঁর মতে, নীতিপ্রচার যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, তেমনি সৌন্দর্য প্রচারও সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল প্রচলিত বিতর্কের সমাধান করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। ফলে কখনো তত্ত্বের ফলে শিল্পের অপমৃত্যু; আমার কোথাও বা অনির্বাচ্য সৌন্দর্যের জয়গান। তবে মনে হয়, উপন্যাসের অন্তিমে পূর্বোক্ত নীতিকথার উচ্চারণ প্রয়োজনহীন। তাহলে হয়তো তিনি শাস্ত্রসংহিতার অনুশাসন থেকে 'বিষবৃক্ষ'কে বাঁচাতে পারতেন। আসলে "বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, মানবচিত্তের প্রণয়প্রণবতার মুক্তরূপ অঙ্কনে সংকুচিত হইয়াছেন।" এবং "নীতিবাগীশ বঙ্কিম এবং মুক্তপ্রেমের রূপকার বঙ্কিমের এক দ্বন্দ্ব বিষবৃক্ষ উপন্যাসকে ভিতর হইতে পীড়িত করিয়াছে।"

১৯। চরিত্র বিচার :

• সূর্যমুখী :

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখী বাঙালি পরিবারের নারীর প্রতীক, সূর্যমুখীর পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে সূর্যমুখীর মানসিকতা প্রায় অনুপস্থিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাঙালি পরিবারের একটি পূর্ণাঙ্গমণ্ডিত নারী চরিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হলেন। ১৮৭৩-এ প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী নায়িকা হলেও তার মধ্যে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর চরিত্রের সেই প্রদীপ্ত ভাব এবং ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা সম্ভবত পরিবর্তিত হয়েছিল, নচেৎ নায়িকা চরিত্রের এমন বিবর্তন পরম্পরা লক্ষ্য করা যেত না। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীকে আরেকটি রূপে প্রকাশিত করার জন্য কমলমণি চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাঙালি পরিবারে ভ্রাতৃজায়ার যে রূপ প্রকাশিত তা ননদিনী ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামাসুন্দরীর মতো এখানে কমলমণিকে অঙ্কন করেছেন। সূর্যমুখী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সাধারণ বয়ঃজ্যেষ্ঠা প্রৌঢ় গম্ভীর প্রকৃতির গর্বিতা গৃহকর্ত্রী নন। তিনি আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকারূপে আদর্শলোকের পত্নী। বঙ্কিমের আদর্শ নারীচরিত্র বাস্তবলোকের নারী, সংসারের সুখ ও কল্যাণে উৎসর্গীকৃত নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখী রূপসী, প্রিয়বাদিনী ও পরার্থপরায়ণা। ছাব্বিশ বছরের পরিণত জীবনে যে স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য থাকা স্বাভাবিক তিনি তদপেক্ষা গম্ভীর, স্থির এবং সংসারের কেন্দ্রশক্তিরূপে বিরাজিতা। তিনি নগেন্দ্রনাথকে কমলমণির কাছ থেকে কুন্দকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথকে তিনি ভালো করে চিনতেন বলে সেদিন নানা পরিহাস করতে তাঁর কোনো বাধা আসেনি। কিন্তু কোনো মানুষকে কোনো মানুষ যে চিনতে পারে না তা নগেন্দ্রর রূপান্তরে তিনি পরবর্তীকালে উপলব্ধি করেছেন।

'ঐশ্বর্যে– স্বামীপ্রেমে– গৃহকর্তৃত্বে প্রাপ্তি ও সুখ সূর্যমুখীর। ...নগেন্দ্র— সূর্যমুখীর মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই, অপরিচয়ের রহস্য নেই। আবল্য তারা স্বামী-স্ত্রী রূপেই বড় হয়েছে। একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে, প্রতিদিনের অভ্যাসে ওতঃপ্রোত। দুজনেই কিছু গম্ভীর, অন্তর্মুখী। সন্তানের কলরব নেই, গাঢ় প্রশান্তি। *** সূর্যমুখীর পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়, স্বামীর উপরে নিশ্চিত অধিকারবোধ একধরনের আভ্যন্তর, উচ্চমান্যতার সৃষ্টি করেছিল, তা কিন্তু স্থূল দর্প নয়'। *(বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড/ক্ষেত্র গুপ্ত)।*

বালিকা কুন্দনন্দিনী ক্রমশ সূর্যমুখীর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলে তিনি তার সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিলেন। তারপর কুন্দের বৈধব্যের পর ষোড়শ সুন্দরী বিধবাকে আপন অন্তঃপুরে আশ্রয় প্রদান করেন; আর এইখান থেকেই নগেন্দ্রনাথের ভাবান্তর শুরু। ক্রমশ সূর্যমুখীর পত্রে কমলমণি জানতে পারলেন যে বিধবা কুন্দনন্দিনীর অবস্থিতিতে তার সংসারে ভাঙন ধরেছে। যে কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাকে বিদায় করার জন্য

সূর্যমুখী ব্যাকুল— "পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?" কেননা সূর্যমুখীর কাছে পৃথিবীতে যদি কোনো সুখ থাকে, চিন্তা থাকে, সম্পদ থাকে, তবে সে স্বামী। সেই স্বামীকে যে কেড়ে নিতে চায় সূর্যমুখী তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। ক্রমশ সূর্যমুখীর চিত্তদেশে ঈর্ষার আবির্ভাব, যদিও তার বহিঃপ্রকাশ নেই।

দীর্ঘদিন এই মানসিকতা সংগুপ্ত করার সম্ভব হল না এবং নগেন্দ্রনাথকে যখন এই তথ্য জানালেন তখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মত্ত। সেই মুহূর্তে তার আত্মত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং স্বামী-সুখের জন্য তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জনে সমুদ্যতা। সূর্যমুখীর প্রত্যেকটি কার্য তার পতি-প্রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কুন্দের প্রতি রোষ এবং অভিমানিনী কুন্দ ফিরে এলে তার প্রতি অযাচিত করুণা এই উভয় ক্রিয়ার উৎস নগেন্দ্রনাথ। সূর্যমুখী কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিলেন তার কৈফিয়ৎ প্রদান করে বলেছেন— "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস— সে মুখ-ভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস— তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এই সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না?"

গৃহত্যাগের পর সূর্যমুখীর কঠিন অভিজ্ঞতা; তার পূর্বে গৃহত্যাগের সংকল্পের কথা, তার অকথিত বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে বিদায়কালে লেখা পত্রের মাধ্যমে। এই পত্র থেকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর গৃহত্যাগ আকস্মিক নয়, পূর্বপরিকল্পিত। এই পত্রে পতিভক্তি ও ঈর্ষা দুই সমান্তরালভাবে প্রকাশিত। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলেও তার মন পড়ে রইল গৃহাঙ্গনে। অবশেষে সূর্যমুখী সন্তাপ আর বেদনায়, অনুরাগে আর আক্ষেপে স্বীয় চিত্ত মন্থন করেছেন। কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রতি মানসিকভাবে অত্যন্ত কঠোর, অবশেষে কুন্দের প্রত্যাবর্তনে সূর্যমুখী মিলন সংসাধিত করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছেন। সূর্যমুখী সমগ্র উপন্যাসে পুনরায় পুনর্মিলনের পটভূমিকায় নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর শয্যাগৃহে— সূর্যমুখীর স্মৃতিতীর্থে পুনরায় আবির্ভূত। এ যেন পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতিরোমন্থনে মিলনের অপার আনন্দে উভয়ের নবজীবনের পথে যাত্রা। সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রনাথ বিহ্বল হয়েছিলেন, বিষাদ তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল। এইবার নগেন্দ্র সূর্যমুখী যখন মিলিত হলেন, তখন সেই মিলনের মধ্যে চিরকালের একটি ব্যবধান বেঁচে রইল আর তা হল অশরীরী কুন্দনন্দিনীর স্মৃতি, করুণ কুন্দকলির ফুটে ওঠার আগেই ঝরে পড়ার বেদনার স্মৃতি।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের এই ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য কি সূর্যমুখীর কোনো দায়দায়িত্ব নেই?

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর বিচ্ছেদ সংঘটনে সূর্যমুখীর কোন দোষ ছিল না, এমন ভাবনার বশবর্তী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সূর্যমুখীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রেখেছেন এবং অধঃপতনের দায়িত্ব নগেন্দ্রের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন। বাস্তবে এমন ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে; কিন্তু উপন্যাসে এর ফলে সূর্যমুখী চরিত্রের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ

প্রসঙ্গে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন— "সে কেবল অন্যকৃত অত্যাচারে উৎপীড়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য সূর্যমুখী যেরূপ উচ্ছ্বসিত অপরিবর্তিত পতিভক্তি, যেরূপ প্রতিবাদহীন মৌন গৌরবের সহিত এই বিগাৎপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও নিঃস্বার্থ প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ***একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সূর্যমুখীর চরিত্রের মধ্যেই স্বামিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার কতকটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে।*** সূর্যমুখী কিন্তু গর্বিতস্বভাবা ছিলেন। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাঁহার এই বিশেষত্বের, এই মৌন অহংকারের, ধর্মশীলা, পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর একটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত গর্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।" স্বামীর মন অন্যাসক্ত হয়েছে জেনেও তিনি স্বামীর অনুরাগ ফিরে পাওয়ার জন্য আগ্রহ, আকুলতা, ভাববিলাসমূলক অনুরোধের দ্বারা পূর্ব প্রেমের দোহাই দিয়ে পলাতক প্রেমকে ধরে রাখার চেষ্টা করেননি। পরস্ত্রীলোলুপ, রূপমোহাসক্ত নগেন্দ্রকে বিন্দুমাত্র নিবৃত্ত করবার চেষ্টা না করে সপত্নীর হাতে তুলে দিয়ে নীরবে আত্মবিসর্জন করেছেন। সূর্যমুখী যেন একটা কঠোর অবিচলিত আত্মসংযমের প্রতীকমাত্র। সূর্যমুখী যদি ভ্রমরের মতো উচ্ছ্বলপরায়ণা হতেন, তবে হয়তো নগেন্দ্রনাথকে ধরে রাখতে পারতেন। ফলত, সূর্যমুখীর ব্যবহার যতই অনিন্দনীয় হোক্ না কেন, ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য অংশত দায়ী তা স্বীকার করতে হবে।

সূর্যমুখী কি উপন্যাসে বিদ্রোহিনী প্রতিবাদিনী নারী চরিত্র? স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের কারণ কি সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট হওয়া? না কি বহু বিবাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কোনটি তা আবিষ্কার করা দুরূহ। নগেন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহে তার তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে তার গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। মনে হয়, সূর্যমুখীর প্রধানতম ক্ষোভ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে যেমন তেমনি বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে এবং স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও বটে। সূর্যমুখী কমলমণিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" সূর্যমুখীর এই চিঠি কি বঙ্কিমচন্দ্রের আপন মনের অভিব্যক্তি? কিন্তু তা নয় কেননা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহ দিয়ে তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনুকূলতা করেছিলেন। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে, 'সাম্য' গ্রন্থে তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছেন। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থায় পরিণাম শুভ হয়নি— উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। সূর্যমুখীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী, বিধবা হোন বা না হোন স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে অক্ষম ছিলেন। আসলে সূর্যমুখী আপন লজ্জা, ক্ষোভ এবং অপমান বিদূরিত করার মানসে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে নিজের জীবনে ভয়ঙ্কর পরিণামকে বরণ করতে প্রয়াসী। সূর্যমুখী ব্যক্তি ও সমাজকে একবৃন্তে উপস্থাপিত করে যেন বিদ্রোহিনী নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকাশিত হতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক দ্বন্দ্বের রূপায়ণ সম্ভবত সূর্যমুখী। উনিশ শতকীয় দোলাচলচিত্ততার বহিঃপ্রকাশে সূর্যমুখী— কেননা তিনি

আদর্শলোকে পত্নী হয়েও বাস্তবলোকের নারী। আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে কন্টাকীর্ণ ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত জীবনপথ পরিক্রমা করে সূর্যমুখী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেরই নন, বাংলা সাহিত্যেরও অনন্যা নায়িকা।

• নগেন্দ্রনাথ :

বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনাকালে পূর্ববর্তী উপন্যাসের পুরুষচরিত্রের ধারণা থেকে সরে এসেছেন। 'বিষবৃক্ষ' পূর্ববর্তীকালে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষচরিত্রগুলি ইতিহাস রোমান্স অথবা শুধুই রোমান্সের জগৎ থেকে সংগৃহীত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনীর ঘটনাকালে উনিশ শতকের মধ্যভাগ। এই পর্বে নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবণতা তাঁর সমকালীন সমাজের প্রতি নিবদ্ধ। অবশ্য তাঁর উপন্যাসের নায়ক বা পুরুষ চরিত্ররা উচ্চবিত্ত অথবা জমিদার শ্রেণী থেকে সংগৃহীত। পূর্ববর্তী উপন্যাসে নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র সদ্‌গুণের আধার এবং শৌর্য বীর্যের প্রতীকরূপে তাঁদের অঙ্কন করতে চেয়েছেন। পরবর্তী পর্বে নবকুমার এবং নগেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রায় অনুপস্থিত। 'বিষবৃক্ষ' পর্বে নায়কের সঙ্গে ঘটনার পরিণতির চারিত্রিক যোগ লক্ষ্য করা গেল। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে চরিত্র এবং ঘটনার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলা হল এবং আধুনিক উপন্যাসে নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় যে গুণ ও দোষের সমন্বয় হয় সেই জাতীয় দোষগুণ সমন্বিত নগেন্দ্রনাথকে কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে তিনি উপস্থাপিত করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র বা নায়ক নগেন্দ্রনাথ ত্রিশবৎসর বয়স্ক, বিবাহিত, পত্নীব্রত, প্রেমচাঞ্চল্যহীন পুরুষ; তিনি যৌবনের প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত। কিন্তু তবুও নগেন্দ্র রূপবান ও গুণবান; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য; নীরোগ নারীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধবী স্ত্রী; *** নগেন্দ্র নিজ চরিরত্রগুনেই চিরকাল সুখী; তিনি সতবাদী, অথচ প্রিয়ংযদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্তব্যকমে স্থির সংকল্প। *** ভার্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরাকারই অবিচ্ছিন্ন সুখ; *** তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্যমুখীর নিকট অবিজ্ঞচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি।" কিন্তু তাঁর চরিত্রে দুর্বলতা হল রূপতৃষ্ণা। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসে নায়কচরিত্র পরিকল্পনায় বর্তমান জীবনকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণকেও অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। কুন্দনন্দিনীর রূপ যেভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করল এবং চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হয়েও তিনি সফলকাম হলেন না। সেই অধঃপতনের মূল কথাই আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয়। "বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি নগেন্দ্রনাথই

নকল পূর্ণতা ও প্রাপ্তির মধ্যেও একটি চরিত্রে কেমন ভাবে বিষয়বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কিভাবে তা ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে, এবং কেমন করে সেই বৃক্ষ থেকে ফল উৎপন্ন হয়— বঙ্কিম নগেন্দ্র চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। নগেন্দ্রচরিতের বিশেষত্ব এই যে, সে চিত্ত সংযমের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি— তৎসত্ত্বেও সে চিত্তসংযমে সক্ষম হয়নি। দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, দেবেন্দ্রের চিত্তসংযমে কোনো প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু নগেন্দ্রের চিত্ত সংয়মের পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শক্তি ছিল না। ***নগেন্দের চিত্তসংযমে আকুলতা ছিল, কিন্তু চিত্ত সংযমের জন্য যে শিক্ষা ও যে অভ্যাসের প্রয়োজন তা তার ছিল না।'' *(বঙ্কিম সাহিত্য / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)।*

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে পাওয়ার অব্যবহিত পরেই বন্ধু হরদেব ঘোষালকে যে চিঠি লিখেছেন সেখানে কুন্দনন্দিনীর রূপের মোহিনীশক্তির বর্ণনা আছে— ''বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু ... ... বোধ হয় যেন এ পথিবীর সে চোখ নয় ... ... কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী তাহা নহে ... বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া আর কিছু আছে। রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকারই পুষ্প সৌরভকে শরীরী কারিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।'' এই বর্ণনায় অসঙ্কোচে রূপের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। একই সময় সূর্যমুখীকে যে পত্র লিখলেন সেখানে কি আছে বঙ্কিমচন্দ্র তা পাঠককে জানাননি, হরদেব ঘোষালের কাছে লিখিত পত্রে রূপজ মোহের উল্লেখ আছে, অথচ সূর্যমুখীর কাছে নগেন্দ্রের এই প্রথম আত্মগোপনকে তাঁর অধঃপতনের পূর্বভাস বলা যেতে পারে। এরপর কীভাবে অনুকূল পরিবেশে নগেন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যমুখী কমলমণিকে যে পত্র লেখেন সেখানে নগেন্দ্রনাথের আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে। এরপর নগেন্দ্র স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়ে প্রবৃত্তির বন্যায় ভেসে গেছেন। ''আত্মচরিতার্থ নগেন্দ্রকে কখনও অন্য বিষয়ে প্রলুব্ধ হতে হয়নি। তার কোনো দিনই কোনো বিষয়েই অভাব ছিল না। অভাব থেকেই আসে প্রলোভন। নগেন্দ্রনাথ ছিল জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখী মানুষ তার কখনও অভাববোধ ছিল না; তাই দুঃখবোধও ছিল না, তাই কোনো লোভেরও যশবর্তী তাকে হতে হয়নি; আর সেই কারণে লোভ সংবরণ করবার মানসিক অভ্যাস বা শক্তি তার আদৌ হয়নি। কুন্দনন্দিনীর প্রতি লুব্ধ হয়ে নগেন্দ্র বারে বারে চিত্তসংযম কর যায় না। নগেন্দ্রও শেষ পর্যন্ত চিত্তসংযমে অক্ষম হয়েছিল। চিত্তসংযমে নগেন্দ্রের যথেষ্ট প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু এই সংযমের জন্য যে অভ্যাস ও শিক্ষার প্রয়োজন, নগেন্দ্রের তা কোনো দিন ছিল না বলেই সে চিত্তদমনে সফল হতে পারেনি''। *(বঙ্কিমসাহিত্য / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)।* প্রবৃত্তির অনিবার্যতায় ফলে চরিত্রটি ক্রমশ ব্যক্তিত্ব বর্জিত ও বর্ণহীন হয়ে পড়েছে।

উপন্যাসের ঘটনাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের দ্রুত পরিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ''নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রণয়পরিত্যাগ করে, কুন্দনন্দিনীর রূপজমোহে আক... ...গ্রহ ছিল কিন্তু চি... ...তার ছিল না

নগেন্দ্রের চিত্তপ্রাঙ্গনে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দ্রুত বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল্যোৎপাদন করে"। *(বঙ্কিমসাহিত্য/পূর্বোক্ত)*। ক্রমশ কুন্দের প্রতি লজ্জার আবরণ দূরীভূত হল। কমলমণি যখন ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ এবং কুন্দের কল্যাণ কামনা করে কলকাতা গমনের প্রস্তুতি নিলেন তখন নগেন্দ্রর সংযমের বাঁধ ভাঙল। এক দুর্বল মুহূর্তে কুন্দের নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। প্রত্যাখ্যাত হলেও নগেন্দ্রনাথ অধঃপতনের নিম্নসোপানে অবতীর্ণ হলেন। এমনকি কুন্দের পলায়নের পর হীরার চক্রান্তে নগেন্দ্র সূর্যমুখীকেই তার গৃহত্যাগের জন্য দায়ী মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে যখন অনুযোগ করলেন তখন সংকোচের সামান্য প্রাচীরও ধূলিসাৎ হল। এই সময় নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর যে সাক্ষাৎকার হয় তা উভয়ের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা এবং এর প্রভাব উভয়ের জীবনে সুদূরপ্রসারী। তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করলেন, যদিও সূর্যমুখীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলেন না। সূর্যমুখীকে জানালেন, তিনি কুন্দনন্দিনীর সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে যাবেন এবং যদি কখনও তাকে ভুলতে পারেন তবেই দেশের প্রত্যাগমন করবেন। এই অংশে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত, অসংযত প্রবৃত্তিতে তাঁর বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে। যদি তা না হোত তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে কুন্দনন্দিনীর সন্ধানের সুব্যবস্থা করা তাঁর কর্তব্য, কিন্তু তাকে বিস্মৃত হবার জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। নগেন্দ্রনাথের আত্মপ্রবঞ্চনা সূর্যমুখীকে ভিন্ন পথে প্রণোদিত করল এবং তিনি স্বামীর সুখের জন্য, কুন্দনন্দিনী প্রত্যাবর্তন করলে তাব হাতে স্বামীকে তুলে দিলেন। নগেন্দ্র যতই অধঃপতিত হোক না কেন, তিনি সাময়িক উত্তেজনায় কুন্দের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করলেও সূর্যমুখী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুন্দের সঙ্গে তাঁর বিবাহ না দিলে এ বিবাহ সহজ হোত না। বিবাহের অব্যবহিত পরে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে যে পত্র লিখেছেন সেখানে তাঁর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষিত হয়েছে। সমালোচক মনে করেন— "পত্রখানি আদ্যন্ত আত্মপ্রবঞ্চনায় পূর্ণ। ইহা যেন ব্যবহার জীবনের পক্ষে দুর্বল আত্মপক্ষ সমর্থনের নিষ্ফল প্রয়াস। (উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম : প্রফুল্ল কুমার দাসগুপ্ত)। উক্ত পত্রে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছেন— "সূর্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহে, তিনি বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?" একে সত্যের বিকৃতি রূপে অভিহিত করতে হয়। সূর্যমুখী উদ্যোগী হয়ে নগেন্দ্রের বিবাহ প্রদান করেছেন, এই ঘটনা নগেন্দ্রের কাছে বড় হল, অথচ এর পশ্চাতে যে মর্মন্তুদ যাতনা অশ্রু সজল আবহের পরিমণ্ডল রচনা করেছে তা নগেন্দ্রের মোহান্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল না। সূর্যমুখী আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিলেন কিন্তু উপলব্ধি করলেন না যে বৃহত্তর মানবধর্মের প্রতি তিনি কতখানি অবিচার করলেন।

মানুষের নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনের মধ্যে অবৈধ প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব কিভাবে সমস্ত বিধিবিধান ও জীবনকে বিপর্যস্ত করে তার চিত্রই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে অঙ্কিত। মধ্যযুগের জীবনে এই ঘটনা হয়ত ঘটতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে পতিব্রতা স্ত্রীর সেবাধন্য নগেন্দ্রনাথের চিত্তদেশে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তির আবির্ভাব রোমান্টিক

প্রেম নয়, অথবা পরোপকার ও প্রেমের মিলিত রূপও নয়। অথচ নগেন্দ্রনাথ পত্নীপ্রেমী, দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি। রূপেগুণে আদর্শে চরিত্র। আবার তাঁরই আসক্তি ও চরিত্রবলহীনতায় সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত, তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে নায়করূপে বিরাজিত। নগেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রিয় ভালোমানুষ নন, আবার অতিসক্রিয় চরিত্রও নন। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ তাঁকে অভ্যস্ত জীবনাদর্শের পরিপন্থী করে তুলেছে। আসলে মানুষের অন্তরালবর্তী সুপ্ত সত্তা কখন জেগে উঠে হাজার বছরের মরণঘুমকে বিদূরিত করে চকিত স্বপ্নোত্থিত কোলাহলে জগৎ সংসারকে আলোড়িত করে তা কেউ জানে না। নগেন্দ্রনাথও সেই আলোড়িত আবর্তের নায়ক আর তাঁর সঙ্গে কুন্দের বিবাহের আনন্দউল্লাস অপেক্ষা বেদনা করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে; কেননা বিবাহের পর সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ ঘটেছে। 'কুন্দের গৃহত্যাগ' নগেন্দ্রনাথকে মুখর করে তুলেছে, সূর্যমুখীর প্রতি কঠিন ও কুন্দের প্রতি উন্মত্ত করে তুলেছে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রনাথকে মোহহীন করেছে। তিনি কঠোর হয়েছেন কুন্দনন্দিনীর প্রতি এবং সূর্যমুখীর বিচ্ছেদে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। সূর্যমুখীর সঙ্গে বিচ্ছেদে আর কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে তিনি বিরহের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত সূর্যমুখীকে উপলব্ধি করেছেন, সূর্যমুখীর সঙ্গে বিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নবজন্ম হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য একটি ক্ষণিক ভাবমোহ মাত্র। সূর্যমুখীর সঙ্গে তাঁর প্রেম একটি স্থায়ী মানস সম্পদ। সূর্যমুখীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটলেও চিত্ত পরিবর্তন সমাপ্ত হয়নি। মৃত্যুশয্যাশায়ী কুন্দের কাছে ফিরে এসে প্রেমের যে করুণ কোমল সম্ভাষণ করেছেন সেকানে পুনঃপ্রাপ্ত সূর্যমুখীর সান্নিধ্যজনিত আনন্দ ও নববিবাহিত কুন্দনন্দিনীর আসন্ন চিরবিচ্ছেদ আশঙ্কার ব্যথা ধ্বনিত। নগেন্দ্রনাথের চরিত্র বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অন্তরের দ্বন্দ্বে উদ্ভাসিত। দোষ ও গুণের সমন্বয়ে গঠিত ভাগ্যবিড়ম্বিত একটি অপমার্গগামী পুরুষকে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করলেন।

• **কুন্দনন্দিনী :**

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়িকা সূর্যমুখীর পাশে কুন্দনন্দিনীকে অনেকখানি ম্লান বলে মনে হয়। অবশ্য সূর্যমুখীর বিপরীতে ত্রয়োদশী কুন্দের মধ্যে সূর্যমুখীর মতো ব্যক্তিত্ব আশাও করা যায় না। কুন্দনন্দিনীর ভীরুপ্রেম উপন্যাসে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তিলোত্তমার মধ্যে যে পূর্বরাগ প্রিয়তমের নাম জপের মধ্য দিয়ে অন্তরে দৃঢ় আসন পেতেছিল, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে সেই জাতীয় পূর্বরাগ ও মিলন থাকলেও তিলোত্তমা ও কুন্দনন্দিনীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কুন্দনন্দিনীর পিতার মৃত্যুদিনে অনাথ বলিকার আশ্রয়রূপে রূপবান জমিদার নগেন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির গৃহে রেখে তার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। আরো পরে সূর্যমুখীরে বিশেষ স্নেহভাজন তারাচরণের সঙ্গে বিবাহও দিয়েছিলেন। নগেন্দ্র উপন্যাসের প্রায় প্রথম দিকে কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও হৃদয় আকর্ষণ করেছিলেন, তখনও তিনি আশ্রয়দাতা ও পত্নীপ্রেমিক, কিন্তু কুন্দপ্রেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। নগেন্দ্রনাথ

রূপবান পুরুষ, বিত্তবান জমিদার; কুন্দনন্দিনী নিরাশ্রয় বিধবা— নগেন্দ্রের কাছে তার আত্মসমর্পণ অনেকটা অসহায়তা ও নিরাশ্রয়তার জন্য হলেও ছাব্বিশ বছরের তরুণ তারাচরণের সঙ্গে সে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেছে, কুন্দ অনাস্বাদিতাপূর্বা মুগ্ধা নায়িকা নয়, সে জানে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রণয় নিন্দনীয়। সংসারে জীবনে তার অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে কমলমণির 'দাদাবাবু' তাকে ভালোবাসে; আর এও জেনেছে তার জন্যই সোনার-সংসার শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডির আশ্রুসাগরে পরিণত হয়েছে।

সূর্যমুখীর মধ্যে যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব আছে, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে সেই বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব নেই; কিন্তু কুন্দনন্দিনী জানে তার আকর্ষণ কম নয়, কুন্দনন্দিনী পেয়েছে তারাচরণকে আর চেয়েছে নগেন্দ্রকে এবং নগেন্দ্রও তাকে চেয়েছে। কুন্দনন্দিনীর মনে দুঃখ এবং নগেন্দ্রের প্রতি নবজাতপ্রেমের ভাববিহ্বলতার মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তব সান্নিধ্যে রক্তমাংসের মানুষের সমস্ত কামনা নিয়ে নগেন্দ্রনাথ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাবের উত্তরে কুন্দনন্দিনীর ওষ্ঠে একটি মাত্র শব্দ-সংলাপ বসিয়েছেন— 'না', এই 'না' বিরক্তিসূচক নয়, মুগ্ধার প্রেমপ্রকাশ নয়, অথবা লজ্জাশীলার উত্তর নয়,— এ হল সংস্কারের, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বের। এখানে কুন্দের আপাত কোমল স্বভাবের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে গৃহত্যাগ করার পর যখন দত্ত বাড়িতে পুনরায় প্রত্যাগমন করেছে তখন নগেন্দ্রর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কুন্দনন্দিনীর তীব্র ব্যক্তিত্ব থাকলে হয়তো এ বিবাহে যথার্থভাবে তার পক্ষে 'না' বলা সম্ভব হতো। কেননা পরিবেশ, সমাজ, কৃতজ্ঞতা দায়িত্ব ইত্যাদিবোধ থেকে না শব্দ উত্থিত হতো। কিন্তু নগেন্দ্রর সঙ্গে বিবাহে সূর্যমুখীর প্রতি কৃতঘ্নতা, তারাচরণের প্রতি অমর্যাদা সমস্তই প্রকাশিত হল।

আসলে অপরিস্ফুট কুন্দবালিকার মতো কুন্দনন্দিনীর জীবনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটল নগেন্দ্রের চিত্তবিক্ষোভের ফলে এবং সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে। শুভ্র স্নিগ্ধকান্তি নগেন্দ্র-বাঞ্ছিতা কুন্দনন্দিনী দীর্ঘকালের সাধনা আর ভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণা নারীরূপে বিকশিত হয়ে উঠল। নগেন্দ্র যেদিন এই পরিণয়কে পরিণাম স্মরণীয় ঘটনারূপে স্বীকার না করে ভ্রান্তি রূপে পরিগণিত করলেন সেইদিনই কুন্দের উপলব্ধি হল, 'সকল সুখেরই সীমা আছে।' কুন্দনন্দিনীর প্রেম রূপমোহের দ্বারা প্রবুদ্ধ, কৃতঘ্নতা দ্বারা পরিপালিত এবং বিধবার অক র্তব্যের দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রেমকে অভিনন্দন জানাননি। কুন্দনন্দিনীর জন্যই হীরার অন্তরে ঈর্ষা, দেবেন্দ্রের অন্তরে লালসা, নগেন্দ্রের অন্তরে বিষাদ এবং সূর্যমুখীর জীবনে চরমতম বেদনার বহিপ্রকাশ।

নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন, কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছেন। বিরহিনী কুন্দনন্দিনীর চতুর্দিকে জগতের আলো নির্বাপিত। এরপর সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে বিরহ ব্যথাতুর নগেন্দ্রনাথ দত্তগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি কুন্দনন্দিনীর প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে সূর্যমুখীব শয়নগৃহে কাঁদতে গেলেন। সেদিন কুন্দ উপলব্ধি

করেছে যে তার বেদনার পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। কুন্দর প্রথম স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল চার বছর আগে, সেদিন তার মা তাকে স্বপ্ন দিয়ে ভবিষ্যতের চিত্র দেখিয়েছিলেন। এবার সর্বরিক্ত কুন্দনন্দিনী তার মাকে, অন্তরে গহন গোপনে আকর্ষণ করে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখল। প্রভাতকালের স্বপ্ন— সেই স্বপ্নে হীরা হাসিমুখে আবির্ভূতা, মা তাকে নিজের কাছে ডাকছেন। বাস্তবে ঈর্ষা উত্তেজিত হীরা হাসিমুখে সান্ত্বনাছলে বিষের কৌটা রেখে গেলে কুন্দ তা গ্রহণ করে। মৃত্যু মুহূর্তে নগেন্দ্রনাথ তার কাছে ছুটে এলেন— অতীতের জন্য অনুতপ্ত, বর্তমানে অনুরক্ত। নির্বাপিত হওয়ার আগে প্রদীপ যেমন জ্বলে ওঠে তেমনি নির্বাক কুন্দের মুখর হয়ে ওঠার ঘটনাটি ঘটল।

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু বিষাদান্তক না হলেও বিয়োগান্তক এবং মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে। আবার এক অর্থে তার মৃত্যু ব্যঞ্জনাধর্মী; কেন না কুন্দ বিরহের মধ্যে নগেন্দ্রের চিত্তলোকে চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত হল। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের মধ্যে কুন্দনন্দিনী চিরকালের জন্য অদৃশ্য ব্যবধান রচনা করে গেল। তার পাপ অপেক্ষা ভাগ্যবেদনা মানুষকে বিচলিত করে। অথচ এই কুন্দর জন্য সূর্যমুখী কেঁদেছে, কমলমণি তাকে ভালোবেসেছে। দেবেন্দ্র মোহাবিষ্ট হয়েছে; সম্ভবত সরলা কুন্দর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের সৌন্দর্য মাধুর্য তাকে সকলের প্রিয়পাত্রী করে তুলেছে।

কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রথম যৌবনের ব্রীড়া মিশ্রিত প্রণয়বিহ্বলতা, আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, শিশুসুলভ সারল্য, নৈরাশ্যজনিত মৃত্যুকামনা এবং সেইসঙ্গে জিজীবিষা, তাকে পূর্ণায়ত নারী চরিত্রে পরিণত করিয়েছে। মোহিতলাল কুন্দনন্দিনীর মধ্যে আয়েষার নব সংস্করণ প্রত্যক্ষ করেছেন— "প্রেমের আত্মবিসর্জনের মধ্যে নারীর যে অসীম শক্তি— অতখানি কোমলের মধ্যে ঐ কঠিন আত্মস্থও নিঃসন্দেহে উভয় চরিত্রের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র।" আসলে আয়েষা আত্মনির্ভরশীলা আর কুন্দ পরনির্ভরশীলা।

কুন্দের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ইতিহাস। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর এই দুঃখের বোঝা আরও অসহনীয় হল। কুন্দ শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছে— "অন্তরের দেবতাকে বাহিরে পাইতে যাইয়া আজ সে সকলই হারাইয়া ফেলিয়াছে।" উপন্যাসে কুন্দর মৃত্যু খুব একটা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। কারণ, তার মতো দুর্বলা নারীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করা সহজ ছিল না। ধীরে ধীরে তার জীবনভাবনায় মৃত্যু এগিয়ে এসেছে, জীবনাসক্তির জন্য কুন্দ মৃত্যুর হাতছানি ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দ্বন্দ্ব তাকে সদাসর্বদা কাতর করেছে। এরপর একসময়ে উপন্যাসে কুন্দ টিকে ছিল, বেঁচে ছিল না। নগেন্দ্রের লাঞ্ছনা সে সহ্য করতে পারে নি। যে মানসিকতায় সে বিবাহ প্রস্তাবে 'না' বলেছে সেই মানসিকতায় মৃত্যুবরণ করেছে। হীরার চক্রান্তে সে অভাব দূর হয়েছে। স্বপ্ন, ভাগ্যদেবতার ইঙ্গিত, হীরা ভাগ্যদেবতা প্রেরিত কুন্দের মৃত্যুদূত। কুন্দের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার মৃত্যু কার্যকরণ পরম্পরার অনিবার্য পরিণতি। সঙ্গত করণেই প্রশ্ন ওঠে কুন্দের বিষপানের জন্য দায়ী কে? হীরা অথবা কুন্দ স্বয়ং? সমালোচক মনে করেন, 'দায়ী ঘটনাচক্র, সহায় কুন্দর প্রকৃতি।' *[বঙ্কিম সরণী / প্রথমনাথ বিশী]।* বঙ্কিমচন্দ্র

স্বয়ং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।' অথচ কুন্দনন্দিনী বিষপান করেছে। 'বিষবৃক্ষ' কাহিনীতে দুটি প্রণয় ত্রিভুজ-বৈধ এবং অবৈধ। বৈধ ত্রিভুজ কাহিনীতে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনী। অবৈধ ত্রিভুজ কাহিনীতে দেবেন্দ্র-হীরা-কুন্দনন্দিনী। দ্বিতীয় ত্রিভুজ কাহিনীর আবহাওয়া অতীব বিষাক্ত। হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের ও কুন্দর প্রতি দেবেন্দ্রর আসক্তি ভিন্নতর। কুন্দর প্রতি দেবেন্দ্রের আসক্তি অবৈধ ও চরম হৃদয়হীনতা। দেবেন্দ্রকে পাওয়ার জন্য হীরা কুন্দকে ব্যবহার করেছে। হীরা যখন বুঝতে পেয়েছে যে দেবেন্দ্র তার পরিবর্তে কুন্দকে পাওয়ার জন্য তার মনোরঞ্জন করেছে তখন 'খণ্ডিতা রমণীর প্রবল প্রণয় পরিণত হল প্রচণ্ড বিদ্বেষে।' উপন্যাসে সূর্যমুখীও নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত অসহায়, বিষাদগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ। কুন্দ পরবর্তীকালে উপেক্ষিতা। কুন্দের কল্পিত সুখের পাত্র বাস্তব দুঃখে কানায় কানায় পূর্ণ; সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনে সকলেই সুখী। কুন্দ অনাদৃত ও বিস্মৃত। মৃত্যু ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। মৃত্যুকামনায় নিরতা কুন্দনন্দিনী স্বপ্নেমায়ের আহ্বান শুনতে পায়; আর এই অবস্থায় হীরা তার সামনে আনে বিষের প্রলোভন। কুন্দনন্দিনীর বিষপানের কারণ অবস্থাচক্র ও প্রকৃতি। প্রমথ বিশীর মতে,— "কুন্দর প্রকৃতি বিশেষ একভাগে গঠিত বলেই তার পক্ষে হীরার প্ররোচনায় বিষপান সম্ভব হয়েছে; বস্তুত তার সমাস্ত ক্রিয়া-নিষ্ক্রিয়তা প্রকৃতি বিশেষের পরিণাম।" *[পূর্বোক্ত।]*

কুন্দ চরিত্রে আচরণ ধর্ম অপেক্ষা আবহধর্ম বেশী। কেউ কেউ কুন্দকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের পুতুল বলেছেন। কুন্দের স্নিগ্ধ স্বভাবধর্ম ও নীরব সহনশীলতা সমালোচকদের আবেগ অবরুদ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যবিড়ম্বিত আশ্রয়ধন্যা এই বিধবা চরিত্রের সূচনাতেই তাকে স্বপ্নচালিত করে ভবিষ্যত সক্রিয়তার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নিরালম্বতা দিয়ে যার চরিত্র শুরু, ভাগ্যের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার জোর বা উৎসাহ তার মধ্যে কম থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশ্বাসের অনুযায়ী করে কুন্দর চরিত্রে-কাঠামো নির্মাণ করেছেন। বঙ্কিম পরিকল্পিত রূপরেখায় পূর্বগঠিত সিদ্ধান্তে সহজ অনুক্রমণের জন্যই সহনায়িকার পাহাড়-প্রমাণ স্থৈর্য নিয়ে কুন্দনন্দিনী দণ্ডায়মান। কুন্দের সমস্যার স্বরূপ এবং জীবনকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য কী? এ সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে জানিয়েছেন : "সে প্রথম থেকেই বঙ্কিমের অতিপ্রাকৃত বোধের কাছে বলি প্রদত্ত। যে স্বপ্ন সে দেখেচে তার জীবনের ঘটনাবর্ত শুধু সেই স্বপ্নের ইঙ্গিতকে সফল করার ট্র্যাজেডিচক্র। তাকে বলা হল দুটি ব্যক্তি সম্বন্ধেসাবধান হতে। সেই দুই ব্যক্তি তার জীবনে কেমন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেল তার দিক থেকে কাহিনীর তাৎপর্য এইটুকু। যদি ঘটনাচক্রের এত বড় চাপ তাকেসহ্য করতে না হত তবে সে হতে পারত আর একটু বাঙময়। হলে, তার জীবনের শুধু শেষ দৃশ্যের কাব্যময় ব্যঞ্জনার ওপরে নির্ভর করে তাকে অমরত্ব অর্জন করার পথে যেতে হত না। কুন্দের পাপবোধকে কুন্দের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হয়নি। সে শৈশবে মা হারিয়েছে, কৈশোরে স্বামী। দু-দুবার তার সংসারের মূল ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু সে কথা কিচুই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। সে যেন শুধু স্বপ্নবাণীর

বিপরীতে কেমন করে ঘটনাকর্ষণে চলে গেল, সেই ব্যাপারটিকে রূপয়িত করার যান্ত্রিক উদ্যোগ। তার জন্ম যেন শুধু এই উপন্যাসের ঘটনার জন্যই। ফলে সে যে পরিমাণে ফেঁদেছে, সে পরিমাণে কাঁদাতে পারেনি"।

"শুধু সূর্যমুখীই নয়, এ উপাখ্যানের আর এক বিদ্রোহিনী কুন্দনন্দিনীও। সূর্যমুখী নগেন্দ্রের পুনর্বিবাহের প্রতিবাদ জানিয়েছে গৃহত্যাগের মাধ্যমে; অপরদিকে কুন্দনন্দিনীর প্রতিবাদের প্রণালী আরো সাংঘাতিক। কুন্দনন্দিনী আত্মহননের দ্বারা তার প্রতিবাদ নগেন্দ্রকে তথা সমাজের কাছে জানিয়ে গেছে। বিধবা বিবাহে বিধবা কুন্দের আপত্তি নেই, তার সম্মতি ব্যতিরেকে নগেন্দ্র তাকে বিবাহ করতে পারে না। তাছাড়া নগেন্দ্রর প্রতি কুন্দের প্রথমাবধি গভীর কৃতজ্ঞতা ও একপ্রকার বিস্ময়মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল, যা শেষ পর্যন্ত গভীর ভালোবাসায় পরিণতি লাভ করে। নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ ও সূর্যমুখীর পলায়নের পর হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে বন্ধুকে লেখেন— 'আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালোবাসিতে না এমত নহে— এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালোবাসা ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছে ... তুমি নিরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন— তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রা দিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে কালে স্থায়ীপ্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে এবং যদি তোমার জ্যৈষ্ঠা ভার্যার সাক্ষার আর না পাও তবে তাহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসায় কখনো অযত্ন করিবে না; কেননা ভালোবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালোবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়।'

হরদেব ঘোষালের এই পত্রেও দেখি বিধবা বিবাহ অসমর্থিত হয়নি। সূর্যমুখী কোনদিন যদি নাই ফেরে তবে এই বিবাহই কালে স্থায়ীসুখের কারণ হতে পারে বলে হরদেব ঘোষাল মন্তব্য করেছে।

তাহলে কুন্দনন্দিনীর প্রতিবাদ কিসের জন্য, তার আত্মহননের প্রকৃত কারণটি তবে কী?

আমরা উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি, বৈধব্যের পর কুন্দ পুনরায় বিবাহ করেছে বলে কখনো সে আত্মগ্লানি, দ্বন্দ্ব বা সংস্কারের দ্বিধায় ভোগে নি। সুতরাং তার আত্মহননের কারণ বৈধব্যঘটিত কোন মানসিক দ্বন্দ্ব বা অস্থিরতা থেকে নয়। বস্তুতপক্ষে এ উপন্যাসে যে কারণে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ সেই কারণেই কুন্দনন্দিনীর আত্মহনন। নগেন্দ্রর প্রতি সূর্যমুখীর অগাধ প্রণয়, অপরদিকে নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দনন্দিনীর অকৃত্রিম ভালোবাসা। সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রর রয়েছে 'গাঢ় স্নেহ', অপরদিকে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের যে ভালোবাসা 'সে কেবল চোখের ভালোবাসা' মাত্র— প্রকৃত প্রণয় নয়। বিধবা কুন্দকে

বিবাহ করার জন্য কুন্দ অবশ্যই নগেন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ; কিন্তু বিবাহের পরেই যখন সে বুঝল এ বিবাহে উভয়ের মাঝে প্রকৃত ভালোবাসার সেতু নেই, তার প্রতি নগেন্দ্রের আকর্ষণ এবং তজ্জনিত আইনের আনুকূল্যে এই বিধবা বিবাহ আসলে নগেন্দ্রনাথের ক্ষণিক রূপজ মোহের পরিণাম মাত্র, তখনই এই বিধবাবিবাহ কুন্দের কাছে একান্তভাবে অর্থশূন্য অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রেমহীন বিবাহ নারীর পক্ষে অপমানজনক লজ্জাজনক। কুন্দ যখন বোঝে নগেন্দ্র কেবল রূপজ মোহের তাড়নায় আইনের সুযোগ নিয়ে বিধবা বিবাহ করেছে তখন সেই অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে ওঠে। সূর্যমুখীর মতো কুন্দনন্দিনীও নগেন্দ্রের আচরণে আঘাত পায়। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে, কুন্দনন্দিনী নিজের জীবন বিসর্জন করে। কুন্দ যেন তার স্বেচ্ছামৃত্যু-র মধ্য দিয়ে একথাই সমাজেব কাছে বলে গেল— সমাজে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে তা বিধবা নারীদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সমাজের যে অবস্থা তাতে এ আইন আপাতত নগেন্দ্রনাথদের মোহ চরিতার্থতার উপায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; বিধবা নারীর সম্মান ও সুখের কারণ নয়। স্বামী তারাচরণের মৃত্যুতে কুন্দ বিধবা হয়েছিল; কিন্তু নগেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ তাকে দ্রুত মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে গেল। অন্তিম মুহূর্তে 'মুক্তকণ্ঠে' স্বামীর প্রতি তার জিজ্ঞাসা, 'তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে?' বঙ্কিম বলছেন, 'নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজই তিনি বালিকা অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।' অন্তিম মুহূর্তে বিধবা বালিকা কুন্দ স্বামীর কাছে মুক্ত কণ্ঠে যে জিজ্ঞাসা রেখে গেল তার উত্তর নগেন্দ্রনাথ দিতে পারেনি। কে দেবে? বোধ করি এ উপন্যাসে বঙ্কিমেরও সেই জিজ্ঞাসা।" *[বঙ্কিম-উপন্যাসে নারী : পুনর্বিচার। / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। দেশ ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯]*

উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্তিতে প্রশ্ন ওঠে, কুন্দের ট্র্যাজেডির জন্য শুধু কী তার ভাগ্যই দায়ী না অন্যকিছু। এর উত্তরে বলতে হয়, কুন্দের ট্র্যাজেডির জন্য তার ভাগ্যের সঙ্গে আছে তার নিজের চরিত্র এবং জটিল পরিস্থিতি। কুন্দর পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নে মায়ের কাছে কুন্দ শুনেছিল যে তার জীবনে অনেক দুঃখ আছে এবং একজন নারী ও একজন পুরুষের সংস্রব তার জীবনে অমঙ্গলের কারণ হবে। স্বপ্নে একথা শুনে কুন্দের সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কুন্দের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কুন্দ সাবধান তো হয়নি; উপরন্তু স্বপ্নের নির্দেশের বিরোধিতা করতে শুরু করে। সুতরাং তার ট্র্যাজেডি অনিবার্য। সাবধানতা অবলম্বন করলে হয়তো তার ট্র্যাজেডি ঘটত না। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র, প্রণয় কোন বাধা মানে না এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চরিতার্থতা অর্জনই প্রণয়ের লক্ষ্য। রোমান্টিক জীবনাদর্শের এটাই পরিণতি। কুন্দনন্দিনীর জীবন এই রোমান্টিক আদর্শে পূর্ণ— প্রণয়ের চরিতার্থতা অর্জন তার জীবনের লক্ষ্য হওয়ায় পরিস্থিতির জটিলতায় তাকে শেষ পর্যন্ত জীবনপথ পরিক্রমায় ব্যর্থ হতে হল।

• **হীরা :**

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কয়টি বিতর্কিত নারী চরিত্র আছে তার মধ্যে হীরা অন্যতম। "হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে যে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল। হীরা বাল বিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিত। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোনো প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরা চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সাধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত এবং বেশাবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।" কেউ কেউ হীরাকে বিষবৃক্ষের নারী চরিত্রের মধ্যে 'অনন্যা' বলেছেন,— "হীরা চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে তাহাই। হীরা সূর্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন মনে করে না। সুতরাং ভগবানের যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও সূর্যমুখী প্রভুপত্নী, তাহার বিরুদ্ধে তাহার একটা চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে।" *[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]* কেউ বলেছেন হীরা সর্বাপেক্ষা 'ঘৃণ্যচরিত্র।' আবার অপর এক সমালোচকের মতে,— "হীরা এই উপন্যাসের সকলের চেয়েই জটিল চরিত্র। ঈর্ষায় প্রতিহিংসায় আত্মগর্বে-বুদ্ধি চাতুর্যে তীব্র প্যাসনেট, প্রেমে-প্রণয়ব্যর্থতায় ও প্রতিশোধে সে অতি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। *** হীরা ভিলেন, কোন স্থূল লোভ বা সহজ লাভের জন্য নয়। এটা হল তার ভাগ্যের মার জীবনকে ফিরিয়ে দেওয়া— ভাগ্যবানকে ঘা দিয়ে এখানে তার প্রতিশোধ নেবার পালা চলেছে। হীরার পাপের চূড়ান্ত নিদর্শন কুন্দকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে তার হাতে বিষ তুলে দেওয়ায়, কিন্তু সেখানেই তার নারী পরিচয়ের অন্য এক শীর্ষ বিন্দু"। [বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড / ক্ষেত্র গুপ্ত।] অবশ্য হীরা চরিত্রের সজীবতা সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। হীরা এক অর্থে অত্যন্ত বাস্তব চরিত্র এবং তার চিন্তা ধারার মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের একশ্রেণীর নারী মনস্তত্ত্বের পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুযোগ অনুযায়ী সেই মনস্তত্ত্বের বাস্তব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। হীরা চতুরা, পরশ্রীকাতরা এবং তার পরশ্রীকাতরতার পটভূমিকায় আছে তার শ্রেষ্ঠমন্যতা, যা হীনমন্যতার বিপরীত। হীরা কুন্দের বিপরীত চরিত্র, কেননা কুন্দের সরলা, নিঃস্বার্থ-পরায়ণতার ভাব হীরা চরিত্রে অনুপস্থিত, হীরার ললাটে দুর্ভাগ্যের ললাটিকার ন্যায় কুন্দের কপালেও দুর্ভাগ্যের ললটিকা; কিন্তু কুন্দ কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না, হীরা বিধাতার অত্যাচারের অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট। "হীরা উপন্যাসের villain; গ্রন্থের প্রধান পাত্রপাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্য অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেইখানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। সে-ই সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে শেষ বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে; সেই মর্মপীড়িতা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্ত্রণা ও অস্ত্র পৌছাইয়া দিয়া ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করিয়াছে। *** কিন্তু হীরা কেবল পরের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসে নাই, তাহা হইলে সে উপন্যাসের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয় বাহিরের

জীবমাত্র হইত। তাহার নিজের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা হইতেই একটা প্রজ্বলিত শলাকা লইয়া সে অন্যের ঘরে আগুন দিয়াছে নিজের অন্তরস্থ বহ্নিপ্রাচুর্য হইতেই তাহার চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। *** তিনি হীরাকে একটা Secondary বা গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে ফেলেন নাই; তাহার উপর ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগ ও করাল দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন। হীরা-দেবেন্দ্রের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, ইন্দ্রিয় প্রধান প্রণয় কাহিনীটিও বঙ্কিম তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও মিতভাষিতার সহিত, কয়েকটি অর্থপূর্ণ আভাস ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।" *[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]*

হীরা 'পদ্মপলাশলোচনা; শ্যামাঙ্গী,' কুন্দনন্দিনীর জীবনে অভিশাপের মত আবির্ভূতা, তার প্রথম আবির্ভাবে কুন্দনন্দিনীর মত পাঠকও চমকিত হয়ে ওঠে। এক সামান্য দাসী কিভাবে কুন্দনন্দিনীর জীবনে বিপর্যয় আনতে পারে হীরা তার উদাহরণ। হীরা বাল্যবিধবা, কুন্দনন্দিনীর বিবাহ ও বৈধব্যের পর তার অবসর, বঙ্কিমচন্দ্র এক বিধবার শত্রুরূপে আর এক বিধবাকে সুকৌশলে উপস্থাপিত করে পাঠকের কৌতূহলকে নাড়া দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নারী চরিত্রের একটি জটিল তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। হীরা কুন্দের পলায়নের পর যখন তাকে হাতের মুঠোয় পায় তখন হীরা বিধাতাকে প্রশ্ন করে— 'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাকে ফাঁকি দিয়েছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।' সে সূর্যমুখীর সঙ্গে নিজের তুলনা করে সূর্যমুখীর উপর তার ক্রোধের কারণ বিশ্লেষণ করেছে— 'সূর্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, সেইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট, সে মুনীব, আমি বাঁদী, সুতরাং তার উপরে আমার রাগ।' হীরা জানে লোকে তাকে হিংসুক বললেও তার এই প্রবৃত্তি তার অপরাধ নয়। সূর্যমুখীর বড় হওয়া যদি অপরাধ না হয় তাহলে হীরা হিংসাপ্রবণতা অপরাধরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়। এমনকি হীরা একথাও ভেবেছে যে হীরা যদি সূর্যমুখীর আসনে বসত তাহলে সে সম্ভবত খল কপট থাকতো না। অবশ্য হীরা অধঃপতিত হলেও নিজের এই যুক্তিতে নিজেকে সমর্থন করতে পারলো না। দুষ্কৃতকারীর চিরন্তন যুক্তি হীরার অন্তরের গভীরে সমর্থিত হয়নি। সে নিজেকে সমর্থন করেছে, আবার নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বও এসেছে। কখনো সে ভেবেছে যদি অপরের মন্দ করলে তার ভালো হয় তবে তাই করা উচিত। হীরা চরিত্রে দ্বন্দ্ব আসলে চিরন্তন নীতিবোধের সঙ্গে ক্ষণকালীন খল নায়িকার দ্বন্দ্ব। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঈর্ষাবহ্নির উদাহরণ হীরা।'

হীরার কার্যপদ্ধতি ও চাতুর্য তার হিসাবী মনের পরিচয় দিলেও মাঝে মাঝে সে জীবনসম্ভোগে বেহিসাবী। আবার কেউ কেউ মনে করেন,— "ভালোবাসার জন্য হীরার চিত্ত সর্বদা পিপাসিত, কিন্তু সেজন্য সে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় আদৌ। এ বিষয়ে হীরা চিত্তসংযমে সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে।" *[বঙ্কিম সাহিত্য / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।]* নগেন্দ্রের দুর্বলতা তার দৃষ্টি এড়ায়নি, কুন্দকে হাতে পেয়ে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছে, হীরার হাতের পাকা ঘুঁটি কুন্দ, কুন্দের সাহায্যে বাজি জিতে সে সূর্যমুখীর 'থোঁতামুখ ভোঁতা' করবে। এই কারণে সে নগেন্দ্রের কাছে কুন্দের

প্রতি সূর্যমুখীর দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করেছে কিন্তু সেখানে তার সফলতাও আংশিক। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল তাকে পাপের পথে না রেখে হৃদয়হীনা দুর্বৃত্তার অন্তরে শাশ্বত নারী প্রকৃতির উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। প্রচুর অর্থের প্রলোভন সত্ত্বেও সে কুন্দকে দেবেন্দ্রের কাছে সমর্পন করেনি এবং নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীর শোকে গৃহত্যাগী তখনও হীরা তাকে আগলে রেখেছে। তবুও হীরার ভালোবাসা কুন্দের ভালোবাসার ন্যায় আত্মবিলোপকারী ভালোবাসা নয়। কুন্দ আপন সুখ অন্বেষণে তৎপর নয়, তার ভালোবাসা প্রতিদান চায়নি; হীরা আত্মকেন্দ্রিক, তার ভালোবাসা কামনাবাসনাপূর্ণ স্বার্থপরায়ণ। প্রতিদান না পেয়ে হীরা হিংসুক। সূর্যমুখী প্রথমে তার চক্ষুশূল, পরবর্তীকালে কুন্দ তার চক্ষুশূল। দেবেন্দ্র কুন্দকে ভালোবাসে, তাকে পেতে চায়,— ফলে দেবেন্দ্র তার প্রণয়াস্পদ হলেও সর্বগ্রাসী হিংসার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাননি। চতুরা হীরার কৌশলে দেবেন্দ্র লাঞ্ছিত ও অবনমিত। 'হীরা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল, সে কামরিপুর আক্রমণ দমন করতে পারে কিন্তু ঈর্ষাবহ্নিকে সে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারে না।'

হীরা কর্মতৎপর, তাকে বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার সংঘাত সহ্য করতে হয়নি, হীরার বিপরীতে কুন্দ স্পর্শকাতর স্বল্পপ্রাণ সরল প্রণয়বিহ্বল— নানা চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার আঘাতও তাকে সহ্য করতে হয়েছে আর সেই আঘাতের অসহনীয় বেদনায় তাকে মৃত্যুরবণ পর্যন্ত করতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরার অসংযত প্রবৃত্তির উন্মার্গগামীতা ও নীচতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিতে চাননি। তারজন্য বুদ্ধিভ্রংশ ও সমগ্র জীবনব্যাপী উন্মত্ত বেদনা বিহ্বলতার ব্যবস্থা করেছেন। কুন্দ এবং হীরার তুলনায় কুন্দকে পাপী হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু হীরা পাপী, সে কর্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি রুষ্ট, কুন্দনন্দিনীর প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং দেবেন্দ্রের প্রতি ক্রোধ ও প্রেমের দ্বারা আবিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' পূর্ববর্তী উপন্যাসে ঠিক এজাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কি না তা সংশয়ের। হীরা নায়িকা সূর্যমুখীকে ব্যথিত করে, কুন্দের প্রতি ঈর্ষায় উত্তেজিত; আবার দেবেন্দ্রের প্রতি তার প্রেম আক্রোশ। দেবেন্দ্রের প্রতি তার প্রেম যেমন তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহাও তেমন প্রবল। তাহলে হীরা কি খল চরিত্র; না করে মধ্যে 'অকারণ খলতার কারণ সন্ধানী প্রবৃত্তি' ক্রিয়াশীল থাকে? অবশ্য পরে বঙ্কিমচন্দ্র কুহেলিকার সমস্ত কারণ উন্মোচন করে তার নীচতার কারণ পাঠকের সামনে প্রকাশ করতে চান। এই খলচরিত্র প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র রচনা করে। হীরা প্রণয়ের লাঞ্ছনায় প্রতিবিধিৎসা চঞ্চল নীচ নারী চরিত্র; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কৌশলে তার পরিণতি করুণা ও ভীতির উদ্রেক করে। তার চরিত্র শ্রদ্ধাজাগায় না বলে তার পতন কোন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করতে পারে না। "দেবেন্দ্রের নির্বিবেক নিষ্ঠুরতায় তাকে যে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাকে স্বীকার করতে হয়েছিল, তা যথেষ্ট দুঃখজনক ও করুণাউদ্রেককারী, এবং তার শেষ উন্মাদগ্রস্ততা, তার ক্রোধ ও অভিশাপ ভীতিভাবেরও সূচক। সুতরাং ট্র্যাজেডির উপাদান তার মধ্যে ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে; কোথাও তার প্রতি আমাদের

শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয় না। আর এই জন্যই চরিত্রটি যথার্থ ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারে নি।" *[বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি চেতনা / জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়।]* কিন্তু সমালোচকের উক্ত মন্তব্যে ভিন্নমত পোষণ করাও অযৌক্তিক নয়। সাহিত্যের ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরীর মতে, "বিষবৃক্ষের ট্র্যাজেডির প্রাণকেন্দ্র হীরাদাসী। প্রেমের কুণ্ঠিত পরোক্ষতা, বাসনার আদ্যন্ত লজ্জারত দুর্বলতা, আত্মদাহ ও আত্মদানের নীরব গোপনীয়তায় কুন্দ করুণাবহ। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের সচেতন চেষ্টায়, আত্মবিসর্জনের অসহ্য ধিক্কারবোধে দৃপ্ত-ব্যক্তিত্বময়ী উন্মাদিনী হীরা যথার্থ ট্র্যাজিক।" [বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পঠায় / ভূদেব চৌধুরী।] হীরা হাতে করে কুন্দনন্দিনীর হত্যা না ঘটালেও সমস্ত অন্তরের কামনা দিয়ে তা ঘটিয়েছে; সূর্যমুখীর পুনর্মিলিত জীবনের একমাত্র আশঙ্কাস্থল কুন্দের বিদূরণ ঘটেছে তার নীচতার দ্বারা। তার অশুভ কার্য শুভ কার্যের দূর-প্রসারী সূচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই খল চরিত্রটিকে যেভাবে মূল ও উপকাহিনীতে উপযোগী করে তুলেছেন তা পূর্ববর্তী কোন মন্দ চরিত্রে প্রকাশিত হয়নি। হীরা চরিত্রের অন্তিম পরিণাম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে স্মরণীয়ভাবে মন্তব্য করেছেন— "বঙ্কিম অসাধারণ দক্ষতার সহিত হীরার এই কলুষিত প্রণয়ের শেষ পরিণামটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অপমানিত হীরা পদাহতা সর্পিনীর ন্যায় ফণা ধরিয়া উঠিল; তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সংকল্পের পরিণত হইল। একদিকে প্রবল নৈরাশ্যের আঘাত তাহাকে উন্মদগ্রস্ত করিয়া তুলিল; অপর দিকে প্রকৃত শয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে কুন্দের চরম দুঃখের মুহূর্তে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে, তাহার হাতের নিকট আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে প্রণোদিত করিল। হীরার হৃদয় মন্থনজাত, ঈর্ষা-ফেনিল বিদ্বেষ-হলাহলই সে কুন্দের মুখের নিকট আনিয়া ধরিল, এবং কুন্দ সেই বিষ পান করিয়াই মরিল। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছদে আমরা দেখিতে পাই যে, হীরার উন্মাদরোগ আরও ভয়ংকর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বসুখস্মৃতি, অপমানের বৃশ্চিকদংশন, দেবেন্দ্র ও কুন্দর বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ ক্রোধানল— সমস্ত তাহার বিকারগ্রস্ত মনে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়াছে; এবং সেই তুমুল কোলাহলকে ছাপাইয়া তাহার অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা পূর্বসুখস্মৃতি বাঁশরীর রন্ধ্রপথে ফুৎকার দিয়া এক বিষাদ করুণ সুর তুলিয়াছে :—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

এই সুরেই হীরার শেষ এবং সত্য পরিচয়— এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকারই তাহার ঈর্ষাদগ্ধ অভিমানবিকৃত, বিদ্বেষক্রূর হৃদয়ের অন্তরতম বাণী।"

• **দেবেন্দ্র :**

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র দেবেন্দ্র কিন্তু গৌণচরিত্র। তিনি পার্শ্ববর্তী

গ্রামের জমিদার নগেন্দ্রের জ্ঞাতি। নগেন্দ্র যদি শিক্ষিত রুচিবান জমিদার রূপে উপন্যাসে উপস্থাপিত হন, তাহলে জমিদার সম্প্রদায়ের চিরাচরিত রূপলুব্ধ, মদ্যপ, লম্পট, বিবেকবর্জিত অমানুষদের প্রতিনিধি হলেন দেবেন্দ্র। আলোচ্য উপন্যাসে নগেন্দ্রও দেবেন্দ্র চরিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আলোক প্রাপ্ত ভূস্বামীসম্প্রদায় ও দুর্নীতগ্রস্ত জমিদারদের দ্বৈতরূপ প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্রের বর্তমানে জমিদারী নেই; পুরুষানুক্রমে দেবেন্দ্র বর্তমানে শ্রীহীন, সৌভাগ্যবঞ্চিত। দেবেন্দ্রের পিতা হৃত ধনগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য জমিদার গণেশ বাবুর কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। হৈমবতী কুরূপ, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও আত্মপরায়ণা ছিল বলে দেবেন্দ্র বিপথগামী হন। তার সঙ্গে দেবেন্দ্রের বিবাহ পর্যন্ত দেবেন্দ্র নিষ্কলঙ্ক, লেখাপড়ায় তার যত্ন ছিল এবং সে সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল, দেবেন্দ্র উপযুক্ত বরঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর হৃদয়ে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, রূপতৃষ্ণা জন্মে; কিন্তু হৈমবতী তার যোগ্য ছিল না এবং তার 'রসণাবর্ষিত বিষের জ্বালাও অসহ্য ছিল। ফলে দেবেন্দ্র গৃহত্যাগ করিলেন।'

পিতার মৃত্যুর পর কলকাতার বসবাসরত দেবেন্দ্র 'অতৃপ্ত বিলাস তৃষ্ণা নিবারণে' প্রবৃত্ত হলেন এবং 'সুরাভিসিঞ্চনে' তৃপ্ত হতে চাইলেন। কলকাতায় অবস্থান কালে দেবেন্দ্র বাবুগিরিতে অভ্যস্ত হয়ে স্বগ্রাম দেবীপুরে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে 'রিফর্‌মর্' বলে আত্মপরিচয় দেন। দেবেন্দ্র মদ্য ও তামাক উভয় পানেই অভ্যস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্র পরিহাসপ্রিয় ও সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য বোদ্ধা ছিলেন। সুরেন্দ্রের 'তোমার শরীর বিরূপ আছে' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং'। তিনি বিশেষ সময়ে হীরাকে প্রণাম করে গ্লাস হস্তে স্তব করে বলেছেন—

'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেন সংস্থিত।।'

দেবেন্দ্র জীবনের প্রতি আসক্তিহীন; তিনি বলেছেন: "যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ' ? হৈমবতীর রূপ, সংলাপ, স্বভাব আর সুরা ও লাম্পট্য ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রকে নায়কের পক্ষে নিমজ্জিত করেছে। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু দেবেনন্দ্রকে পাষন্ড চরিত্র রূপে অঙ্কন করেননি। কূটভাষিণী হৈমবতীই যে দেবেন্দ্রের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে এ কথা পাঠকদের জানিয়েছেন; ফলে তাঁর পতনে পাঠক সমবেদনা বোধ করে। দেবেন্দ্র যে সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ একথাও বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন উপন্যাসের চব্বিশ ও ছত্রিশ পরিচ্ছেদে :

১. "দেবেন্দ্র দেখিলেন এককোণে একখানা ভাঙা বেহালা পড়িয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। *** দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া এক প্রকার চলনাসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুরভাযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গাহিলেন।"

২. "তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীত লহরী সৃষ্টি করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল।" উপন্যাসে পরিবেশিত দশটি

গানের মধ্যে আটটি গান দেবেন্দ্রের গাওয়া; আশা প্রায় অধিকাংশ গানেই দেবেন্দ্রের 'লালসাবিকৃত লঘুচিত্ততা' এবং কুন্দের প্রতি প্রণয়বাসনার অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে।

দেবেন্দ্রের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কুন্দনন্দিনীর রূপজ মোহে এমনই আকৃষ্ট যে নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করেছেন : "আমি সকল ত্যাগ করিতে পরি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই।" কুন্দের লোভে হীরাকে প্রবঞ্চনা করা দেবেন্দ্রের জীবনের সর্বাপেক্ষা অপকীর্তি। দেবেন্দ্র হীরার প্রণয়ের প্রতিদান দিয়েছেন হীরার সর্বনাশ করে। তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ উচ্ছৃঙ্খলতা। দেবেন্দ্র হীরার ন্যায় বিদ্বেষপরায়ণ না হলেও খাঁটি প্রেম কাকে বলে তা তাঁর জানা ছিল না। দেবেন্দ্র তাঁর লাম্পট্যের ফল ভোগ করেছেন প্রতি মুহূর্তে; মৃত্যু তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে উপস্থিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের "অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র দেবেন্দ্রের ভিতরে আমরা সেই চরিত্রের নিহিত সমস্যার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। তার ভালো মন্দ সব কিছুকেই বঙ্কিম একটা অন্তরোদ্ভূত কারণে গ্রথিত করেছেন। বাইরের ঘটনার ওপর চরিত্রের দায় অর্পন করে বসে থাকেননি। দেবেন্দ্র তার সমস্ত অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। তার উগ্র নব্যতন্ত্রী মনোভাবের মূল যেমন তার শিক্ষার অসঙ্গতিকে তেমনি তার চরিত্রের অসঙ্গতিতেও ঘটে। এবং এই চরিত্রে অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেবেন্দ্রকে বিচার করা যায়, তখনই তাকে সমগ্রভাবে আমরা উপলব্ধি করি। *** দেবেন্দ্রের জীবনব্যাপী বিড়ম্বনার মূল তার বিপর্যস্ত দাম্পত্য জীবনে। নিঃসংকোচ পাপচরণ সুরাসক্তি দেবেন্দ্রকে শেষ দৃশ্যের যে করুণ পর্যয়ে উপনীত করল তার অনেক পূর্বে যে কোথাও একটা রক্তে-মাংসে আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ মানুষ ছিল বঙ্কিম অল্প আঁচড়ে সে ব্যাপার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।" *(বাংলা উপন্যাসের কালান্তর / সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)।*

দেবেন্দ্রের ধর্মজ্ঞান নেই, পরের ভালমন্দ বোধ নেই; তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। হীরার ভাষায়, দেবেন্দ্র 'মহাপাপিষ্ঠ'। সুবোধ সেন গুপ্তের মতে: "দেবেন্দ্রের জীবনে একটা ভাবময় করুণ দিক আছে; দেবেন্দ্র একজন সজীব মানুষ, শুধু লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি নহে"। দেবেন্দ্র চরিত্রে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা ছিল। জীবনের দুঃখ ও ক্ষোভ দুইই তাঁর জীবনে প্রবল। তিনি নিষ্কলঙ্ক, পত্নীর বিমুখতাই কলঙ্কের পথে অবনমনের প্রধান কারণ। তাঁর চরিত্র গভীরতাহীন; তিনি রূপমুগ্ধ, অন্যাসক্ত; গভীরতার অভাবের জন্য তাঁর চরিত্র ট্র্যাজেডির উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

• তারাচরণ :

উপন্যাসে একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে তারাচরণ চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা সূর্যমুখীর দেখাশোনা করত; তারাচবণ সেই শ্রীমতীর সন্তান। শ্রীমতী রূপবতী ছিল এবং গ্রামের এক দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির সঙ্গে

গৃহত্যাগ করার ফলে তারাচরণ সূর্যমুখীর সঙ্গে মানুষ হতে থাকে। সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। বাল্যকালে সূর্যমুখী ও তারাচরণ অনাথ হলেও সূর্যমুখী দয়ালুচিত্ত পিতার বদান্যতায় সূর্যমুখীর মতোই লালিত-পালিত হয়েছিল। তিনি তারাচরণকে হীন বৃত্তিতে প্রবর্তিত না করে লেখাপড়ায় নিযুক্ত করেছিলেন। তারাচরণ মোটামুটি ইংরেজি জানলেও কাজকর্মের কোনো সুবিধা করে উঠতে পারেনি। অবশেষে সূর্যমুখী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তারাচরণ 'মাস্টার' নিযুক্ত হয়। তারাচরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে' হয়ে উঠল। তারাচরণ নানা গ্রন্থ পাঠ করায় তার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। তারাচরণ দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়ে তাঁর পারিষদ রূপে পরিগণিত হয়। তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পৌত্তলিকতা বিদ্বেষ ইত্যাদি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিল। সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিল। সূর্যমুখীর উদ্যোগে তারাচরণের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হয়। তারাচরণের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বলেছেন : "সৌন্দর্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ তার খাঁদা নাক— বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলে মহলে প্রকাশ।" তারাচরণের বিবাহ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের উক্তি তার চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে: "প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীব সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল"। তারাচরণ স্ত্রীলোক সম্পর্কে উদারমতাবলম্বী হলেও কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্র ও তার সমাজভুক্ত সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে না দেওয়ায় দেবেন্দ্র তাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে। তখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে তারাচরণ আলাপ করিয়ে দেয় এবং দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর 'নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব শোভা দেখিয়া' মুগ্ধ হন। ফলে তারাচরণ সভয়ে পশ্চাদপরণ করে। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহের মাত্র তিন বছর পরে তারাচরণের জ্বর বিকারে মৃত্যু হল। স্বল্পায়ু তারাচরণ ভীরু ও ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ চরিত্র এবং সেই কারণেই কুন্দর স্মৃতিতে কোথাও তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন বা প্রভাব নেই।

• সুরেন্দ্রনাথ :

দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র সুহৃদ এবং সে আবার তাঁর মাতুল পুত্র। স্ত্রী হৈমবতীর দুর্ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ যখন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অধঃপতনের চরমলীলায় অবতরণ করতে লাগলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে সঠিক পথে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রের সমবেদনা ও সদুপদেশ দুশ্চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের চিত্তবিকারে অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত জাগ্রত করত। সুরেন্দ্র তাঁকে মদ্যপান ত্যাগ করতে বললে দেবেন্দ্র অশ্রুসজল চোখে বেদনাহত কণ্ঠে তাঁকে বলেছিলেন : "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করো, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ করে নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব।" সুরেন্দ্র ধনবান হওয়া সত্ত্বেও সহৃদয় গুণবান, মদ্যাদির প্রতি আসক্তিহীন এবং অপরিণাম ঘৃণা পোষণকারী। দেবেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর ভালবাসার ফলে সে মদ্যপান ত্যাগ করতে পারেন নি। দেবেন্দ্র মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু সে সুরেন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রের কুন্দর প্রতি সমাজবিরুদ্ধ পাপাকর্ষণের জন্য সুরেন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

• শ্রীশচন্দ্র :

উপন্যাসে শ্রীশচন্দ্র এমন কিছু উল্লেখ্য চরিত্র নন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা কমলমণির স্বামী। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র পরিচয়ে জানিয়েছেন, "শ্রীশবাবু প্লাণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি— শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি।" শ্রীশচন্দ্র পত্নীপ্রাণ, ভদ্রব্যক্তি, বন্ধুগণের মতে কিঞ্চিৎ 'স্ত্রৈণ'। স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি থাকার জন্যই তিনি নগেন্দ্রের দুঃখে দুঃখী; তাঁর একান্ত শুভকামী। আত্মীয় হলেও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো; কেননা বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহের সপক্ষে নগেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি শ্রীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত। সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদে নগেন্দ্রের জীবনে যখন শূন্যতার আবির্ভাব তখন শ্রীশচন্দ্র তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সান্ত্বনা প্রদানে উদ্যত। তখন সদাহাস্যমুখর শ্রীশচন্দ্রের অন্য মূর্তি। তিনি বুদ্ধিবিবেচনার ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল হলেও কর্তব্যপরায়ণ, সমব্যথী, নগেন্দের যন্ত্রণার উপশমকারী। শ্রীশচন্দ্রের পারিবারিক জীবন নগেন্দ্রনাথের অভিশপ্ত পারিবারিক জীবনের বৈপরীত্য-বোধকচিত্র।

• কমলমণি :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথের ভগিনী কমলমণি। স্বামী শ্রীশচন্দ্র ও শিশুপুত্র সতীশকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। কমলমণি ভাগ্যবতী এবং প্রাণরসে সজীব ও উজ্জ্বল। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং সঙ্কটকালে তাঁর গাম্ভীর্য ও গভীরতার ইঙ্গিত উপন্যাসে লক্ষ্যগোচর। উপন্যাসের ঘটনার পরিণতিতে তিনি সবিশেষ আলোড়িতা; কেননা একদিকে সূর্যমখীর প্রতি অসীম মমতা। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সংকটকলে তিনি কুন্দকে কলকাতায় এনে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। "সূর্যমুখী যখন নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন তখন তাঁহার মনের কথা জানিবার জন্য একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন। কমলের অবতারণার ইহাই প্রধান উপযোগিতা, কিন্তু ইহা ছাড়া আর প্রয়োজনও সিদ্ধ হইয়াছে। সোনার কমলের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দাম্পত্যজীবন সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দর ট্র্যাজেডিকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়াছে— যেন বিষবৃক্ষের অনতিদূরে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ একটি বৃক্ষ তাহার মাধুর্য্য বিস্তার করিয়েছে।" [বঙ্কিমচন্দ্র / সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।] নগেন্দ্রনাথের অগ্নিবলয়িত সংসারের প্রেক্ষাপটে কমল-শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্য সুখের শান্তিকুঞ্জ একটি হৃদয়গ্রাহী প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। কমলমণি রূপে-গুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় নগেন্দ্রের সুযোগ্যা ভগিনী। তবে তাঁর চরিত্রে কামনা-বাসনা সংযমের শাসনে শাসিত বলে ব্যক্তিত্বটি শোভন সৌন্দর্যমণ্ডিত।

• হরদেব ঘোষাল :

দূরদেশে বনবাসকারী হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ। উপন্যাসে চরিত্রটি প্রত্যক্ষত অনুপস্থিত। কুন্দ সম্পর্কিত মুগ্ধতা ও চিত্তদ্বন্দ্ব নগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় সুহৃদ হরদেব

ঘোষালের কাছেই প্রকাশ করেছিলেন। মনে হয় নগেন্দ্রনাথের আত্মকথনের প্রয়োজনেই হরদেব ঘোষালের চরিত্রের অবতারণা। "হরদেব ঘোষাল হ্যামলেট নাটকের হরেশিয়ার মত। তাঁহার নিকটা হইতে নিঃসম্পর্কিত একটি লোকের বিচার পাওয়া যায়। তিনি সবই দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন; যে মাত্রাবোধ অন্য সবাই হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা তাঁহার আছে"। [বঙ্কিমচন্দ্র / সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।] নগেন্দ্রর পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে হরদেব ঘোষালের নিস্পৃহ মুক্তদৃষ্টি, নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ সমস্তই প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' যা বলতে চেয়েছেন, হরদেব ঘোষালের পত্রে যেন তাই অভিব্যক্ত : "মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।" *** রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালাবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্ত চাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। *** ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ। *** ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণ গ্রহণ. গুণগ্রহণের পর আসঙ্গ লিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংস্পর্শের ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। *** রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃতি নাই। *** ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেননা, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়— মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর অমুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিত না।"

• **শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী :**

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চৌত্রিশ ও পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর বর্ণনায় জানিয়েছেন : "পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্রপরা-গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে চন্দনরেখা— জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা। অপরহাতে তৈজশ— ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চালিয়াছেন।" শিবপ্রসাদ সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। তিনি পথি মধ্যে রোগপীড়িতা মুমূর্ষু সূর্যমুখীকে উদ্ধার করে আশ্রয় প্রদান করেন, নগেন্দ্রকে সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি পরোপকারী, 'পরপ্রেমে বলবান'। 'পরোপকার তাঁহার ধর্ম।' তিনি রামকৃষ্ণ রায় বৈদ্যের সাহায্যে সূর্যমুখীর চিকিৎসা করান। সূর্যমুখীর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি যথাসাধ্য করেছেন। শিবপ্রসাদ "নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা ও সেবাব্রতের প্রতিমূর্তি। চরিত্রটি

স্বল্প আয়তনে রচিত, কিন্তু শুচিতা ও শুভৈষণায় বঙ্কিমচন্দ্র এই যৎসামান্য ব্রহ্মচারীর মধ্যেও সন্ন্যাসব্রতীর অন্তরমহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।" [বঙ্কিমবীক্ষা / জয়তী সাহা।]

• মালতী গোয়ালিনী :

হীরার সঙ্গে মালতী গোয়ালিনীর সখীত্বের 'গঙ্গাজল' সম্পর্ক। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক মালতীর সম্পর্কে জানিয়েছে : "হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ি দেবীপুর— দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ির কাছে— বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, শাড়ি পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী— একটু রৌদ্র পোড়া— মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা, কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে— আশ্রিতাও নহে— অথচ তাঁহার বড় অনুগত— অনেক ফরমায়েস— যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে।" মালতীর চরিত্র বিশেষ উজ্জ্বল নয়, সে অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপারেও দৌত্য করতে প্রস্তুত। হীরার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তার গলায় গলায় ভাব হলেও এই সম্পর্ক অত্যন্ত অগভীর ও স্বার্থকলুষিত। মালতী সুকৌশলে হীরার ঘরে কুন্দের অবস্থান জেনে নেয় এবং দেবেন্দ্রকে জানায়। এই ঘটনাতেই হীরার সঙ্গে তার স্বার্থকলুষিত সম্পর্কের রূপ প্রকাশিত।

• হৈমবতী :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপকাহিনীর নায়ক শঠ চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের ভার্যা হৈমবতী। দেবেন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথের জ্ঞাতি ভ্রাতা। হৈমবতী হরিপুর জেলার জমিদার গণেশবাবুর কন্যা। হৈমবতীর দুর্মুখ স্বভাবের জন্য দেবেন্দ্রনাথের সদ্‌গুণবলী, শুভবৃত্তি ধ্বংস হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় : "হৈমবতীর অনেক গুণ— সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা।" বহুক্ষেত্রেই পুরুষের জীবনের নিয়ন্তী হল নারীর চরিত্র বৈচিত্র্য ও স্বভাবধর্ম। হৈমবতী সেই জাতীয় দুঃসহপ্রকৃতির রমণী যাদের দুর্দান্ত প্রকৃতিতে পুরুষের পক্ষে গৃহ অরণ্যে পরিণত হয়। তার শুভবুদ্ধি লুপ্ত করে তাকে নৈরাশ্য বিকৃতির পথে নিয়ে যায়। হৈমবতী এমনই এক জাতীয় নারী চরিত্র যার জন্য দেবেন্দ্র গৃহত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন।

• হীরার আয়ি :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরার আয়ি হাস্যরসের অন্যতম আধার। এই বৃদ্ধাকে নিয়ে লেখক একটি চমৎকার কৌতুকচিত্র রচনা করেছেন। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর থেকে এনে দত্তগৃহের কাজে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে হীরা সমর্থ হলে সে অবসর গ্রহণ করে এবং নিজস্ব সঞ্চিত অর্থে কুটির নির্মাণ করে গোবিন্দপুরে বসবাস

করতে থাকে। সেখানে দুটি মাত্র ঘর— একটিতে হীরা অপরটিতে আয়ি থাকে। হীরার আয়ির প্রসঙ্গ উপন্যাসে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। একচল্লিশ পরিচ্ছেদে হীরার আয়ির ঘটনা বিস্তারিতভাবে আছে। উক্ত পরিচ্ছেদের সূচনাতেই দেখা যায়, হীরার আয়ি লাঠি ধরে ধীরে ধীরে যাচ্ছে আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের দল ছড়া কাটতে কাটতে তাকে অনুসরণ করছে : 'হীরার আয়ি বুড়ি/গোবরের ঝুড়ি/হাঁটে গুড়ি গুড়ি/দাঁতে ভাঙে নুড়ি/কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।'

উল্লিখিত ছড়ায় নিন্দার কিছু না থাকলেও হীরার আয়ি ক্রোধান্বিত হয় এবং সে ছড়াকাটা বালকের দলকে যমের বাড়ি যাওয়ার আদেশ দিতে লাগল। নগেন্দ্রের বাড়ির দ্বারদেশে উপনীত হলে হীরা বালকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

হীরার আয়ির জীবন দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। তার একমাত্রপুত্র ও একটি নাতিনী জীবিত নেই; সে চোখেরও দেখতে পায় না। হীরার হিস্টিরিয়া হয়েছে বলে ডাক্তার তাকে কাষ্টার অয়েল দিয়েছে। হীরার আয়িত ভাষায় তা হয়েছে 'ইষ্টিরস' আর 'কেষ্টরস'। এইভাবে হীরার আয়ি হয়ে উঠেছে হাস্যরসের আধার। 'ইষ্টিরস কেষ্টরসে ভাল হয় কিনা'— এই জাতীয় গবেষণা— সমস্ত মিলিয়ে স্বপ্নবুদ্ধি গ্রাম্যবৃদ্ধার এক চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। বুড়ি হীরার জন্য ওষুধ চায়— কেননা, 'হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল'। বুড়ির মনে হয়, হীরার মধ্যেও সম্ভবত তার মায়ের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। হীরার আয়ি হাস্যবসের পরিবেশ সৃষ্টি করলেও তার উক্তিতে হীরার শোচনীয় পরিণামের কথাও যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

• চাঁপা :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চাঁপা ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুন্দ নন্দিনীর জীবনে একমাত্র বান্ধবী। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর সমবয়স্কা সঙ্গিনী চাঁপাই কুন্দের মানসিক দুর্ভাবনার ভার গ্রহণ করেছে। কুন্দ তাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে এবং নিজের সারল্য ও বিশ্বাসপরায়ণতার ভাবটি জাগিয়ে তুলেছে। নগেন্দ্রকে দেখবার-ইনিই যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাও জানায়।

• রামকৃষ্ণ রায় :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের গ্রামীণ করিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইনি সাধারণ গ্রাম্যচিকিৎসকের মত অর্থগৃধ্নু নন। নিরাশ্রিতা, রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় ব্রহ্মচারী যখন সূর্যমুখীকে হরমণির কুটিরে নিয়ে শুশ্রূষা করেন, তখন এই রামকৃষ্ণ রায়ই তাঁর চিকিৎসা করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁর চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের গ্রামে যে স্বল্প সংখ্যক সুবিজ্ঞ সহৃদয় জনদরদী বৈদ্যের সন্ধান তৎকালে পাওয়া যেত তিনি তাঁদেরই একজন।

• ডাক্তার :

আলোচ্য উপন্যাসে ডাক্তার কোনও চরিত্র হয়ে ওঠেনি। বিষপানের ফলে কুন্দর মৃত্যু সমসান্ন হলে ডাক্তারকে ডাকা হয়। যথারীতি পরীক্ষার পর তার মৃত্যুলক্ষণ দেখে তিনি বিষণ্ন মুখে চলে গেলেন। কোন ওষুধ দিলেন না। এই ডাক্তারের বিদ্যার স্বরূপ বুঝতে পারা যায় যখন তিনি হীরার হিস্টিরিয়ার অসুখ রূপে ক্যাস্টর অয়েল দেন এবং তাকে গরম রাখার উপদেশ দেন। তিনি যে বিশুদ্ধ হাতুড়ে চিকিৎসক তা সহজে বোঝা যায়।

• দেওয়ানজী :

দেওয়ানজী কর্তব্যনিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দত্ত পরিবারের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তি পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানজীর। দেওয়াজী উপন্যাসে বিশ্বাসী ও শুভার্থী কর্মচারীর প্রতীক। কুন্দর রূপমোহে নগেন্দ্র যখন বিবেক বুদ্ধিহীন হতে বসেছেন এবং বিষয়সম্পত্তির প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন তখন বিষয়ের অবস্থান সম্বন্ধে সূর্যমুখীকে অবহিত করেছেন। বিবাহের পর কুন্দ যখন অবহেলিতা তখন দেওয়ানের কাছে লেখা নগেন্দ্রের পত্রই তার একমাত্র সম্বল; কুন্দর অবস্থা বুঝে পত্রগুলির নকল রেখে তিনি কুন্দকে পড়তে দিতেন আর ফেরত নিতেন না। তিনি কুন্দর প্রতি হীরার অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু শেষাবধি অপমানিত হওয়ার ভয়ে চুপ করে গেছেন।

• দুটি শিশু চরিত্র সতীশ :

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে শিশুরা যেন দেবলোক থেকে আগত। বঙ্কিমচন্দ্র শিশুর প্রতি ক্ষণিকের জন্য হলেও স্নিগ্ধতা কৌতুক ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার করে দিয়েছেন প্রায় সর্বসময়ে। তা সে দাম্পত্যজীবনে তমসাচ্ছন্ন মুহূর্ত হোক বা ইতিহাসের বজ্রগর্ভ মুহূর্ত হোক না কেন। জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী হৃদয়বত্তার এক অনুপম উদাহরণ তাঁর সৃষ্ট শিশুচরিত্রগুলি।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিদ্যাভ্যাসরত ও সন্দেশভোজনরত দুটি বালকের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নগেন্দ্র দত্তর অন্তঃপুরে হরিদাসী বৈষ্ণবের আবির্ভাবকালে কুন্দনন্দিনী একটি বালককে তার মাতার অনুরোধে বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু উক্ত বালকের মন পাঠ অপেক্ষা সন্দেহভোজনরত অপর একটি বালকের প্রতি নিবিষ্ট ছিল। হরদাসী বৈষ্ণবীর আগমনে অন্দরমহল আলোড়িত হলে কুন্দ সেদিকে গেল এবং ইত্যবসরে তার ছাত্রটি অপর বালকের সন্দেশ কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলল। অন্তঃপুরের উক্ত আসরে অন্তঃপুর বাসিনীরা হরদাসী বৈষ্ণবীকে পছন্দমত গান গাইতে বললে এক যুবতী তাকে নিধুবাবুর টপ্পা গাওয়ায় জন্য অনুরোধ করে। 'একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে 'তোরা দাসনে দাসনে দাসনে দূতি' পদটি গেয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতার পাশে শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সার্থক

দাম্পত্যজীবনের চিত্রকে পূর্ণতর ও মধুরতর করার অভিপ্রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও শিশুসন্তান সতীশচন্দ্রে অবতারণা করেছেন। "কারণে অকারণে তার কৌতুকোচ্ছল হাসির লহর মাতাপিতার নিকট নিজের প্রাপ্য ইজারা শতচুম্বনের ভাগ আদায়ের নিপুণ কৌশল নতুন শেখা আধ আধ কথা অর্ধপ্রস্ফুটিত অনুভূতির প্রকাশ সর্বোপরি কমলমণির স্বামীবিরহিত দ্বিপ্রহরের অভিমান, আলাপ, প্রলাপের একটি পরম দরদী সঙ্গীর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র একটি উজ্জ্বল শিশুচরিত্র।" [বঙ্কিম-বীক্ষা/জয়ন্ত্রী সাহা।] 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সামগ্রিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা, বেদনা তীব্রতার মধ্যে সতীশচন্দ্রের হাসি-আনন্দ-কৌতুক এক অনাবিল আনন্দ প্রবাহের সৃষ্টি করে। শিশু সতীশচন্দ্র সুখী দাম্পত্য জীবনে শুধু যে স্বর্গসুখের স্বাদ আনয়ন করে তাই নয়, হাস্যময়ী জননীর বেদনার মুহূর্তগুলোকে শিশুসুলভ অনুভূতিতে সমবেদনায়, সহানুভূতিতে পূর্ণ করে তোলে। সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে অবলুণ্ঠিতা কমলমণি ক্রন্দন করতে শুরু করলে দাসী সতীশকে তার কাছে রেখে যায়। সতীশ ছোট ছোট দুই হাতে মায়ের মুখ তুলে আদর করে তার বেদনার কারণ বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু কমলমণিকে শান্ত করতে না পেরে সেও অজানিত কষ্টে মায়ের কোলে শুয়ে কাঁদতে শুরু করে। তার ফলে কমলমণির শোক অংশত সংবরণ করা সম্ভব হয়।

• চণ্ডাল :

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখা যায়,— "গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসার ও ঔষধ কিছুই জানিত না— কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণ সংহার করিত।" চণ্ডাল বিষবড়ি তৈরীর উপরকরণ রূপে উদ্ভিদ্‌জ, খনিজ, সর্পবিষ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রাণসংহারক বিষ যে ব্যবহার করত তা হীরার জানা ছিল এবং সে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে চণ্ডালের কাছ থেকে বিষ সংগ্রহ করে। ধূর্ত চণ্ডাল বুঝতে পেরেছিল যে হীরা কারোর প্রাণ নাশের উদ্দেশে বিষ সংগ্রহ করছে। বিবেকবুদ্ধি ও পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়— এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বে সে শেষ পর্যন্ত লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কথাটি গোপন রাখার সর্তে সে হীরাকে বিষ বিক্রয় করে।

• পাহারাদার :

নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারী ইত্যাদি নানা ভোজপুরী পাহারাদার হিসেবে থাকত। তারা পাকা বাঁশের লাঠি হাতে যেন এক একজন মস্তবীর। তারা একবার হীরার নির্দেশমতো দেবেন্দ্রনাথকে চোর ভেবে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। অবশেষে তারা দেবেন্দ্রনাথকে চিনতে পারে এবং ছেড়ে দেয়। বুদ্ধি মোটা হলেও তারা প্রভুদের প্রতি সম্মানবোধে সচেতন। গ্রামের ছেলের দল তাদের কটাক্ষ করে নানা ছড়া কাটত— ১. "রামচরম দোবে/সন্ধ্যাফেলা শোবে/চোর এলে কোথায় পালাবে? ২. রামদীন পাঁড়ে/বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে/ চোর দেখলে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে। ৩. লালাচাঁদ

সিং/নাচে তিড়িং বিড়িং/ ডাল রুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

উল্লিখিত চরিত্র ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নানা প্রতিবেশী, প্রতিবেশিনী ও আশ্রিতজনদের চরিত্র আছে। এই সমস্ত চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবধর্মী। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর অনেকেই তার দাহকার্যাদি করতে অগ্রসর হয়েছিল; অবশ্য তার পেছনে নগেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্য ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থ সন্ধানী। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে— "মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসি, পিসিত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকলমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কলকল করিত।" এরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষে পরিবারিক জীবননাট্যে অংশ গ্রহণ করতো। পরচর্চা পরনিন্দা কলহ ইত্যাদিতেও তাদের ভূমিকা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় চরিত্র অঙ্কনের দ্বারা জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের একটি নিখুঁত চিত্র উপস্থাপনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

২০। সূর্যমুখী • কুন্দনন্দিনী তুলনা

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের দুই নারীচরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেম এবং দাম্পত্য বহির্ভূত প্রেমের দ্বন্দ্ব নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সুখের সংসারে বিধরা কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাবে তাদের জীবনে এক তীব্র সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। রূপজ মোহের বশে যেদিন নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন। সেদিন থেকেই দাম্পত্য প্রেমে ব্যাভিচার প্রবেশ করেছে। সংসারভূমিতে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়েছে। পতিব্রতা সূর্যমুখীর দীর্ঘনিশ্বাস নগেন্দ্র-কুন্দের প্রণয়জীবনের ওপর অভিশাপের অগ্নিবর্ষণ করেছিল। ফলে কুন্দনন্দিনী জীবনে বাঁচতে পারেনি। বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণেই সে জীবনত্যাগ করেছে। আলোচ্য উপন্যাস কুন্দ-নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর জটিলতাময় রূপান্তরমাত্র। এখানে বিষবৃক্ষের বিষময় ক্রিয়ার চরমপরিণতি কুন্দনন্দিনীর আত্মত্যাগের দ্বারা পুর্নমিলনের পথ প্রশস্ত হলেও কুন্দের মৃত্যু সমগ্র উপন্যাসটিকে বিষাদময় করে তুলেছে। শাস্ত্রসম্মত ভাবে নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সূর্যমুখী গৃহত্যাগী হলে নগেন্দ্র কুন্দকে উপেক্ষা করতে থাকেন। কুন্দর বিষপান নীতিবিরুদ্ধ হলেও এটি বঙ্কিমনীতি। সমাজে পবিত্র প্রেমের আদর্শ স্থাপন করতে বঙ্কিম কুন্দকে বিষপান করিয়ে আত্মহত্যা করিয়েছেন। বিধবাবিবাহ সমস্যা বঙ্কিমের যুগে একটা গভীর আলোড়ন এনেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুপযোগীতাই প্রমাণ করিয়েছেন। তবে বাল্যবিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রচিত্রণে বঙ্কিমের সহানুভূতির এতটুকু অভাব বোধহয় নেই।

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী এই উভয় নারী চরিত্রের তুলনামূলক বিচারে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখিয়েছেন— "সূর্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূযমুখীর একটি বিকশিত কুসুম, কুন্দ একটি কুসুম কোরক। সৌরভ

উভয়েরই জগজ্জন মনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছে, আবেকজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত। ...সূর্যমুখী সীতাও দেসদিমোনার সংমিশ্রণ। কুন্দ শকুন্তলা ও মিরান্দার সংমিশ্রণ। সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা সূর্যমুখীর প্রতি কার্যে ও প্রতি কথায় পরিব্যক্ত; কুন্দের নগেন্দ্রময়তা কুন্দের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগৃহীত। ..... উদ্যমশীল, বাক্যপটু সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে যতখানি ভালবাসিতেন তাহা কার্যে ও বাক্যে প্রকাশ করিতেন না; ভাবময়ী ও বাক্যবিধুরা কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি ভালোবাসা নগেন্দ্রের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর হৃদয়ের প্রতি অক্ষর পড়িতে পাইতেন; কিন্তু কুন্দ হৃদয়ের জ্বলন্ত বর্ণগুলিও তিনি দেখিতে পারিতেন না।" এই উভয় নারীচরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কারে যোগেন্দ্রনাথ সমদর্শিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে জীবনের পঞ্চাঙ্ক অভিনয়ের আলেখ্য জাতীয় উপন্যাস বলে মনে করেন। তাঁর মতে, "কুন্দ উষাময়ী সূর্যমুখী সন্ধ্যাময়ী। ... কুন্দ ফুলের কুড়ি, সূর্যমুখী ফোটা ফুল। ... কুন্দ বর্তুল স্রোতস্বিনী, সূর্যমুখী গভীর সমুদ্র। ... অম্লান বদনে বলিতে পারি সূর্যমুখী সুন্দরতম কুন্দ সুন্দরতর। ... সূর্যমুখী এদেশেও দুর্লভ, কিন্তু যদি কোন দেশে সূর্যমুখী দেখিতে পাওয়া যায় তো কেবল এদেশেই। কুন্দনন্দিনী এদেশে দুর্লভ কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সুলভ। উপন্যাস নায়িকা কুন্দনন্দিনী পাশ্চাত্য দেশের সামগ্রী, কিন্তু গৃহবধূর আদর্শ স্থল সূর্যমুখী আমাদের একাধিপত্য আছে— অন্যরূপ এই রূপ নারী হইতে বঞ্চিত।"

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী দুটি ভিন্ন জাতের নারী। উভয়েই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী রূপে পরিচিত। কিন্তু এই ঐক্য ছেড়ে দিলে তাদের চরিত্র ও জীবনের পরিণতিতে প্রভেদের অন্ত নেই। উভয়েই ভিন্ন জগতের নারী হলেও গভীরতম অভিজ্ঞতায় এদের মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য দেখা গেছে; চরম সংকটে উভয়ের হৃদয়সাগর বিমথিত করে একই সুধা আহৃত হয়েছে, উভয়েই নগেন্দ্রগতপ্রাণা। একে অপরের মঙ্গলের জন্য— পলায়ন করেছিল— কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চায়নি, সূর্যমুখী নিজে উদ্যোগ করে স্বামীর বিবাহ দিয়েছে। কিন্তু উভয়েই ফিরে এসেছে স্বামীকে দেখবার জন্য। মৃত্যুর প্রাককালে অবাক্‌পটু কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলেছে— "ছি! তুমি অমন নীরব হইয়া থাকিও না আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম তবে আমার মরণেও সুখ নাই।" সূর্যমুখীও এরূপ কথা বলেছিল। নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে এইরূপ সৌসাদৃশ্য উপন্যাসের ঐক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সূর্যমুখী ব্যক্তিত্বে, আপন জীবনদর্শনের প্রকাশে ও সংসারের অভিজ্ঞতায় অতুলনীয়া; প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় হবার ফলে কুন্দনন্দিনীর চরিত্র উপন্যাসে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। জীবন সমস্যার সর্বাঙ্গীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান সূর্যমুখী জীবনের একটি শোভন সামঞ্জস্য বিধানে ব্রতী হয়ে আংশিক সফলতা অর্জন করেছিল।

সূর্যমুখীর প্রেম ।তিপ্রাণতায় প্রাণিত; আর কুন্দনন্দিনীর প্রেম রূপমোহের দ্বারা প্রবুদ্ধ, কৃতঘ্নতা দ্বারা পরিপালিত ও বিধবার অকর্তব্যের দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত। সূর্যমুখী আদর্শলোকের পত্নী, বাস্তবলোকের নারী। একদিকে তিনি সংসারের কর্ত্রী, অপরদিকে তিনি সংসারের সুখ ও কল্যাণে উৎসর্গীকৃত আত্মা। তিনি বয়সের তুলনায় স্থির ও গম্ভীর। ব্যক্তিত্বসম্পন্না নায়িকা সূর্যমুখীর পাশে ম্লান কুন্দকলি কুন্দনন্দিনী। তার প্রেম নীরব। কুন্দনন্দিনী বিরহের মধ্যে নগেন্দ্রের স্মৃতি লোকে চিরতাপরিম্লান। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনেও কুন্দ চিরকালের জন্য ব্যবধান রচনাকারিণী। তার পাপ অপেক্ষা পরিণতি পাঠককে বিচলিত করে। সূর্যমুখী শ্রদ্ধেয়া, কুন্দনন্দিনী সৌন্দর্য মাধুর্য সত্ত্বেও ভাগ্যবিড়ম্বিতা, সকলের চোখের জলে নিষিক্তা।

বিষবৃক্ষ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষবৃক্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ : নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি, জমীদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে-ছুটিতেছে--বাতাসে নাচিতেছে--রৌদ্রে হাসিতেছে--আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত--অনন্ত-ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছাড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন--মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন--যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন-আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার অকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে. কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়ইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে--আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে, --পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না, --তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কাটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন

মাঝিগিরি করে নাই--তাহা নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকেডাকে খাটো নন, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভয় কি, হুজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। দাঁড়ীরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব শার্সি ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে--না নামিলে সূর্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি?" আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, "হুজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড়বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্তী; নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘপরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বলবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল--স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারিসমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবাশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুপতনশব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণশব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষ বিধূনন শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষাপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতনশব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি

অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত বারি কর্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোকসন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দীপনির্বাণ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদলক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীটপতঙ্গাদি-সমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি--একটা ভাঙ্গা উনান--তিন চারিখান তৈজস--ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালের কালি, কোণে ঝুল; চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবনপ্রদীপেও তাহাই। আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল,--এক অনিন্দিতগৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশু ভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহ তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। একদিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল, লোক-জন, দাস-দাসী, সহায়-সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখমণ্ডল, হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকতশয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা, সেই বিজনবনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসারবন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক,--কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাহার মনে হইত না যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সেদিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর অনিবার্য যন্ত্রণা মুহূর্মুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিলই আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল; ব্যথিতপ্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে; স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছায়া পূর্বগামিনী

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা।" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু- কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেইখানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেন না, মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহুপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্তিনী এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী দেবী মূর্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-ভূষণালঙ্কৃতা মূর্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীয় করুণাপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ

সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে 'মা' কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশ।" কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্তী বেলাবিহীন অন্তসাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অতদূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোকপ্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোক তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ময়ী, অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল, সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপাটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসংবর্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এই সেই

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল; একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহলপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "একশ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন, আমি যাই। তাই ঘন ঘন আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে?"

তখন কুন্দ স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চেন?"

না, তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন সে তোমাদিগের বাটীতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া একজন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থকন্যার উপায় হয়, এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি, দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলিনির্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "ঐই সেই।"

চাঁপা কহিল, "এই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকারা অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আপ্তসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল--সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি--শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্যগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা মিস টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব--উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার

ভিতরে ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন পরিচারিকা, স্বয়ং কমলকে এরূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি, আমি দিতেছি" বলিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল--কমল কেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিলেন, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জিত এবং স্নাত করাইলে--কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল তাহাকে শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশরচনা করিয়া দিলেন, এবং কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস--যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস না--এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূরদেশে বাস করিতেন--নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর কথা বলিলেন, যথা--

"বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম--তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্বেই যেরূপ মাধুর্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু--চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে--সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না--আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত-মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি--যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন করে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এইরূপ--

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এতদিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

"তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্ব ত্যাগী করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার।

"মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তা ত জান। যদি একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

তারাচরণ কে, তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদপূর্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমন একদিন আসিল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম! কি কুক্ষণে সূর্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজরা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকলে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তারাচরণ

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎপরিবর্তে স্বরচিত কাব্যগুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটি অপূর্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কারস্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনী সখি! চলিলে যে!"

মালিনী বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। মালিনী! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূতকাব্য-স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতাগুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পরদিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্রা মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষযোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণীমধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগরে। তাঁহার পিতা একজন ভদ্র কায়স্থ; কবিকাতায় কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতি নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্যমুখীকে লালনপালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীনবৃত্তিতে প্রবর্তিত না করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্মকার্যে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the world এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকাবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন. এবং হে "পরমকারুণিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই; সূর্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়াই কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে. যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তলা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া

তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড থাম; হর্ম্যতল মর্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃন্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোলা জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতলা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী"। উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পুরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা, --চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাটমন্দির", তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারীর দল, পাজকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্ধ্ববাহু একহাত উচ্চ করিয়া, দণ্ডবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না--দাদা বলাই সঙ্গে ছিল--কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতাপিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্যা ও তাঁহার নিজ পরিচর্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন , নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্মিত; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত

ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গী করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা স্নানকালে বহুতৈলোক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন--যেন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরী হইয়াছে-সে দারোগার মুহুরী; গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরেজরা না কি রাবণের বংশ,ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্টাচায্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যামা বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আশু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না! কোন পক্রকেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা, এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ--পাচিকা তর্ক করিতেছে যে,ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না--তাহারা অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাতা অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দরমহলের পর, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘখণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল। কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিতি ঐশ্বর্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্যমুখী আশীর্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রসঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসম্পাদ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলাকৃষ্ণতারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্যমুখীর অবয়ব্য সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্বাকৃতি, সূর্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্যভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই--সূর্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়বিংশতি। সূর্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্যমুখী কুন্দকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা তাহাকে কহিলেন, যে, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী!

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

এইখানে পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢল ঢল করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই--সৌন্দর্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আকা খাঁদা নাক--বীর্য কেবল স্কুলের ছেলেমহলে প্রকাশ--আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ককালে মাষ্টার সর্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল--কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচারিত হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে, তুমিও কি ওল্ড ফুলদের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয় পাছে সূর্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এইমত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র একদিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবনসঞ্চারের অপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভর্ৎসনা করিলেন যে, সেই পর্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাল কাটিল। তাহার পর--কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন। পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এতদূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা

সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উ উ" করিয়া উকুন মারিতেছিল, কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন; কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্‌গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্যমুখী কর্তৃক প্রাতে নিজবুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্যসম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর আলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্বিতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে!" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এইজন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ

ভ্রূযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুনবে?"

তখন "শুনবো গো শুনবো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষম করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েশ আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন, "গোবিন্দ অধিকারী"--কেহ "গোপালে উড়ে"। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"--কোন লজ্জহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও--নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা--তুমি কিছু ফরমাশ করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্তন গাইতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল--যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া,অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্বাঙ্গীণ তাললয়স্বরপরিশুদ্ধ

গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ করিল,

শ্রীমুখপঙ্কজ--দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।"

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি বৈষ্ণবী নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান, সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত-মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে

লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। তোমার শাশুড়িকে কখন দেখিয়াছ?"

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন--আহা! হাজার হোক শাশুড়ি। সে ত আর আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না--তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এসো না?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারির না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখ, ভাল করিয়া বল; আর একটু কাঁদাকাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেইখানে সূর্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।

সূর্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী, গান করিতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসী! একটি ঠাকুরণ বিষয় গা!"

হরিদাসী এক অপূর্ব শ্যামাবিষয় গাইলে সূর্যমুখী তাহাতে মোহিত ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া একবার কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল,

"আয় রে চাঁদের কণা।

তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।

আতর দিব শিশি ভরে,
গোলাপ দিব কার্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে,
দিব পানের দোনা।"

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙটা বাপু বড় ফেঁকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল, "চুলগুলো যেন শণের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপালটা একটু উঁচু।" কমলা বলিল, "ঠোঁট দুখানা পুরু।" হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এইরূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয় কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হইক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল, "ঠিক বলেছ--মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল,"মাগী গান জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তালবোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যার পর নাই কুৎসিতা, এমন নহে--তাহার গানও যার পর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ : বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইলপরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠকখানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষ হইতে স্তনযুগল খসিল--তাহা বস্ত্রনির্মিত। বৈষ্ণবী পিত্তলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল-রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোরবয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্বস্ব গেল--গোবিন্দপুরের বাবুরা

তাঁহাদের তাল্লুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণধনগৌরব পুনর্বর্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ--সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্যার গুণে গৃহে কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল--কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক--দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন--আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানমধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি ভূরি সুরাভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না--পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছু কাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফ্রিস্কুল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত--উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন--কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বেষবিন্যাস ত্যাগ করিয়া নিজমূর্তি ধারণপূর্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছু কাল সেই সর্বশ্রমসংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার

বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁকে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটামণ্ডিত--শিরোদেশসুশোভিমিন! কিবা তোমার কিরীটবিন্যস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবক্ষাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরাসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদভোগ করিলেন--কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতলবাহিনীর আর্বিভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্যগগনশোভিরক্তাম্বুদতুল্যবর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ পুরোহিত হটওয়াটর-প্লেট নামক দিব্য পুষ্প পাত্রে রোষ্ট মটন এবং কটলেট নাম সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায় বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবাপুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র; গুণে সর্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র, ইহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।"

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্বমত আছে।

সু। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি--মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সখের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই--সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে--তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের জন্য সুখ আছে- সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন,"তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর--"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি--তবে মদ ছাড়িব! নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজলনয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত শত গালাগালি দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সূর্যসুখীর পত্র

"প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ- এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম "ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিনকাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,--বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী--তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭/১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যেদিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এজন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে--আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল পর্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম--তাঁহার ছায়া দেখিলে তাহার মনের কথা বলিতে পারি--তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন,--কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্বদা প্রসন্নবদন--এখন এত অনামনা কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন হুঁ;--আমি যদি রাগ করিয়া বলি, 'আমি শীঘ্র মরি,' তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনা কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'মোকদ্দমার জ্বালায়।' আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা--একদিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্যবৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁর চক্ষু জলে পুরিয়া গেল--তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

একথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি--আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার এখখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্কবিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই-- তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই--কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাই বাবুকেও এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাই বাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা--পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,---

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার--তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কাসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না--তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অঙ্কুর

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইতে লাগিল। নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল--নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব?

তাঁহার চিত্ত অচলপর্বত--আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চিক থাকিত; চিকের পশ্চাতে সূর্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্যমুখী কথা কহিতেন। এইরূপে সূর্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?

ডাক্তার। কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।

সূ। বাবু কিছু বলেন নাই?

ডা। না--কি অসুখ?

সূ। কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না--আমি জানি?

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না--ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্যমুখী ঔষধ খাওয়াতে গেলেন; নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন--বিড়াল পলাইয়া গেল- ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও--তোমার কি অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতিপূর্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। একদিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্যমুখী বিস্মিতা হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। একদিন সূর্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন, "কেবল আমার

অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা ঠাকুরাণীকে বলিও--বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।

ইতিপূর্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় জোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

"দোহাই হুজুর--নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে।"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

ইতিপূর্বে তাঁহার একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন,"তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র তো পাইই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? ত বল না কেন? মোকদ্দমা হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না--আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধুবিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত? না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন।

অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয়ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া, এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজী সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করজোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,"আবার শশা চুরি নাকি?'

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,"তোমার দাদাবাবুর সোণার কৌটা ত সূর্যমুখী--কাণা কড়িটি কি?"

ক। সূর্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে, সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে--আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই--" কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?'

ক। তা ত জানি না--কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে--নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?

শ্রী। পত্রখানি দেখিতে পাই?

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই বড়। সূর্যমুখী তোমাকে এ সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে--কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আহার নিদ্রা হইবে না--ঘুরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি, তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল।"

ক। করতে হবে এই--সূর্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে--বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশ বাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুলসমেত উল্টইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে

দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম--ভাজের বাড়ী মশায়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখবে কেন?"

ক। শুধু কি তাই? সতীশের নিমন্ত্রণ: আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে?

শ্রী। সূর্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তাবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল, "তা লাগতে এসো কেন?

কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "আমার খুসি, লাগবো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, বলবো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। এখন বর্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতিতে ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল। দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়েরই মুখপানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার সুবর্ণময় পেনসিলটি দেখিতে পাইয়া অপহরণমানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেনসিলটি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জুন প্রতি অনিবার্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এইরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত--দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্যসত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি

একা থাকিব কি প্রকারে?'

ক। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধতেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে দুদিকে দুই জনে কাঁদতে বসবো।

শ্রী। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।

ক। আয়, সতীশ! আয় আমরা দুজনে দুই দিকে কাঁদতে বসি।

মার আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল--সতীশ অমনি পেনসিলভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল, সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,--দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখাইয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে কমল আবার কহিলেন, "এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। তুমি যাও, মানা করি না, কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?

শুনিয়া কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এইরূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। ফিরিবে কবে?

ক। জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয়দিন থাকিতে পারিব?

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশবাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন! এ কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই তো! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ!" কথাটা শ্রীশের কানে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্যমুখীর চুলের গোছা

লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেকদিন সূর্যমুখী কেশরচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্যমুখী তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি টিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁফ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐরূপ আলাপ হইল,- "ওলো কুঁদী--কুঁদী মুদী দুঁদী--ভাল আছিস ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।'

"আছি দিদি--আমায় দিদি বলবি--না বলিস ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্যমুখী বলিলেন, "না,ভাই! আর দুদিন থাক! তুমি গেলে আমি বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্যমুখী বলিলেন, "আমার কি কাজ করিবে?" কমলমণি মুখে বলিলেন, "তোমার শ্রাদ্ধ," মনে বলিল তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিসে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদী, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না--না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বাহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস কেন?"

কু। তুমি আমায় ভালবাস।

ক। কেন--আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

ক। কে ভালবাসে না? গিন্নী ভালবাসে না--না? আমায় লুকুস নে।

কুনন্দ নীরব।

ক। দাদাবাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি--আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল, "কি?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি--আমার কাছে লুকুস নে--আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস।--না?

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝিছি--মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই--কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?"

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখি চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে--" মুখের কথা মুখে রহিল--তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল--বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ!"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

ক। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, "নহিলে নয়।--সোণার সংসার ছারখার গেল!"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি? মনে করিয়া দেখ?--"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হীরা

এমত সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

"কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কাণে পরলেম দুল।
সখি কলঙ্কের ফুল।"

এদিন সূর্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি-তোমার মুখে ছাই পড়ুক--আর তুমি মর! আর কি গান জান না?"

হরিদাসী বলিল, "কেন?" কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, "কেন? একটা বাবলার ডাল আন ত রে--কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।"

সূর্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না।--গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

"স্মৃতিশাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্যের পায়ে ধরে।
ধর্মাধর্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে।।"

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "গিন্নী মশাই--তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন--সূর্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি মতে কেহ উঠিয়া গেল,

কেহ রহিল; কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই-- বড় শুনেও নাই--অন্যমনে ছিল, এইজন্য যেখানকার সেইখানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এদিক সেদিক বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না--চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথাবার্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, "কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূ। মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূ। আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব--কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা!

"রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্‌সেকে কাঁটা ফোটার সুখটা দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল- সতীশ মামীর সিন্দূরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন--এবং সিন্দূর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন--দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থকন্যা- হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল--হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল--হীরা দত্তগৃহে চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্বাকৃতা মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে বসে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস?"

হী। না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না।—আমি বৈষ্ণবী ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কব না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।

সূ। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জানতে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস, তবে তোকে নূতন-বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূ। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনও ওর পাছু পাছু না গেলে ঠিকানা পাবি না।

হী। আচ্ছা।

সূ। কিন্তু দেখিস যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে। এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসি হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস!"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"

সূ। কি নিবি?

কমল বলিল, "ও একটি বর চায়। ওর একটি বিয়ে দাও।"

সূ। আচ্ছা, তাই হবে—জামাই বাবুকে মনে ধরে? বল তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।

হী। তবে দেখবো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।

সূ। কে লো?

হী। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : "না"

সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি, পরিষ্কার এবং সর্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে,

এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এই শ্বেতপ্রস্তররচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলি লালা ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লিচু, নারিকেল, কুল, বেল, প্রভৃতি ফলবান ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। যদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখী বিকট রব করিয়া নিঃশব্দে সরোবরকে শব্দিত করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্রমালায় মর্মর শব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুল পুষ্পসকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারদিকে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছ বারির উপর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে--দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ, সেই শব্দ করিতেছে--দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে--দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ;--"ভাল, সবাই আগে মলো--মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখনও মনে হইত না, এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এইমাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন, তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তাহলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি--তা দূর হউক, ও আর ভাবি না--বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে--নহিলে মা--আবার ঐ কথা! দূর হউক--ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব--তা হলে হব ত? দেখিতে পাব--রোজ রোজ দেখিতে পাব--কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারি নে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন? এখন ত কেহ নাই--কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই--মনের সাধে নাম করি। ন--নগ--নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি--হলেম কি? আচ্ছা--সূর্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো--দূর হউক --ডুবেই মরি। আচ্ছা, যেন এখন ডুবিলাম--কাল ভেসে উঠবো--তবে সবাই শুনবে,

শুনে নগেন্দ্র--নগেন্দ্র!--নগেন্দ্র! আবার বলি--নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! --নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না--ফুলে পড়িয়া থাকিব--দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব--কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন--মরিতে পারিব কি? পারি--কিন্তু আজি না--একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি--তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটি বলতে বলতে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য?--কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ--দেখি?" (এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্বস্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক, যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; "চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়--মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল--গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে। --কই, মনে ত হয় না। কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না; দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না--পারব না--পারব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাহাদের ত সর্বনাশ করিতেছি। সূর্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে--"

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুতস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি--আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন--মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন--আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না--আমি কেন গেলাম না! আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবরসোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা--নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না--প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল--প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিতসঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল--সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল--নগেন্দ্র। কুন্দের সেদিন আর মরা হলো না।

আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এতকালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এতকালের শিক্ষা? এই কি সূর্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি

করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্যমুখী তোমাকে সর্বস্ব দিয়াছে--তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছে! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনী! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনী!—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনী!—দেখ, পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত--বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ। কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না--চক্ষু মুছিল--কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছাপূর্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল--কথা কহিল না।

"কুন্দ--কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে--আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, "কেন, কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন?" বল বল--বল--আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণী নির্মল, সুশীতল--কুসুম-বাস-সুবাসিত--পরনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে,—ভাবিলেন, "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, "না।" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি--শীতল জল--নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্র বাবু হইয়া বসিল। পাশে একদিকে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্যশৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল-কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা, সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ

বাড়াইয়া দিলেন--মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর একদিকে স্ফটিকপাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জারের মত, একজন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুঁকা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি। ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গ! ছি! ছি! আগে আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন--তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন--নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে "গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর--কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না--কোন্ শালাকে লুকাইব?

সু। সেও একটা বাহাদুরী মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা? রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড় নি ত?

সু। আমি সে পোড়ারমুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী যাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটাচটা দেখি--হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে নাকি?

সুরেন্দ্র দুর্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্বনাশ করবার জন্য?"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখতে গিয়াছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মিল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অন্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে দেবেন্দ্র গাম্ভীর্যসহকারে কহিলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার

বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি; সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্যন্ত পারি নাই--শেষে এই বৈষ্ণবীসজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই--সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী!"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি--উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে--তুমি যদি সে পথে আর যাইবে--তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ। আমি অর্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক! এ সংসারে কে কার? আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

"আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী!"

তখন পারিষদেরা সকলে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র নৌকাশূন্য নদীবক্ষঃস্থিত ভেলার ন্যায় একা বসিয়া রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। রোগরূপ তিমি মকরাদি এখন জলের ভিতর লুকাইয়াছিল--এখন কেবল মন্দ পবন আর চাঁদের আলো! এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা খড় খড় শব্দ হইল--কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল--হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ হয়, মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,--বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানালা দিয়া দেখিলেন--দেখিতে পাইলেন, একজন

স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার একদিকে আবার আর একদিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব--আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ স্ত্রীলোকটিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, মদের গেলাস তাহার হাতে দিল।

স্ত্রীলোকটি তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল।

তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিক আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,--"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি--কোথাও দেখেছি হে।"

তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছি ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"

"Hurah! Three Cheers for হীরা!" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস হস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিল:--

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা।।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা।।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা।।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তার পর--মালিনী মাসি!--কি মনে করে?"

হীরা ইতিপূর্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রের কথাবার্তা শুনিয়াছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল--ইহাতেই গোল বাধিল।

এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র তাহার হাতে আবার মদের গেলাস দিল। হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল--দুই একবার ঢুলিয়া--দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিমকিনি মারিয়া গাইতে লাগিল;--

"বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কোলো,
পিলে অগ্রমাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ো।"

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না, সূর্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল--পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে--সুতরাং সূর্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা শুনিয়া সূর্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন, "কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে। তুই যা তা জানিলাম! আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, "ও মাগী যাহা বলে বলুক; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া অনাথিনী সংসারসমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথায় যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর কোথাই বা যাইবে?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে--সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের

বাতায়ন পথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত--ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল--বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা--শার্সি বন্ধ--অন্ধকারমধ্যে তিনটি জানালা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাঁচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধলোচনে সেই গবাক্ষপথ-প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল--সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতকগুলি ঝাউগাছ ছিল--কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে--তাহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে--তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর অন্য পশু দেখিয়া সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ মন্দ হেলিতেছে; দূর হইতে তালবৃক্ষের তর তর মর্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্বোপরি সেই বাতায়নশ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে--আর পতঙ্গদল ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের শার্সি খুলিল। এক মনুষ্যমূর্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্তি। নগেন্দ্র--নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষপথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ--দুপ! দুপ! শব্দ--যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে! যদি জানিতে পারিতে যে, তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ--একবার দীপ সম্মুখে করিয়া দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও! সরিও না--কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও--তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি--তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া--তাহার আর মনে পড়িবে না!

ঐ শুন! কালপেঁচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না--কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যে যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড়বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ

করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে কি পুণ্য করিলে পতঙ্গজন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম--মরিলাম না কেন?

নগেন্দ্র শার্সি বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই--নিদ্রা যাও--শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে, মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল--সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউগাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথায় যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক--আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী--নির্বোধ কুন্দনন্দিনী ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

কুন্দ চলিল, চলিল--কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল--মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল--বিদ্যুৎ হাসিল--আবার হাসিল--আবার! বায়ু গর্জিল, মেঘ গর্জিল, --বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জিল। কুন্দ! কোথায়, যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট্ পিট্!--পট্ পট্! হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরের ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে। দ্বারের নিকট বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কাণে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে--সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

" কে রে , মাগী?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? আবার বল ত?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এস ত?"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল--হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার রাগ

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটা ঝরঝরে মেটে ঘর। তাহাতে আলেপনা--পদ্ম আঁকা--পাখী আঁকা--ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান --এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল--হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান সুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা, কালো-চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ি থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ি, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল--ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।' কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ি না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ি যখন স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল।

"টিট্--কিট্--খিট্--খিটি--খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজনমাত্র কখনও কখনও রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নাড়িলে, বলে, "কট কট কটাঃ, তোর মুণ্ড উঠা! কড়্ কড়্ কড়াং! খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তা ত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটী! দেখি কেমন আমার হীরেটি! খিট খাট্ ছন্! উঠল আমার হীরামন! ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্--আয় রে আমার হীরা মাণিক।"হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল, বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল--"কে ও গঙ্গাজল! এ কি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়লিনী। মালতী গোয়লিনীর বাড়ী দেবীপুর--দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে--বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী--একটু রৌদ্রপোড়া--মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা--কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে--আশ্রিতাও নহে--অথচ তাঁহার বড় অনুগত--অনেক ফরমায়েশ--যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস! এখন চ!"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমার বাবুর বাড়ী যেতে হলো--ডাকিতে এসেছে! কে জানে কেন? বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া--

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়;"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টন্‌টনে। হীরার সঙ্গে আজ অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সেদিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা একপ্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল--কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গান গায়িলেন,

"এসেছিল বকনা গোরু পর-গোয়ালে জাবনা খেতে--"

বিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া, কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্যমুখীর কি

দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্যমুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত গুপ্ত প্রণয় থাকিলে, কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্মব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না--সূর্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে হার দিব।"

পাপিষ্ঠা হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল--কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ির স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না--কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য--অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়--বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।' হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোক বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম--কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম--কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত--বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হইলেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল--"এখন কি করি? পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দিবেন--বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর, হাতে দিই, তা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরা যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন্‌মিনে, ঘ্যান্‌ঘেনে, প্যান্‌পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্মফুল ফুটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর মনোহরণ হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি

কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠারয়ে কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও ,সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়ছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না! মারি মিন্‌সের নাকে এক কিল্। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক, ও সব কথা যাক। ও পথেও ধর্মের কাঁটা। এ জন্মের সুখদুঃখ অনেককাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়? কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সেই বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না--আর সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মিলে 'বাপু বাছা' বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা, সূর্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,--সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খানকা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,--সবাই জানে যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে--বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড়মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হলে আর বড় সূর্যমূখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটে আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু ষোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম সেয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরই মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে করলে, কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। তার যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে করবো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তা হলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে

বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। ততদিন আমি বসে বসে কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মকশ করাই। আগে আয়িকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া আয়িকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে! কিন্তু সূর্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় করিবার চেষ্টায় রহিল।

একদিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মুনিব-বাড়ী আসিয়া গৃহকার্যে প্রবৃত্তা হইল। কৌশল্যানাম্নী আর একজন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদপুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন কেমন করতেছে, তুই আমার কাজগুলি কর না? কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তা করিব বৈ কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জন গর্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি—তোর যে বড় আস্পর্ধা দেখতে পাই? তুই গালি দিস।" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হী। আ মলো! আবার বলে কখন গাল দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বলবে, উনি আশীর্বাদ করলেন। তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বোন রাগ করিস কেন? মরিতে ত হবেই একদিন—যম ত আর তোকেও ভুলবে না, আমাকেও ভুলবে না।

হী। তোমাকে যেন প্রাতর্বাক্যে কখনও না ভোলে। তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! শীগ্‌গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমার যেন যম না ভোলে! পোড়ারমুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!"

কোন্দল-বিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময়ে যদি হীরার মুখ কেহ

নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধলক্ষণ-এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন, হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল--দোষ সব তোর--আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না--তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা, চল্লেম" বলিয়া হীরা চক্ষের জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন--এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস কেন?"

হী। আমার মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সে কি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল--আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি বল।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে--কারে কখন কি বলেন, ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, "সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,--আমরা তা হলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

ন। সে কি কথা?

হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ বাড়ী যা। কাল ডাকাব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এইজন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

সূর্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায়

দিয়াছ?" সূর্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

ন। কোন দুর্বাক্য?

সূর্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিৎ, তাহাই বলিলেন, বলিলেন, "তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত, যে কথাটা সত্য কি না?"

সূ। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূ। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে বলিতে সূর্যমুখী--পতিপ্রাণা--সাধ্বী--নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে,আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশির-সিক্ত-কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী-আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে--যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা।

যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে--কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা--আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, জোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্--আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।--আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে--আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্যমুখী! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি--কেন না, অনেকদিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না--কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা--যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি--সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ!"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরময়ী মূর্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্যমুখী--কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে--তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,--আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতীকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেক পরে সূর্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "একা ভিক্ষা।" করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রর মূর্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সংবাদের জন্য

হীরা সর্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যেদিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসীমহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু একদিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।--

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্টা নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা-চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা-চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, পুরুষ মানুষ। কিন্তু কে কার কে, মালতী সকলই ত জানিত--এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল--কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদিগের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। একদিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে!" ও গঙ্গাজলে হীরা দূরে গেলে মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "কুন্দ ঠাকরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সেদিন একটা "পার্টি" ছিল--সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পরদিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী--"সতত চঞ্চল"। দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহাই হইল।

এদিকে মহালজ্জা--অপমান--তিরস্কার--মুখ দেখাইবার উপায় নাই--সূর্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না--নগেন্দ্রই সর্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না-- সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্তব্য-- নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ--প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে--তবে হীরা যদি সঙ্গে লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া যায়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। একদিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুক্কুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধগাম্ভীর্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে-- যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না-- যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে--ইতিমধ্যে একদিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিকে বেড়াইব--কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল--নগেন্দ্র কোথাও নাই--ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই--বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই--উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক--আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার।

দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরমধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল। শেষ উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাতার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল--আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল--কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে--নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয়তো নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত! খিড়কির দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কির দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তররচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ, বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে--তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে--গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে--পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালোবর্ণ লুকাইয়া গলা-বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

উদ্যানমধ্যস্থলে, একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তরনির্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে

পারিল না--পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্যমুখী উদ্যানমধ্যে পুষ্প চয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল--পা সরিল না। সূর্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন--দেখিলেন--চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "কুন্দ! এসো--দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে--আমার খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম--এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশ একটু কানা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন--কিন্তু সে স্ত্রীলোক--একাকিনী থাকে--তাহাতে রাত্রি--বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়, তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরা ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি।

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপাবাঁধা হুঁকা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া মিঠাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুত সে চক্ষু সুন্দর। । চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।" দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকালজন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী--আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মাদের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"

হী। আপনি শীঘ্র যান--নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হী। আপনি যান--নহিলে আমি লোক ডাকিব--আপনি কেন আমার সর্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র!

হীরা রাগিল--বলিল, "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্মজ্ঞান নাই--পরের ভাল মন্দ বোধ নাই--কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও--কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই--কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই--বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, 'প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ

করিতে পারি নাই--কিন্তু অবলা স্ত্রীজাতি-- আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে যান।"

দেবেন্দ্র আর এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মণসমাজে একদিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্মপীড়িতা হইয়া, রোষকাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই--আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্মিক নহি, ধর্ম বুঝি না--ধর্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না--আমার ধর্মজ্ঞান নাই, ধর্মে ভক্তি নাই--আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না--সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ছাড়েন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন--এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এই তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যেদিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খোশ্ খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোকজন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ। একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোসের উপর, পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাকু খাইতেছে, আর ফিসফিস করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচী-হস্তে কার্পেট তুলিতেছেন--কেশ বেশ একটু একটু আলুথালু--কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয় বিড়াল ভাবিতেছিল, "মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্বদা

কার্পেটতোলা, পুতুল-খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম-কর্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে? অন্যত্র একটা টিকটিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকাজাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল--পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিকটিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কার্পেট রাখিলেন এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, সতু বাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার?" সতু বাবু বলিলেন, "ইলি--লি--ব্লি।"

ক। সতু বাবু, কখনও আপিসে যেও না।

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমার হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না--আপিসে গেলে বৌ দুপুরবেলা বসে বসে কাঁদবে।"

সতু বাবু বৌ কথাটি বুঝিলেন: কেন না, কমলমণি সর্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বৌ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু এবার উত্তর করিলেন, "বৌ--মাবে!"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন। আপিস গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না; কেন না, এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ;--

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ--নহিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে--শুনিয়া সুখী হইবে--ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোশ খবর আছে--কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে--তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না--নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না, তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন--জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর

মানে কি, বল দেখি, সতু বাবু?" সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা-ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতু বাবুর কর্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নহিলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু, আজ এসো আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথাসময়ে মন্ত্রীবর শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁকে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে--কবে--কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াব!" শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপলতুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না--আবার দশ ছিলিম তামাক খায়--আমি আর কি ভেসে এয়েছি!" এই বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাক-ঠাকুরকে বিসর্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন এবং বলিলেন, "ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও--অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন "এটা তামাসা!"

ক। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা, না পত্রখানা?

শ্রী। পত্রখানা।

ক। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিশ্চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নাই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রী। তবে যা তামাসা করে পারে না, তা সত্য সত্য পারে?

ক। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয় এ সত্য।

শ্রী। সে কি? সত্য, সত্য?

ক। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন, "আচ্ছা, মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই।"

শ্রী। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

ক। ভাল, কারু মাতা নাই খেলেম--এখন বিধাতা বুঝি সূর্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি

জোর করে বিয়ে করতেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;--

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না--অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব--তাহার বড় বাকীও নাই।

"এ কথা বলার পর আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব--আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা কি অভ্রান্ত? যিহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার--কিন্তু তুমি আমি যিহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব?

তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর--এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না--পিতাই সন্তানের পালনকর্তা--তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না ইত্যাদি। আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা--ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি--সূর্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীকণ্টক করি কেন? উত্তর--সূর্যমুখী এ

বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন--তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন--তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?

"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ : কাহার আপত্তি

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হৌক, মন্ত্রিবর আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রী। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

ক। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রী। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না--এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, স্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে--পাছে কেহ বলিয়া ফেলে সূর্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্তকাল ইতস্তত নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে, এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু চিনিলেন যে সূর্যমুখী। পরে সূর্যমুখী তাহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি, বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না--সূর্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে--নবদেবদারুতুল্য সূর্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে--সূর্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন--কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,--কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন--ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল, "সূর্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে--তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি!"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহবৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে--কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"--মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,--বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে?" একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস--সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;-তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম দিবারাত্র তাঁর মর্মান্তিক অসুখ--তিনি সকল সুখ বিসর্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন--তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ--তুমি কুন্দকে বিবাহ কর--আমি সুখী হইব'--তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

ক। আর, তুমি সুখী হইয়াছ?

সূ। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন--তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল--পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য, সম্পদ--সে সকলও তুচ্ছ কথা--এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল,

জোর কপাল--তবে কেন এমন হইল?

ক। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

ক। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী--তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী--কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!--

সূর্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল--চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণে ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না--কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া সূর্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালে সূর্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্বাদ আমি আর জানি না।"

সূর্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে--কি? বল না?"

সূ। কিছু না।

ক। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া

দেখিলেন, সূর্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল--পত্র পড়িতে হইল না--না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না--তাহা করতলে বিমর্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : আশীর্বাদ পত্র

শোকের বেগ সম্বরণ হইলে, কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;--

"যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, যিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার পাইয়া তাঁহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম--তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না--এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম--ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব--ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব--আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকাকড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম--সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না--কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম--আবার ছিঁড়িলাম--আবার ছিঁড়িলাম--কিন্তু আমার বলিবার

যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও, তাহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই, কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি; তাহাই রহিল, যতদিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, ততদিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও! আরও আশীর্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষ কি?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমত চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়ত চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য; নিরোগ শরীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই

ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্তব্যকর্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা, মাতা বর্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাল্যয়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এইজন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। বড় বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তূলভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌মস্ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খানসামারা গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে, মা ঠাকুরাণীকে ফিরাতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ লোক মাঠেঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল; কোথাও বা গাছতলায় কমিটি করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগিল। ভদ্রলোকেরাও বারোইয়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায়কচকচি ঠাকুরের টোলে এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাটগুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালকমহলে ঘোর পর্বাহ বাধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কতদূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন তুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া

মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ দিনমান গেল।

বস্তুত শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্যমুখী কখনও পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাটী হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্রবাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে! আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্যমুখী তখন ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল--কিন্তু সূর্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্যমুখী বলিলেন, "না বাছা!"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।"

সূর্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মা ঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোণাদানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ী ভাবিল, "তাও ত বটে?"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্যসিদ্ধি হইল না--অথচ অনুসন্ধানেরও ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্যমুখীকে চিনিত না--তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে-ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী, বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি গোবিন্দপুরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যেদিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল--মনে করিলেন, "সূর্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল--নহিলে আমি কোথায় যাইতাম--কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন--কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরব আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই--অথচ দুই জনেই নীরব--সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।" আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ--তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না--আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়--তোমারই জন্য সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন--কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ--কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত হইলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ কহিলেন, "না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। "বাসি বই কি?" এ যে বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্যমুখী নয়। সূর্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না--তাহা নহে--কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন

না, আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন? --লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার কাছে রোদন করেন। কমলমণি আসা পর্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই--কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সেদিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময় কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন--সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন--কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন "আমার কাজ আছে।" অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনূর একজনের কপালেই উঠে। সূর্যমুখী সেই কোহিনূর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি--তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম--প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি--এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি--কিন্তু আমার সূর্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি।

(হরদেব ঘোষালের উত্তর)

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে--এখনও ভালবাস;

কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছে। সূর্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভালো লাগে। কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্যদেবই সংসারে চক্ষু। সূর্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না—কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই, " অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে, কবিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীতা হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্তপক্ষে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্তপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত সে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে; গুণেও প্রণয় জন্মে—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এইজন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান

হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি— এই স্থায়ী প্রণয় কি না--ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল--এই মোহের প্রথম বলে সূর্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন--তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকেও স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীণা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়--মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

(নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর)

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ, এ পর্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব! তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই--দোষ আমারই--কিন্তু আমি তাঁহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না--এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি--সে কাঁদে,--আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।

নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপরই ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল, বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্যমুখীনগেন্দ্রকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে,

তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবকসহিত পক্ষিনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই; তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্তসাগরে অতলজলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল অনেক বার হীরার ধর্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুর্নবার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্বার দাসীবৃত্তি স্বীকার করার আর একটি কারণ ছিল। হীরা পূর্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূত করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে, কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা আপন নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশে পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয়সঞ্চার হইল। হীরা, হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশত কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গলচিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রেব পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হীরা দাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখনও কখনও কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাত্ময়ী হীরা নিকট তাল ফাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিতলোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সে ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্রমধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন। যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপাটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা বলিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আপনার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে ঈর্ষ্যানলজ্বলিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল এবং তখন তাহার কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে কালো কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছু দূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান কর্তৃক "শ্বশুরা" "শালা" প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য একদিন তাঁহার প্রসাদী ব্রাণ্ডী খাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজ বাবুকে তেল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরকল্প হইলেন। প্রথম হীরা থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে; পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই--ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা--গলায় রুদ্রাক্ষ--কপালে চন্দনরেখা--জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাত গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস--ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার

পথে রাত্রি হইল--অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল--পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন--কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী--আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে--সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক--কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে--সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্তত হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে, দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন, ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তরভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল--আমি বড় বিপদগ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল,

তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ--সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য ছিল--এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন,--এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে--কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরিমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল--ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে তুমি কি সধবা?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্যমুখী।"

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : আশাপথে

সূর্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহার কাশ রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন--অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিশাচ

ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।"

ব্র। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

সূ। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন --আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্র। কেন?

সূ। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম--তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্র। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না--কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।

সূ। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল--এইজন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যতবার মরিবার কথা হইল, ততবার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখনিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্তায় বুঝিয়াছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি--লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়--কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ--কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি, সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী--তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়--ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেকদূরে আছেন--আমি ততদিন বাঁচিব কি?"

ব্র। কতদূরে সে?

সূ। হরিপুর জেলা।

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ-কলম লইয়া আসিলেন, এবং সূর্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন।—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আছি। আপনি কে তাহাও আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্যমুখী দাসী আপনার ভার্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইহাকে মাতৃসম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে, অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। ইতি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শিরোনামা দিব?"

সূর্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, ঊর্ধ্বমুখে জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্বে নগেন্দ্র দেশপর্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান সেই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বন্ধ রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া

মর্মাবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্তজন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল; মুহূর্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জে যাত্রা করিব--সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

কর্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসী, কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে দৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে--গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যেদিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!--অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে--অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!--নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণীহৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত--আকাশ, নগর, নদী,--সকলই জ্যোতির্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে--এখন সূর্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যেদিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেদিন হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি মনে মনে আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই নাই; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্তত করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না--ভূতপূর্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপুরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্বসংসারসুন্দর, সর্বার্থসুন্দর, রমণীর সর্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলককণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপরিহাসসংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জিতবাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গসুখ। হীরা তো কখনও এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গপরিমার্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল--প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই--বরং হীরা জানিয়াছিল--কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্বিতচর্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্বচনীয় মহিমাকীর্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষিকচিত্তসম্পন্ন মনে করিল--স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথমবসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্তিপ্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্তিবশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চ স্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য--প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক--তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত অব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া

উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমতকালে কার্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে, খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল--কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল--অবাক হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল--আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল--ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে--ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল--কেন না, তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল! কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে--অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্টলোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন; সর্বদা নানা স্থানে পর্যটন করিয়া বেড়ান।

ন। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রা। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন এখান হইতে গিয়াছেন?"

রা। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

ন। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রা। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রা। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না, কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্যমুখী। স্ত্রীলোটি কাশরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল!"

নগেন্দ্রনাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : এতদিনে সব ফুরাইল!

এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এতদিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল? সুখ? তা-ত যেদিন সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল!

নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেইজন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী ভদ্রাসনবাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখাপড়া উকিলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকটে পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়ব্যয়ের কাগজপত্রসকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই

খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না--আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যক কর্ম নির্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্বার দেশপর্যটন করিবেন। আর যতদিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিনযাপন করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থমাত্রই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসারস্রোত তেমনি অপ্রতিহত। জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না--তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই--তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কেন? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ--যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য--অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্যা--ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্বস্ব দিলে--ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে, আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়দমন করিলে, সূর্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্যমুখীর বধকারী--কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন; পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্যমুখী আমার--সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দে

ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী। আমার সূর্যমুখী--কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিবেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন--আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য, সম্পদ, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যেদিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থ রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমত সময়--পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কানবাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন

এবং পত্র পাইয়া, মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম!"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

ন। না।

শ্রী। সূর্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র ঊর্ধ্বে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে!"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না--আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না--"সূর্যমুখী স্বর্গে আছেন"--এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে, নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালক-রোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই--কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে--তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত

করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য। কেন না, গতকল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

ন। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রী। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না--শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ন। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

শ্রী। সে সকল কালি বলিব।

ন। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশবৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল। তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন, --সূর্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল--আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"

শ্রী। আজি আর সে সকল কথায় কাজ কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র, ভ্রূকুটি কাটিয়া মহাপুরুষ কণ্ঠে কহিলেন. "বল"। শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুতগর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"

ন। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রী। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

ন। তিনি ত একটি পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রী। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল!!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"

শ্রী। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরানী হইয়া বসিয়া আছেন; চারদিক হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারি দিকে পুষ্পনির্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারিপার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্যমুখী অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"

ন। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন, একদিন নদীকূলে সূর্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে তিনিও কাশী যাইবেন।"

ন। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পর?"

শ্রী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্যমুখী বর্হি পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্‌ট্রেনে গিয়াছিলেন; এ পর্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।

ন। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল?

শ্রী। না; সূর্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এ পর্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুর আসিয়াছিলেন। পথহাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে আর মনের ক্লেশে সূর্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কর্পদকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন কোন কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে একদিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এতদিন যত্নে ধর্মরক্ষা করিয়া, একদিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ক চূতফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্রকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা

স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না।" তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম--যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে--নচেৎ এই পর্যন্ত। তুমি যেমন গর্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা--দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চাণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চাণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না--কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজ বিষ, সর্পবিষাদি নানা প্রকার সদ্যঃপ্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব--সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে; সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?"

চাণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিশে ধরিবে।"

হীরা কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না--আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চাণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণবিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বিষবিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চাণ্ডালকে দিল। চাণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না--তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই

অমঙ্গল।"

চাণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের পাল, এই অপূর্ব কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে, করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল--এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবানদিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়নকালে কোন বালক বলিল;--

"রামচরম দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে?"

কেহ বলিল;--

"রামদীন পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখ্‌লে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল;—

"লালচাঁদ সিং,
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবানদিগের দ্বারা নানাবিধ অভিমান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া বুড়ী কহিল, "হাঁ বাবা--ডাক্তার বাবা কোথা গা?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার।" বুড়ী কহিল, "আর বাবা, চোখে দেখতে পাই নে--বয়স হল পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোনই হয়--আমার দুঃখের কথা বলিব কি--একটি বেটা ছিল, তা যমকে দিলাম--এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও--" বলিয়া বুড়ী হাঁউ--মাউ--খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবনচরিত আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক কাঁদাকাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "এখন তুই চাহিস কি? তোর কি হইয়াছে?"

বুড়ী তখন পুনর্বার আপন জীবনচরিতের অপূর্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার, ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবনচরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্মার্থ বুঝিলেন--কেন না, তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ্ চাহে। রোগ, বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী--তাহাতে কখনও মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখনও কখনও একা হাসে-- একা কাঁদে, কখনও বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখনও চীৎকার করে। কখনও মূর্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোর নাতনীর হিষ্টীরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বই কি। উহাকে খুব গরমে রাখিস আর এই কাষ্টর-অয়েলটুকু লইয়া যা, কাল প্রাতে খাওয়াইস। পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।

বুড়ী কাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে, লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিল। পথে একজন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি তোমার হাতে ও কি?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। ত তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরার আয়ি, তোর নাতিনীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে? হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়সদোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাচুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : অন্ধকার পুরী--অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী--নগেন্দ্র সূর্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল-- ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিশে কার্ণিশে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়ুই। বাগানে শুকনা পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভান্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিসপত্র ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে। ছুঁচা, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অন্ধকারে অন্ধকারে দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্যমুখীর পোষা পাখীগুলোকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে।

কোথাও কোথাও ভোজনাবশিষ্ট পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁসগুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূরগুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরুগুলার হাড় উঠিয়াছে-- আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুক্কুরগুলার স্ফূর্তি নাই--খেলা নাই, ডাক নাই--বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে--কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড় কুটা, শুকনা পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখনও পায়, কখনও পায় না। সহিসেরা প্রায় আস্তাবলমুখ হয় না; সহিস্‌নীমহলেই থাকে। অট্টালিকার কোথাও আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে,; কোথাও শার্সি, কোথাও খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেণ্টের উপর বসুধরা, বুককেসের উপর কুমীরপোকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ুইয়ের বাসার খড়কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সেখানে যেমন কখনও একটি

গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজন খাইত পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজী যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়ু দুড়ু করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজীকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানজীকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না--সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন--কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন--কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল--কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই--আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর--এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রিদিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন--তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য--একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল, সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল। কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল--আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত--তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন।" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন--তাঁকে আর একবার দেখি--তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং

অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রি হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রীছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল--দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেড়াল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্বোধ। সতীন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতীনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে, বেড়াল কাঁদে"--তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসি হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন--তারপর ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন--আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে--কাঁদিলে ত সূর্যমুখী ফিরিবে না; তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসবো না?" এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই বলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন।"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজ, মজুর, ফরাস, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা, বাদুড়, চামচিকে মহলে বড় কিচিমিচি পড়িয়া গেল: পায়রাগুলা "বকম বকম" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ুইগুলা পলাইতে ব্যাকুল--যেখানে শার্সি বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া ঠোঁটে কাচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে জনে দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে ছুটিল। অচিরৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে

অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পুরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ-শোক-প্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীকালে পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্যমুখীর শয্যাগৃত অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির; এইজন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্যবিশিষ্ট পর্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরেজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্বতশিখরে বেদের উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণাম জন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তকনমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিতা। মস্তকনমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া,

চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শ্বে নানাবর্ণের মেঘ,--নীল, লোহিত, শ্বেত,--ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে--সূর্যকরে তরঙ্গ সকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতিদূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা--" তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী "তমালতালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে; সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জুনের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন; কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলক সকল উড়িতেছে--দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন, লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন--অনসূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে--শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না--দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না--যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন-উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চ *সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে।* প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার একদিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ, নানালঙ্কারভূষিত পৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে নানা রত্নাদিসহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি

তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ঊর্ধ্বোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী। উন্নতদেহবিশিষ্টা পুষ্টকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা, কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন. লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন; এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামিপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষীগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোণা রূপার তুলা?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্যশব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। শার্সি সকল ঝনঝন শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল--সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কত বার সূর্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল--তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতি চিত্রে নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্যমুখী যে কত সুখী

হইয়াছিলেন--কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্যমুখী বল্‌গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্যমূখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেদিকে চাহেন--সেই দিকেই সূর্যমুখীর চিহ্ন। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছি--সূর্যমুখী তাহার অনুকরণমানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন, তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিন দোলে, সূর্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন--কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্যমুখী এক স্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন--

'১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্যমুখী
কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।'

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন--পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না--চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ লোপ হইতে লাগিল--চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র

অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সে সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্তি সূর্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিস? বালিস স্পর্শ করিয়া দেখিলেন-এ ত বালিস নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিযা উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপোলদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব দিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ

যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন: কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আছন্ন হইয়াছে--পুনর্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। গৃহপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরঃস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম--না, সূর্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ উঠ! আমার জীবনসর্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না--কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : পূর্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই--কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন--সে মিথ্যা কথা! কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী

আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। উহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যেদিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার একটি মরিয়া গিয়াছে--আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে--আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন যে, তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না--পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কি দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম--কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি--কিন্তু আবার কত ভয় হইল--তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি--তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম--কিন্তু দুয়া'রে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া আমাকে চিনিতে পার নাই--আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সপ্তত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র সূর্যমুখী এই প্রমাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল।

কিন্তু তৎপূর্বে, পূর্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নগারে উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে--মর্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এই রোদনের মর্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে, শয়নকালে, যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না--এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সংবাদই ইহার কারণ। পূর্বপুরুষব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত--কিন্তু কুন্দ অসামান্যা সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা -সুতরাং হীরার এই নূতন

প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্বমত বিশ্বাসভাগিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষাভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাগিনী মনে করে নাই।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণি, কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ নাকি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সংবর্ধিতবেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্তা বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি, মা! এতদিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসম্বরণীয় হইল।

হীরা মনে মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা, এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল· আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্বজন্য কাঁদিতেছ?"

"বড় বড় দুঃখ" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত--তবে এতদিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা," এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কাণে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেকবার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে--কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে লুকাইলেই বা কি হইবে--স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কাণে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে; এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?"

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত না; আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভালবাসিত না এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত।" ইহা বলিয়া নতনয়না কুন্দের প্রতি একবার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল, পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁষিলাম না, কিন্তু একদিন আমাদের উভয়েরই দুর্বুদ্ধি হইল।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তদ্দারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবামাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত কহিল, "তার পর?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পুরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিবাড়ীর প্রসাদ, পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনবশত বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : কুন্দের কার্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি

কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে, এবং করতালি দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক ওদিক চাহিয়া, এক এক বার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইল। দেখিল যে, সূর্যমুখী হর্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহে হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুম-সুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে; কেহ বা আর্দ্র গাত্রভ্রক্ষণীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। সূর্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিন্তু লজ্জিতা, একটু একটু অপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহমুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন। ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা?"

কথা কৌশল্যার কাণে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এতদিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, সূর্যমুখী কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিক্লিষ্টবদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্যমুখী বলিলেন, "সর্বনাশ হইয়াছে। আমি এতদিনে জানিলাম, আমার কপালে একদিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্বনাশ হইবে কেন?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

ন। সে কি?

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক--আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।

এই বলিয়া সূর্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : এতদিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল--নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না--আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল--বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে--কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে--তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি--তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল--কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না--কুন্দ কহিল, "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম--তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্তকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্মপীড়িত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্বর্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম

যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব--আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম--তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্টনিশ্বাসসহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না--আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম--সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না--আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে--আমার মুখ শুকাইতেছে--জিব টানিতেছে--আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ, পর্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না--আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহার উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুই জনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আব কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সম্বরণ করিয়া সূর্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্যা হইয়াছিলেন।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। একবার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্যসেবার বিরতি না হওয়ায় রোগ দুর্নিবার্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে--এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "একজন পাগলী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল, যে, সে একজন অতি দীনভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না--কিন্তু অতি দীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, ধূলিধূসরিত--কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য--এ কোন উন্মাদিনী!

উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর--আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না--কিন্তু একদিন আমার খোশামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলে--

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এইরূপ কত কথা মনে করাইয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যেদিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম--একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল--সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয়দিন কোনমতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম--আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না--দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না--পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি--যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে নাচিতে ঘরের বাহির হইয়া গাহিতে লাগিল,

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, "পদপল্লবমুদারং" "পদপল্লবমুদারং"।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে--

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

[ঘ] পরিশিষ্ট

১। 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কিত নানা তথ্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। ১২৮০ বঙ্গাব্দে [১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১জুন] 'বিষবৃক্ষ' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথমে সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ছিল :

বিষবৃক্ষ/উপন্যাস/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত/কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। ১২৮০।

উৎসর্গপত্রে ছিল :

কাব্যপ্রিয়— পণ্ডিতাগ্রগণ্য
শ্রীযুক্তবাবু জগদীশনাথ রায়
সুহৃদ্বরকে
এই গ্রন্থ
বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ
অর্পিত হইল।

প্রথম সংস্কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১৩।

দ্বিতীয় সংস্করণে কাঁটালপাড়া থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১৪।

তৃতীয় সংস্করণ— ১৮৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২।

চতুর্থ সংস্করণ— ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২।

পঞ্চম সংস্করণ— দেখা যায়নি।

ষষ্ঠ সংস্করণ— ১৮৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সখ্যা ২৪৯।

সপ্তম সংস্করণ— ১৮৯০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সখ্যা ২৪৯।

অষ্টম সংস্করণ— ১৮৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে উপন্যাসটির আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের পাঠের বিশেষ পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন।

২। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে Miriam S. Knight 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ প্রকাশ

করেন 'The Poison Tree' নামে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'বিষবৃক্ষে'র অংশ বিশেষের অনুবাদ করেছিলেন 'The Bane of Life' নামে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্টক্‌হল্‌ম থেকে 'বিষবৃক্ষে'র সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Det Giftiga Tradet' নামে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সিয়ালকোট G. Quadir-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৩। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ

১. কুন্দনন্দিনী বা বিষবৃক্ষ (১৮৮২) / বলদেব প্রসাদ মিশ্র।
২. বিষবৃক্ষ (১৯১৫) / গুলজারী লাল চতুর্বেদী।
৩. বিষবৃক্ষ (১৯২৫) / জনার্দন ঝা।
৪. বিষবৃক্ষ (১৯৪৮) / সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা।
৫. বিষবৃক্ষ (১৯৫৭) / হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী।
৬. বিষবৃক্ষ (?) / শ্রীকমল।
৭. বিষবৃক্ষ (?) / ভাগ্যোদয় পকেট বুক্‌স্, মথুরা।
৮. বিষবৃক্ষ (?) / রাজপাল এন্ড সন্স, দিল্লী।

[তথ্যসূত্র : বঙ্কিম-বীক্ষা / রামবহাল তেওয়ারী।]

৪। নাট্যরূপ ও মঞ্চাভিনয়

অমৃতলাল বসু 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যরূপান্তর করেন। ১৯২৫-এর মার্চ মাসে এই নাট্যরূপ বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

• মঞ্চাভিনয়ে 'বিষবৃক্ষ'

১. রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার (স্থাপিত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে) মঞ্চে 'বিষবৃক্ষ' অভিনীত হয় ১৮৯৪-এর ৯, ১৬, ২৩ সেপ্টেম্বর; ১৪ অক্টোবর। ৯ সেপ্টেম্বরের অভিনয়লিপি ছিল নিম্নরূপ—

নগেন্দ্রনাথ— মহেন্দ্রলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ— মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র— হরিদাস দাস, সূর্যমুখী— সুকুমারী দত্ত, কুন্দনন্দিনী— হরিমতী, কমলমণি— প্রমদাসুন্দরী।

১৮৯৭-এর ২৮ মার্চ, ৪ এপ্রিল বিষবৃক্ষ অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৩) ১লা মে, ১৮৭৫-এ বিষবৃক্ষ অভিনীত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের (১৮৭৭) মঞ্চে ১৮৭৮-এর ৯ মার্চ, ২৭ এপ্রিল; ১৮৮০-র ১৭ জানুয়ারি বিষবৃক্ষ অভিনীত হয়।

এমারেল্ড থিয়েটারে (১৮৮৭) বিষবৃক্ষ অভিনীত হয় ১৮৯২-এর জুন মাসের ৪, ১১, ১৮, ২৫ তারিখে এবং জুলাই মাসের ২ তারিখে। ১৮৯৩-এর ৫ ফেব্রুয়ারি এবং ১২ মার্চ ঐ মঞ্চে বিষবৃক্ষ অভিনীত হয়।

১৮৯২-এর ৪ জুন এমারেল্ড থিয়েটারে যে অভিনয় হয় সেখানে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র। এমারেল্ডে এটি ছিল প্রথম অভিনয়। 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল :

Grand Dramatie Entertainment/ EMERALD THEATRE/ SATURDAY, 4 June 1892 AT 9 pm-/ Rai Bahadur Barkim Chaudra's world renowned/ BISHABPICKSHA/ OR The Tree of poison/ Our social problem solved/society seen from our own standpoiunt !!/ A perfect of our health and home!!/ New sceneries, charming music, Grand acting / come and see; Illuminated Benaras from the River.

ভূমিকা লিপি : নগেন্দ্র—মহেন্দ্রলাল বসু, দেবেন্দ্র--পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সূর্যমুখী— সুকুমারী দত্ত, কুন্দনন্দিনী— হরিসুন্দরী, কমলমণি— গুলফম্ হরি, হীরা— ভরতারিণী।

এমারেল্ড থিয়েটার মঞ্চে ১৮৯৫-এর ২৩ নভেম্বর, ৮ ডিসেম্বর এবং ২৪ ডিসেম্বর বিষবৃক্ষ অভিনীত হয়। ২৩ নভেম্বরের অভিনয় সম্পর্কে 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল :

A Couple of Bankim Nights!/ THE EMERALD THEATRE/ SATURDAY, 23rd Nov. AT 9 pm./ BISHABRIKSHA;/ With A highly efficient Cast/ Suryamukhi... SM. SUKUMARI DUTT.

এরপর বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে বিষবৃক্ষ অভিনয়ের আর কোন তথ্য হস্তগত হয়নি।

[তথ্যসূত্র : বাংলা রঙ্গলায়ের ইতিহাসের উপাদান/ শঙ্কর ভট্টাচার্য।]

৫। চলচ্চিত্রে বিষবৃক্ষ

বিষবৃক্ষ প্রথম চলচ্চিত্রায়িত হয় জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। চিত্রগ্রাহক ছিলেন যতীন দাস। ১৯২২-এর ২২ এপ্রিল এটি মুক্তিলাভ করে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার হলে। অভিনয়ে ছিলেন— দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক দে, লাইট ও লীলাবতী। [রূপমঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের মতে, অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, নিভাননী, প্রভা, সরস্বতী।]

[বিষবৃক্ষের এই চলচ্চিত্র প্রয়োজনাগুলি ছিল নির্বাক। পরবর্তী প্রযোজনাগুলি সবাক প্রযোজনা।]

এরপর বিষবৃক্ষ চলচ্চিত্রায়িত হয় রাধা ফিল্মসের প্রযোজনায়। পরিচালক ছিলেন ফণী বর্মা, সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন পৃথ্বীশ ভাদুড়ী ও কুমার মিত্র, চিত্রগ্রাহক ছিলেন ধীরেন দে। এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি লাভ করে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে।

অভিনয়ে ছিলেন— কাননবালা, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, জহর গাঙ্গুলি, ভূমেন রায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী ভট্টাচার্য, তারক বাগচি, রেণুকা রায়, প্রমীলাবালা।

পরবর্তী প্রযোজনা ছিল স্টুডিও ৩৯-এর। পরিচালক ছিলেন শান্তিপ্রিয় মুখার্জি, সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন ধীরেন ভট্টাচার্য। ১৯৫৩-র ১৩ মার্চ এই চিত্রটি মুক্ত পায় মিনার, বিজলী,

ছবিঘরে। অভিনয়ে ছিলেন— ধীরেন চ্যাটার্জী, প্রণতি ঘোষ, পদ্মা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, মুরারি ঘোষ।

এরপর অরিন্দম পিকচার্স-এর প্রয়োজনায়, অজয় করের পরিচালনায় বিষবৃক্ষ-এর মুক্তিলাভ ঘটে ১৯৮৪-র ১৩ এপ্রিল পূর্ণ, পূরবী, ইলোরা, জয়া ও পদ্মশ্রী প্রেক্ষাগৃহে। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখার্জী ও চিত্রগ্রাহক ছিলেন বিশু মুখার্জী। অভিনয়ে ছিলেন— রঞ্জিত মল্লিক, স্বরূপ দত্ত, কৌশিক ব্যানার্জী, কল্যাণ চ্যাটার্জী, অপর্ণা সেন, দেবশ্রী রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্তী।

৬। 'বিষবৃক্ষ' : সমালোচনার দর্পণে

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে) 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ বাঙালী পাঠক সম্প্রদায়কে উৎকণ্ঠিত করে রাখতো সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর পরিণতি জানার জন্য। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 'বিষবৃক্ষ' এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল— 'This novel was to be found in the baitnkhana of every Bengali babu throughout the whole of last year.' 'ক্যালকাটা বিভিয়ু' পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' উপনাসে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা উল্লেখ না করলেও প্রথমা পত্নী সূর্যমুখী জীবিত থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের বিধবা বিবাহ বাঙালী সমাজ কী ভাবে গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিল। তবে বিধবা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু বাঙালী সমাজকে আশ্বস্ত করেছিল। একথা ভেবে সমকালীন হিন্দু সমাজ তৃপ্তিবোধ করেছিল যে কুন্দর মতো বিধবার মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য এবং দৃষ্টান্তমূলক।

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলেন এবং তিনি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সূর্যমুখী চরিত্রে পাশ্চাত্য রমণীর সাহস লক্ষ্য করেছেন। সমালোচক একথাও বলেছেন যে, সূর্যমুখী যদি সপত্নী কুন্দকে সস্নেহে গ্রহণ করতো তাহলে এমন সাংসারিক বিপর্যয় ঘটতো না। ১২৯১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'পাক্ষিক সমালোচক' পত্রিকায় জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন যে, সূর্যমুখী সতীসাধবী হলেও একটিমাত্র জ্ঞানের অভাবে সে স্বামীসুখ বঞ্চিত হয়েছে। পতি প্রেমের অণুমাত্রও যদি সে সপত্নী কুন্দকে দান করতে পারতো তাহলে 'বিষবৃক্ষে' অমৃত ফল ফলতো। সুভদ্রার সারথ্যের অনুকরণে সূর্যমুখীর গাড়ি চালাবার সাধ হলে নগেন্দ্র অন্তঃপুরের উদ্যানে গাড়ি নিয়ে এলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনানুযায়ী : "উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া সূর্যমুখী সুভদ্রার মতো নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন।" এই চিত্রে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য স্বভাব লক্ষ্য করেন এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লেখেন যে, গাড়ি হাঁকানো 'বাঙালী নারীর শোভা পায় না।' কুন্দনন্দিনী সম্পর্কে সমালোচক বলেছিলেন, কুন্দের মতো নারী এদেশে দুর্লভ, পাশ্চাত্য দেশে সুলভ। পরবর্তী কালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রমুখ সমালোচকগণ সূর্যমুখীর গাড়ি চালানোর

বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এমনকি কবি নবীনচন্দ্র সেন সূর্যমুখীর গৃহত্যাগকে বাঙালী গৃহবধূর একান্ত গর্হিত কর্মরূপে বিবেচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সনাতন আদর্শচ্যুতিও পাশ্চাত্য রীতির সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পতি-পত্নী ও উপপত্নীর প্রেমকাহিনী বর্জন করে রামায়ণ-মহাভারতের পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি অঙ্কনের কথা বলেছেন। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' গ্রন্থে বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাপের চিত্র 'চিত্তাকর্ষক ও মাদকতাপূর্ণ'; পুণ্যের চিত্র সে তুলনায় নিষ্প্রভ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে হিন্দু আদর্শ চূর্ণ করেছেন। অথচ কিছুই নির্মাণ করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাস ইউরোপীয় উপন্যাস রূপে সার্থক হলেও ভারতীয় উপন্যাস রূপে ব্যর্থ। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হলে রেভারেন্ড লালবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি সমাজে নতুন প্রেমের উদ্বোধক। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রেমকে ভারতচন্দ্রীয় কুৎসিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে পবিত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালি জাতিকে রমণীর রূপ নতুন চোখে দেখার এবং সেই রূপকে পূজা করার প্রথম পাঠ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত। নারীকে শ্রদ্ধা করার মহামূল্যবান শিক্ষাও বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিল।

৭। পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষে'র প্রভাব

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিকগণ বিষবৃক্ষ-এর কাহিনী, ঘটনা ও দৃশ্যাবলী অনুকরণ করছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রের অধঃপতনের যে একটা মোটামুটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের উপন্যাসে সেটি অনুপস্থিত।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ (১৮৯০) উপন্যাসের নাগাদিত্য-সুহার-সেমন্তীর কাহিনী-অংশ বিষবৃক্ষ-এর প্রভাবে নির্মিত। মিবাররাজ নাগাদিত্য ভীল কন্যা সুহারের প্রতি অনুরক্ত হয়। সুহার অনূঢ়া, অস্ফুটবাক এবং প্রণয়-প্রকাশে ভাষাহীনা। সুহার হৃদয়ে রাজার মূর্তি রচনা করে ফেলে। তবে সে তার ভালোবাসার কথা সযত্নে গোপন রাখে,— এমন কি নিজের কাছেও। কিন্তু যেদিন রাজা সুহারের হস্ত-স্খলিত পদ্মগুচ্ছ তার হাতে তুলে দেয় সেদিন তার মনে এক অনির্বচনীয় শিহরণ জাগে। সে গোপনে তা অনুভব করে গোপনেই পুলকিত হয়। তারপর জলাশয়ের তীরে রাজার কথা ভাবতে থাকে।

এদিকে রানি সেমন্তী স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং পরে নিজেই এক দুঃসহ অপরাধবোধে ক্ষতবিক্ষত হয়।

কিন্তু রাজা-রানির দাম্পত্য জীবনে অবশেষে ফাটল দেখা দেয়। রাজা, রানির সন্দেহে

ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে সুহারকে বিয়ে করার সংকল্প করে। এই বিয়েকে শাস্ত্র-সম্মত করার উদ্দেশে রাজা ভণ্ড পুরোহিত গণপতিকে বলে, সে মনু কর্তৃক একদা প্রবর্তিত বিবাহ-বিধির পুনঃপ্রচলন করতে চায়। কিন্তু মনুর বিধি তাকে প্রচলন করতে হয়নি— সুহারের পালক পিতা জুমিয়া এসে এই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পতিপ্রাণা রানি সেমন্তী অতঃপর বিয়ের আসরে রাজার হাত সুহারকে সমর্পণ করে।

অবশ্য এই বিয়ে সম্পন্ন হয়নি, বিয়ের আসরে জুমিয়ার বর্শাঘাতে রাজা-রানির মৃত্যু হয়। সুহার রাজার শিশু পুত্রকে বুকে নিয়ে তার মুখে প্রণয়ীর মুখচ্ছবি দেখে একাকিনী বাকি জীবন অতিবাহিত করে।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের 'সন্ন্যাস' (১৮৯২) উপন্যাসের কাহিনীকে বিষবৃক্ষ এর কাহিনী-পরিকল্পনা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও মূল কাহিনী-ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবু সূর্যমুখী-নগেন্দ্র প্রসঙ্গের প্রভাব থেকে ঔপন্যাসিক মুক্তি পাননি।

যোগমায়া মনের মতো স্ত্রী নয় ব'লে হরিচরণ তাকে ত্যাগ করতে চেয়ে যা বলেছে, তা নগেন্দ্রের উক্তির মত। যোগমায়া তাঁকে বিবাহ করতে বললেও হরিচরণ গৃহত্যাগ করেছে, যোগমায়া তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। ঘটনাক্রমে কোকিলভঞ্জের রাজা দেবীপ্রসাদের কন্যা মণিয়ার প্রতি হরিচরণ প্রণয়াকৃষ্ট হ'লে, যোগমায়া আর সংসারে ফিরে আসেনি, নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হরিচরণ-মণিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। বিবাহ রাত্রিতে হরিচরণ যখন মণিয়াকে বক্ষে ধারণ করেছে, তখন সে যেন জানালায় যোগমায়ার মুর্তি দেখতে পেয়েছে। দ্রুত ঘরের বাইরে এসে 'যোগ' বলে চিৎকার করেছে। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি। অবশেষে যোগমায়ার মৃত্যুকালে হরিচরণ তার সাক্ষাৎ পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

মৃত্যুকালে যোগমায়া জানিয়েছে, কীভাবে বিয়ের রাতে জানালা দিয়ে মণিয়া-হরিচরণের মিল-দৃশ্য দেখে ব্যথিত হৃদয়ে প্রস্থান করেছে, কী যন্ত্রণায় সে স্বামীর ডাকেও ফিরে আসতে পারেনি।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি' উপন্যাসেও পূর্বোক্ত দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে। সুকুমারী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার পর রমাপতি সুরবালাকে বিয়ে করেছে। বাসররাতে যখন সুরবালা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন রমাপতি অতীত-স্মৃতি, সুকুমারীর স্বর্গীয় প্রেম প্রভৃতির পর্যালোচনায় মগ্ন— আর তখনই সুকুমারীর ছায়ামূর্তি দেখে রমাপতি চিৎকার করতে লাগিল। রমাপতি তাকে ধরবার জন্য সেদিকে ছুটে গেলো, 'কিন্তু কিছুদূর গিয়ে সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল'।

লক্ষ্য করা গেলো, পূর্ব-বর্ণিত ঘটনা দু'টি বিষবৃক্ষ-এর 'স্তিমিত প্রদীপে' এবং 'ছায়া' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অনুকরণে রচিত। 'ছায়া'-পরিচ্ছেদ ভবভূতি রচিত উত্তর-চরিত-এর 'ছায়া' শীর্ষক অঙ্কের অনুসরণে চিত্রিত বলে অনুমিত হয়।— উত্তর-চরিত-এ দেখা যায়, রাম-সীতাকে একবার প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বিরহ-জর্জরিত রাম, সীতার উপস্থিতি অনুভব করেছেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না।

বঙ্গদর্শন-এর ১২৭৯ বৈশাখ-সংখ্যা থেকে বিষবৃক্ষ-এর ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয় এবং ঐ বছর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-অনুদিত উত্তর-চরিত-এর সমালোচনাও প্রকাশ করতে থাকেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র-পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ ভবভূতির উত্তর-চরিত থেকে এই দৃশ্য গ্রহণ করেছেন কিনা। তাঁরা যে তা করেননি, তার প্রমাণ ঔপন্যাসিকগণ শুধু এই দৃশ্যই নয়, তার পূর্ব এবং পরের অনেক বিষয়ই বিষবৃক্ষ থেকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং শুধুমাত্র উক্ত দৃশ্যের বেলায় ভবভূতির আশ্রয় নেবেন, এবং অন্যান্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ করবেন-একথা বিশ্বাস্য নয়।

সূর্যমুখীর নিরুদ্দিষ্ট হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র অনুতাপ-কাতর নগেন্দ্রের দৃষ্টিতে সূর্যমুখীর কক্ষস্থ চিত্রাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার-কথা' (১৮৮৬) উপন্যাসে অনুরূপ চিত্রাবলী সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে স্থান পেয়েছে,— বিধবা সুধার ভবিষ্যৎ সুখময় সংসার-জীবন-কল্পনায়। তাদের সুন্দর কুটিরে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে কলকাতা থেকে কিনে আনা ছবিগুলি হবে মুখ্য। ছবিগুলির সম্ভাব্য বিষয় বস্তু, উমা সিংহে চড়ে বাপের বাড়ি আসা, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে পতিপ্রাণা দময়ন্তীর নিদ্রা, নলরাজার গালে হাত দিয়ে চিন্তা ইত্যাদি।

গোষ্ঠাবিহারী দে'র 'সিন্ধুবালা' (১৮৯৪) উপন্যাসে অঘোরনাথের সদ্য-মৃত্যা পত্নী সিন্ধুবালার কক্ষে প্রলম্বিত চিত্রসমূহের বিষয়বস্তুর উল্লেখ নেই, তবে সেগুলি দেখে অঘোরনাথ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এ ঘটনা বিষবৃক্ষের অনুরূপ।

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসে, অতীত দাম্পত্য সুখের স্মৃতিময় চিত্রাবলী নয়— হিন্দু বীর প্রতাপের ঘরে, বীরত্বব্যঞ্জক একটি পৌরাণিক চিত্র 'বিষবৃক্ষে'র চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সমাজ সংস্কারের নামে তারাচরণ-দেবেন্দ্র প্রমুখ চরিত্রের বাগাড়ম্বর এবং অসদুদ্দেশ্য ব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'করুণা' উপন্যাসে এরূপ একটি অন্তঃসারশূন্য ও দুরভিসন্ধিমূলক সমাজ-সংস্কারের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অনুকরণে রচিত হলেও বিনোদিনী-যোগেশ্বরের প্রাথমিক আকর্ষণের বর্ণনা নগেন্দ্র-কুন্দের অনুরাগ-বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত। সূর্যমুখী চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর (দ্বিতীয়) ছায়া থাকতে পারে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। নবীনচন্দ্র সেনের মতে, 'বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী'।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিকগণ সূর্যমুখী-চরিত্রের অনুকরণে চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তার পাতিব্রত্যকেই একমাত্র অনুকরণীয় ব'লে বিবেচনা করেছেন।

অজ্ঞাতনামার 'শক্র সিংহ' উপন্যাসে, নিজ আশ্রয়ে পালিতা কন্যাতুল্য অনুপমার প্রতি মহারাজ মহাবলসিংহ প্রণয়াসক্ত। স্ত্রী কমলাদেবী স্বামীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে সূক্ষ্ম অভিমান এবং পাতিব্রত্যের কঠোর সংস্কারবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, স্বয়ং অনুপমার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়ে অনুপমাকে বিয়েতে সম্মত করান।

চণ্ডীচরণ সেনের 'অযোধ্যার বেগম' (১ম খণ্ড) উপন্যাসে বলবন্ত সিংহ যা-তে অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত না হয়, এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও স্ত্রী গোলাপকুমারী ব্যর্থ হয়। বলবন্তসিংহ পালিতা পূর্ণিমার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' উপন্যাসে স্বামী যোগেশ্বর বিধবা বিনোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হ'তে পারে ভেবে উমা রসিকতা ক'রে যোগেশ্বরকে যা বলেছে, তা সূর্যমুখীর অনুরূপ।

দাসী হ'লেও হীরা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র। সম্পদ-বৈভব নয়, প্রণয় তার হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে প্রতিহিংসা ও স্বার্থপরতা। প্রবল প্রেম-বাসনার জন্য পৃথিবীর সমগ্র লোকের অমঙ্গল সাধন করতে সে প্রস্তুত। এই স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনাই তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণা এবং পরশ্রীকাতরা ক'রে তুলেছে। দেবেন্দ্রকে পাবার জন্য সে সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কুন্দর সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিক হীরার আদর্শে যে-চরিত্রে সৃষ্টি করলেন তা-তে হীরার অন্তর্বেদনা এবং সুপ্ত বাসনা অনুপস্থিত; মুখ্য হয়ে উঠলো প্রেমহীন প্রতিহিংসা, কোথাও বা প্রেমের স্থলে দেহজ কামনা তাঁদের সৃষ্ট সেই চরিত্রকে বিকৃত ক'রে তুললো।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাসে গোপাল বিজয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু বিজয় রাজকন্যা ঊষাবতীর প্রেমমুগ্ধ, অথচ ঊষা ভালোবাসে কল্যাণকে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিজয়-কল্যাণের প্রেমে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য গোলাপকে কপটপ্রেম নিবেদন ক'রে তার হীন চক্রান্তে গোলাপের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আত্মসুখের অত্যুগ্র বাসনার কাছে সে পরাজিত হয়। সে কল্যাণের কাছে স্পষ্টই প্রমাণ ক'রে দেয়, ঊষা বিজয়ের প্রেমাকৃষ্ট। কল্যাণ ঊষাকে 'অসতী', 'কুহকিনী' ব'লে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করে। এই আঘাতে ঊষার মৃত্যু হয়। পরে গোলাপ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কল্যাণের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। গোলাপ বিজয়কে পায়নি— প্রেমে ব্যর্থ হয়ে উন্মাদিনী গোলাপ পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।

দামোদর মুখোপাধ্যাযের 'দুইভগ্নী' উপন্যাসে, মাধী প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নয়, অর্থের হীন লালসা চরিতার্থ করার জন্য বিনোদিনীকে কৌশলে বিষ-প্রযোগ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের রুক্মিণী-চরিত্রে হীরার প্রভাব স্পষ্ট। 'রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মনোরাজ্য অধিকার লোলুপ'।

বহুচারিণী রুক্মিণী। যুবরাজ উদয়াদিত্য যৌবনের মদমত্ততায় তার ফাঁদে পা দিয়েছিলো মুহূর্তের জন্য। সেই থেকে রুক্মিণী প্রত্যহ কামনা করে, যেন এক সুপ্রভাতে উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমার মৃত্যু-সংবাদ সে পায়। প্রতাপের বিনাশও তার কাম্য— তাহ'লে উদয়াদিত্য সিংহাসনের অধিকারী হবে,— কিন্তু রুক্মিণীর এই উচ্চাভিলাষ যখন মিথ্যে ব'লে প্রতিপন্ন হ'লো, তখন তার ক্রোধ এবং ঈর্ষা সুরমার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গেলো। রুক্মিণীর বিষপ্রয়োগে

সুরমা মৃত্যু বরণ করলো।

রুক্মিণীর পরিণাম উন্মাদনা না হ'লেও উদয়াদিত্য-বসন্তরায়-সীতারামের পলায়নকালে তার অসংবৃত বলপ্রয়োগ এবং প্রতাপের সম্মুখে উদয়-বসন্তরায়ের সংবাদ জ্ঞাপনকালীন বিশৃঙ্খল আচরণ উন্মাদিনী সদৃশ।

মীর মশারফর হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) বাস্তব ঘটনামূলক উপন্যাস হ'লেও, এই উপন্যাসে অঙ্কিত রূপসী-চরিত্রের বর্ণনায় হীরা-চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ঈর্ষান্বিতা রূপসী সরজা নাম্নী একজন দাসীর সাহায্যে দৌলতননেসাকে বিষ প্রয়োগ ক'রে হত্যা করে।

> এতদিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ...তবে তাহার পরিণাম ফল পরিণাম ফলের সহিত দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

রূপসীর পরিণতি ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি, তবে তাঁর ইঙ্গিতে অনুমান করা যায়, রূপসীর 'পরিণাম ফল' সুখকর হয়নি।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'আমাদের ঝি' (১৮৯৫) উপন্যাসে জনৈকা ঝি মূল চরিত্র। সে বালবিধবা, সুন্দরী এবং লালসাময়ী। নায়কের প্রতি সে প্রণয়াকৃষ্ট হ'লে— নায়ক তাকে বহিষ্কৃত করে। প্রেমেব্যর্থ ঝি নায়কের স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং তার চক্রান্তে নায়ক চাকুরীচ্যুত হয়। পরে সে উন্মাদিনী হয়ে পড়ে।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পুণ্যপ্রভা উপন্যাসে চন্দ্রকলা বিধবা নয়, তবে তার অবৈধ প্রেম এবং পরিণতি হীরার অনুরূপ। চন্দ্রকলা, অবৈধ প্রেমাঙ্কা চরিতার্থ করার জন্য স্বামী কালিকান্তের সর্বস্ব অপহরণ ক'রে প্রণয়ী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। কিন্তু যখন সে অনুভব করেছে, ডাক্তার প্রেম নয়, সম্পদের আকাঙ্ক্ষী তখন প্রণয়-ব্যর্থ চন্দ্রকলা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ডাক্তারবাবুকে হত্যা ক'রে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছে।

কুন্দনন্দিনী-চরিত্র ঔপন্যাসিকগণকে তেমন আকৃষ্ট করেনি, কিন্তু তার কারণ মৃত্যুদৃশ্য তাঁদেরকে অভিভূত করেছিলো। তাই অনেকে তাঁদের নায়িকাদের মৃত্যুর বর্ণনা দেবার সময়ে কুন্দর মৃত্যুচিত্র স্মরণ করেছেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'দুইভগ্নী' উপন্যাসের বিনোদিনী স্বামীর অবহেলায় বিষপান করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমা, রুক্মিণীর বিষপ্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুকালীন দৃশ্য :

> উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন "সুরমা"। সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কী নাথ"। উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কি হয়েছে সুরমা?" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য

হাত উঠাইতো চাহিল, হাত উঠিল না। ...সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।... উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছিনা।" ...তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। ...উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' (১৮৯৪) উপন্যাসে বন্দিনী ফুলজানি সতীত্ব রক্ষার্থে বিষপান করার আগে হামেসা নাম্নী পরিচারিকার সহায়তায় পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ পাইনের 'যোগিনী' উপন্যাসে দামিনী তার স্বামী যাদবের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ শুনে বিকারগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

ভবানীচরণ ঘোষের 'সরমার সুখ' উপন্যাসে বিধবা সরমা মৃত্যুকালে তার প্রেমাস্পদ সুরেশকে তার হাত স্পর্শ করতে বললে সুরেশ তার হাত স্পর্শ করলো। তখন সুরমা যেন অনাস্বাদিত সুখ অনুভব ক'রে বললো "সুখ, কত সুখ"। এরপর সে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হ'লো।

নগেন্দ্রের নৌকা-যাত্রা বর্ণনার পূর্বাভাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের পাওয়া যায়। বাবুরাম বাবু মতিলালের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে নৌকাযোগে কলকাতা যাত্রা করেছেন :

> নৌকা দেখিতে ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে— কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে— বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে— ধেপার গাধা থপাস ২ করিয়া যাইতেছে— মাছের ও তরকারির বাজার হু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতেছেন— মেয়েরা ঘাটে সারি ২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল— ... ইত্যাদি।

তুলনীয় : নগেন্দ্রের নৌকা-যাত্রা :

> নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। ...নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে— ছুটিতেছে বাতাস নাচিতেছে— রৌদ্রে হাসিতেছে—...। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে ...। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে ...। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়াকাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, ...মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষকেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ...কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশ্য [?] কোন্দল করিতেছেন...।

অবশ্য স্বীকার করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে বর্ণনা অনেক সরস, চিত্রময় ও পুঙ্খানুপুঙ্খ; এবং তা বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক। তবে প্যারীচাঁদ মিত্রের বর্ণনার মধ্যেই

যে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার বীজ প্রথমে দেখা গিয়েছিলো এ এখাও অস্বীকার করার উপায় নেই!

'বিষবৃক্ষ'-এর এই দৃশ্য ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছিলো। তাঁরা উপন্যাসে নদীর পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী বা পুকুরঘাটের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে উক্ত বর্ণনাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং কেউই রমণীদের পরচর্চা ও কলহের কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে নদীর ঘাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

> রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা, ইত্যাদি অনেক গ্রাম্যসুন্দরী ঘাট আলো করিয়া বসিল। নানা প্রকার কথা বার্তা ও রঙ্গরসে ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল, গ্রাম্য সুন্দরীরাও আনন্দে কল্ কল্ শব্দে গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের মধ্যে অল্প বয়স্করা স্বামীর কথা ও প্রাচীনরা পরনিন্দার কথা আনিল।...

অজ্ঞাতনামার 'সরোজিনী' (১৮৭৫) উপন্যাসের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা :

> মধুলুব্ধ ভ্রমর ধাইতেছে— পড়িতেছে— ছুটিতেছে। গন্ধবহ গন্ধ বহন করিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। বিলাসীতে কহিতেছে, যাহা ভাল বাছিয়া লও।

উমেশচন্দ্র বিশ্বাসের 'কুটীর কুসুম' উপন্যাসে ঝড়ের একটি বর্ণনা বিষবৃক্ষ-এ বর্ণিত ঝড়ের তাবিকল অনুকৃতি। যেমন :

> দেখিতে দেখিতে দণ্ডেক পরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামিল। দুই ভাইয়ে ঘোর মাতামাতী [মাতামাতি] আরম্ভ হইল। দাঙ্গা ঝড়ির মনে ঝগরিপনা।...

সত্যচরণ মিত্রের 'সহমরণ' উপন্যাসে চিত্রিত একটি পুকুর-ঘাটের দৃশ্য :

> কেহ ঘাটে কোমর ডুবাইয়া বসিল, কেহ ঝাম. দিয়ে আলতা পরিবার জন্য পা মাজিতে লাগিল,...। কোন দিগম্বরী নিস্তারিণী সামনাসামনি জলে দাঁড়াইয়া কোন হৈমবতীর অকারণ নিন্দা করিতে লাগিল। বালক বালিকারা দুপুরে মার্তণ্ডের উত্তাপ নিবারণের জন্য জলে মাতামাতি আরম্ভ করিল— ..., সেই বিক্ষিপ্ত জল কোন প্রৌঢ়ার মাথা ভিজিয়া যাওয়ায় সে অলক্ষ্যে বিকৃত মুখে যমালয় দর্শন করাইল। ...কোন রমণী রাগে দুলিতে দুলিতে সেই রাগের জ্বালাটা আপন দুষ্ট বালকের পৃষ্ঠে দারুণ চপেটাঘাতে ঝাড়িয়া ফেলিল। ....যুবতীগণ, জলে গা ডুবাইয়া পদ্মফুলের মতো ভাসিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রভাবতী' (১৮৯৬) উপন্যাসে বর্ণিত একটি পুকুর ঘাটের চিত্রে যদিও শুধুমাত্র গ্রামীণ মহিলাদের কথা বিবৃত হয়েছে, তবুও এই চিত্র 'বিষবৃক্ষ'-এর পূর্বোক্ত বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন :

> গ্রামস্থ যুবতীগণ কক্ষে কলসি বহন করিয়া পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছেন...।

একদল যুবতী বিদ্যাভূষণের ঘাটে উপস্থিত হইয়া কলসি সম্মুখে রাখিয়া পরস্পরে আপনাদের ভাগ্যের তারতম্য করিতে লাগিল...। কোন কোন স্ত্রী অপরকে দৈনিক কাজের হিসাব দেখাইয়া আপনার গৌবর ও যশের দাবি করিতেছে। কেহ কেহ শাশুড়ী ও ননদিনীর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। ...কেহ স্বীয় স্বামীর দোষগুণ সমবয়স্কার নিকট বলিয়া মনের গ্লানি ঘুচাইতে লাগিলেন।...

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পদ্মালয়া' উপন্যাসে সরযুনদীর পার্শ্ববর্তী চিত্রের বর্ণনা :

কুলবালাগণ কলসি কক্ষে জল আনিতে যাইতেছে, কেহ অবগাহন করিতেছে, কেহ গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ সঙ্গিনীর মুখে জল ছিটাইয়া দিতেছে, কেহ বা বারিপূর্ণ কুম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, মুখরা ননদিনীর নিকট মাতৃকুলের গ্লানিসূচক তিরস্কারে তিরস্কৃত হইতেছে।

অন্যত্র ঝড়ের বর্ণনা :

তখন সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছিল। শাখায় শাখায় পাতায় ঝগড়া বাধিয়াছিল। কেহ বলিতেছিল, সর্ সর্, কেহ বলিতেছিল মর্ মর্।

যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুন্দরী' উপন্যাসের একটি চিত্র :

নবতৃণপূর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া গাভীগুলা আসিতে চাহে না—রাখালেরা তাহাদিগকে ঠেঙ্গায়। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত গোপালক আপনার ধূলি ধূসরিত বপু প্রক্ষালন মানসে ইন্দারা বা তড়াগাভিমুখে ছুটিতেছিল; ক্বচিৎ বা হাতভরাচুড়ি কাঙনি-পরা আজন্ম পায়ে সম্বন্ধহীন ঘাগরা আঁটা নথ নাকে বাঁকে পায়ে, উল্কি-শোভিতা, নবীনা গোপ বধূ— কোন গোপাল যুবাকে দেখিবামাত্র মুখ, নাক ...অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া জলপূর্ণ কলসি কক্ষে পাশ কাটিয়া পলাইতেছিল। কোথাও কলহবিজ্ঞান-নিপুণা-কামিনী-কুলভূষণাগণ সলজ্জে উচ্চকণ্ঠে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, তৃপ্তি [তৃপ্ত] হইবার পূর্ব্বেই দিনমণিকে অস্তর্গত দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছিলেন।

৮। 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

[ক] "আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা-না-একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হয় না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে তো কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছে? * * * কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল তখনি মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই

পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোনো সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ। যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনীয় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এতদিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল তখনি সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্রে মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে। ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরও নাবিয়া আসা যাক, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষ কালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কী আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে— কুন্দনন্দিনী তো এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল— মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল— আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ-অশুভ বিবাহের প্রথম বলয়ের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম— বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম— ইহাই ট্র্যাজেডি।" [ভাদ্র ১২৮৯]

[খ] "বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্প সাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্প সাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। * * * বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্য রূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলা সাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্পলেখার আনুষঙ্গিক ভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপস্রষ্টা রূপস্রষ্টা

রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।"

৯। তুলনামূলক আলোচনায় 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

সামাজিক উপন্যাস রূপে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ হাতের সৃষ্টি। 'বিষবৃক্ষ' তাঁর রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস, প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীঃ। এর পাঁচ বছর পরে রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রকাশকাল ১৮৭৮। উপন্যাস দুটির মূল প্রেরণা একই জাতীয়; তবে রচনাকালের ভিন্নতায় কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ঔপন্যাসিক দুটি বিশেষ পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা পরিণামে মানবজীবনের শাশ্বত বেদনার ইতিহাস ও সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করেছে। একদিকে ব্যক্তিজীবনের অসংযত প্রবৃত্তির দাবদাহ, অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজজীবনের সংঘাত ও তার হলাহল বস্তুনিষ্ঠভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস দুটিরই কেন্দ্রে আছে অসামাজিক প্রণয়, একটি পুরুষ এবং তাকে আবর্তন করে দুটি নারী। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ স্ত্রী সূর্যমুখী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমর বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিধবা রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট। ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র উপন্যাসদ্বয়ে নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রূপতৃষ্ণার আকর্ষণে উভয় উপন্যাসের দুই নায়কের মনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তার অনিবার্য পরিণতি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। ঔপন্যাসিক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত পরিস্ফুট করেছেন।

একদিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী এবং অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর ট্র্যাজেডি বাঙালী জীবনের বাস্তবভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে দেবেন্দ্র ও হীরার আখ্যায়িকা নাই। 'বিষবৃক্ষে' প্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার আছে, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অতিপ্রাকৃত বর্জিত। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রের পক্ষে কুন্দনন্দিনীর রূপের আকর্ষণ ঘটনা নিরপেক্ষ কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ এবং উপন্যাসের পরিণতি ঘটনাসাপেক্ষ।

'বিষবৃক্ষ' লেখক মনোলোকের গভীরে অবতরণ করেছেন এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বহির্জগতের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের সুউচ্চ কবি-কল্পনার পরিচয় আছে।তাই বিচার ও বিশ্লেষণের অবকাশ এতে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তাঁর দৃষ্টি বিশ্লেষণমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দর সম্পর্কে রূপতৃষ্ণা, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে যে আলোড়ন এনেছিল তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। তবু নগেন্দ্র-কুন্দের প্রেম সমাজ-নীতি বহির্ভূত নয়। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তি সমাজনীতি বহির্ভূত। 'বিষবৃক্ষের'

বর্হিজগতের ঘটনাবলীর প্রভাব নেই বলা চলে। যেখানে নগেন্দ্রনাথ সমাজ সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলবার কেউ নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সমাজজীবনের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। এখানে সমাজশক্তির প্রতীকরূপে কৃষ্ণকান্ত, মাধবীনাথ, এমন কি ব্রহ্মানন্দকেও দেখা যায়। আবার কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক উইল পরিবর্তন বিভিন্ন চরিত্রের উপরে বিশেষ করে গোবিন্দলালের জীবনে বিশেষ বিস্তার করেছে। এখান প্রকৃতির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। এতে গোবিন্দলাল রোহিণীর জীবনে প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' প্রধান চরিত্রসমূহ তাদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত হয়ে নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে যাত্রা করেছে। এখানে নিয়তি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের বিচারবুদ্ধির অভাবজনিত পরিণাম।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আছে দুটি খণ্ড-প্রথম খণ্ডটিতে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পরিশিষ্টসহ ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে। 'বিষবৃক্ষে'র কোনো খণ্ড নাই, এর পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৫০।

পাঁচ বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতাদর্শ গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। দেখা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর সামাজিক আদর্শ এবং সমাজসম্পর্কিত একটি দায়িত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

উপন্যাসদুটিতে সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের চরিত্রগত মিল থাকলেও দুস্তর ব্যবহারগত পার্থক্য আছে। নগেন্দ্রনাথ যৌবনে উপনীত একজন স্থিতধী, জমিদারী কার্যে নিপুণ, প্রজামঙ্গলে তৎপর, শিল্পনিমগ্নচিত্ত ব্যক্তি। অপরপক্ষে গোবিন্দলাল অপরিণত, সাংসারিক অভিজ্ঞতার আলোকবিহীন। ফলে উভয় চরিত্রে নারী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে।

দুই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে বর্তমান সূর্যমুখী এবং ভ্রমর দু'জনে ভিন্ন মেরুর চরিত্র। সূর্যমুখীর তুলনায় ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত। সূর্যমুখী বুদ্ধিমতী, সংযত ও ব্যক্তিত্বশালিনী। স্বামী নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দকে বিবাহ করলে সূর্যমুখী অভিমানে গৃহত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু স্বামীপ্রেমের গভীরতা থাকায় তার প্রত্যাবর্তনের কোনো বাধা হয়নি। অন্যদিকে ভ্রমর সপ্তদর্শবর্ষীয়া বালিকা-বধূ। তার রূপ থাক বা নাই থাক গুণ আছে। তার চরিত্র দুঃখ সাধনার মাধ্যমে জীবন্ত নৈতিক মূল্যবোধের প্রবণতায় সে নারী হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করতে পারেনি, নিজের দুঃখকেই জীবনে বরণ করে নিয়ে পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। একটি সম্পূর্ণ কলঙ্ক চিহ্নবিহীন বালিকা বিনাদোষে পরিত্যক্ত, দাম্পত্য জীবনের সুর যোজনায় ব্যর্থ, জীবনস্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির পূর্বে ট্রাজেডির সাগরে বেদনার শতদলরূপে প্রকাশিত।

উভয় উপন্যাসের নায়িকারূপে কুন্দ ও ভ্রমরের তুলনা করা যায়। কুন্দের রূপানুরাগ কবে কিভাবে বর্ধিত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ উপন্যাসে নাই। অন্যদিকে ভ্রমর গোবিন্দলালের বিবাহিত পত্নী। কুন্দ ও ভ্রমর উভয়েই নীরবে ও দুঃখের পরিমাপে তাদের প্রেমের গভীরতা প্রমাণ করেছে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিবাহ করলে পরিত্যাগের আগে

ভ্রমর বলেছিল সে সতি-সাধ্বী হলে গোবিন্দলালকে পুনরায় তার কাছে ফিরে আসতে হবে। কুন্দকলি কোনদিন প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ না পেয়েই আত্মহননের পথ গ্রহণ করেছে। মৃত্যুর পূর্বে নগেন্দ্রকে তার উক্তি "আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম— তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" "অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।" কুন্দ ও ভ্রমর উভয়েই স্বামীকে ক্ষমা করেছে এবং পদধূলি নিয়ে মহাযাত্রা করেছে। ভ্রমরের অভিমান থাকলেও কুন্দের কোনো অভিযোগ নাই, তার প্রেম ভক্তির নামান্তর।

উভয় উপন্যাসে কুন্দ এবং রোহিণী কুন্দের উপন্যাসগত আচরণে, চরিত্ররূপায়ণে এবং ব্যক্তিত্বে দুটি পৃথক নারী চরিত্র। কুন্দ সরলা, অবাক্‌পটু, শান্ত, নম্র ও বিনীত। আপনাতে আপনি মগ্ন বলে নিজের মনের কথা সে কাউকেও খুলে বলতে পারে না। সে একাকী প্রদোষে নিজের মনের কথা নিজের মনে কাছে বলতে থাকে, সে আত্মস্থ, অন্যমনস্ক। তার মৃত্যু পাঠকচিত্তে মর্মন্তুদ বেদনার সঞ্চার করে। রোহিনী কুন্দের বিপরীত। সে প্রগল্‌ভ মুখর। তার চৌর্যবৃত্তির প্রচেষ্টা পাঠককে বিস্মিত করে। আপন ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য সাহসে সে সাহসী, হঠকারী ও উন্নাসিককুন্দের তুলনায় সে বহির্মুখী চরিত্র। উপন্যাসে উভয়ের মৃত্যু এর করুণ মুহূর্তে সংঘটিত। কিন্তু এই মৃত্যুর পটভূমিকা রচনায় ঔপন্যাসিক কুন্দর প্রতি যতটা সহানুভূতি দেখিয়েছেন রোহিণীর প্রতি ততটা নয়। কুন্দ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তার মৃত্যু বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কিন্তু রোহিণীর মৃত্যু বিতর্কিত এবং উপন্যাসের শিল্পপরিণতিতে সঙ্গতিবিহীন। কুন্দ বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল কিন্তু রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে খল্‌চরিত্র আছে, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তা নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বার বার উইল পরিবর্তন করার অবস্থা দেখানো হয়েছে কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' সে সব কিছু নাই। 'বিষবৃক্ষে' হাস্যরসের প্রসঙ্গ আছে কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তা অনুপস্থিত। উভয় উপন্যাসেই চিঠির ব্যবহারে উপন্যাসের পরিস্ফুট হয়েছে। 'বিষবৃক্ষের' চিঠির সংখ্যা চোদ্দ, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' চিঠির সংখ্যা নয়।

দুটি উপন্যাসের পরিণতি ও ভিন্নতর। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের মিলনে কুন্দের মৃত্যুর ছায়া প্রসারিত হয়েছে। গোবিন্দলাল যেভাবে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন, নগেন্দ্রনাথ তা করেননি এবং তাঁর জীবন ও ভোগ কলঙ্কিত নয়। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মিলন সম্ভব হয়নি। গোবিন্দলাল রূপলালসার জন্য ভ্রমরকে ত্যাগ করেছিলেন, ভ্রমরও তার স্বামীর পদস্খলন হেতু তাঁকে ক্ষমা করতে পারেনি। তাই উপন্যাস দুটির রূপকল্প পৃথক। হৃদয়রহস্যের বর্ণনায় 'বিষবৃক্ষ' সার্থক সৃষ্টি, আবার বর্হিঘটনাবলীর প্রভাবজনিত প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে একজাতীয় ঘটনাও দুটি উপন্যাসে বিচিত্রবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে কাহিনীগত সাদৃশ্যটি সহজেই চোখে পড়ে। নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলাল যেন একই ছাঁচে গড়া। দু'জনেরই জীবনে রূপজমোহের তাড়না প্রবল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনকে ঠিক একই পরিকল্পনায়

রচনা করেননি। নগেন্দ্রনাথ তো ট্র্যাজেডির বলয়গ্রাস থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিলেন। রক্ষা পাননি গোবিন্দলাল। দুঃখকর অভিজ্ঞতা দুজনেরই জীবনে অসীম, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সেই দুঃখের বারিধি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, আর গোবিন্দলাল পারেন নি। তাই শিল্পের বিচারে দুঃখের জ্বালায় দেদীপ্যমান গোবিন্দলালের চরিত্র আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় থেকেছে। তাঁর চরিত্রের ট্র্যাজিক মর্যাদা তাঁকে নগেন্দ্রনাথের মতো দাম্পত্যধর্মে পুর্নবাসন দিয়ে সাধারণ হ'য়ে যেতে দেয়নি। হয়তো এইজন্যই আর্টের বিচারে অনেকে কৃষ্ণকান্তের উইলকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে অসম্মত নন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, কৃষ্ণকান্তের উইলের ট্র্যাজেডি কতকগুলি বাইরের ঘটনার প্রভাবেই এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মনের যে দুর্বার বাসনা বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়েও জীবনের ট্র্যাজেডি আনয়ন করে বা আনয়ন করতে উদ্যত হয়, বঙ্কিম তাকে চিত্রিত করেছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নয়, 'বিষবৃক্ষে'।

বাইরের ঘটনায় জটিল হ'য়ে উঠেছে যে ট্র্যাজেডি, তার গভীরতার চেযে অন্তর রহস্য জটিল ট্র্যাজেডির গভীরতা বেশি। 'বিষবৃক্ষে'র ট্র্যাজেডি এই অন্তরের রহস্যেই ঘনীভূত হয়েছে। তাই আর্টের বিচারে নগেন্দ্রনাথের চেয়ে গোবিন্দলাল সার্থকতর এবং পূর্ণতর সৃষ্টি হলেও 'বিষবৃক্ষ'-এর ট্র্যাজেডি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ট্র্যাজেডির চেয়ে গভীরতর মনে হতে পারে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, 'নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর জীবনের যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বাহিরের কোন ঘটনার দ্বারা জটিল হয় নাই। গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতিপদে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকিয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালী হিন্দুপরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এইখানে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং পারিবারিক প্রতিবেশ কেমন করিয়া ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে এইখানে তাহার প্রকৃষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ট্র্যাজেডির যে তীব্র অনিবার্যতার চিত্র পাওয়া যায় তাহার তুলনা এইখানে নাই। মানবহৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের উদঘাটনই আর্টের উদ্দেশ্য। বাহিরের ঘটনার বর্ণনা সেই রহস্যের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে, ইহাই তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। কিন্তু উপলক্ষ্যকে প্রধান্য দিলে আসল বস্তু অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। নরনারীর হৃদয়ের আদান-প্রাদান যদি প্রত্যেক ধাপেই বাহিরের আকস্মিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে যে সকল আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে লুক্কায়িত থাকে, তাহারা পরিপূর্ণ বেগে প্রকাশিত হইতে পারে না; 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা বাদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরের কোন ব্যবস্থাই তাহাকে প্রশমিত করিতে পারিত না।'

১০। 'বিষবৃক্ষ' : পাঠান্তরের আলোকে

[ক] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে 'বিষবৃক্ষে'র শেষ সংস্করণ অর্থাৎ অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে অষ্টম সংস্করণের প্রচলিত পাঠ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, পাঠ ভেদের নিদর্শন এমন কিছু ব্যাপক বা বিশাল নয়। প্রয়োজনবোধে পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন। খুব বড় রকমের সংযোজন বা বর্জন লক্ষ্য করা যায়নি। মূলত তিনি ভাষাগত আংশিক পরিবর্তন সাধন করে ভাষার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র সূর্যমুখী, নগেন্দ্র ও হীরার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'বিষবৃক্ষে' শব্দগত, বাক্যাংশগত পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হল—

বঙ্গদর্শন	বিষবৃক্ষ (১৮৯২ সংস্করণ)
কক্ষালঙ্কার	গৃহালঙ্কার
তৈলাভা	তৈলভাব
ঘনান্ধকারা	ঘনান্ধকারাবৃতা
দিবারাত্র	রাত্রিদিবা
অর্থানুকূল্যে	আনুকূল্যে
প্রতিবাসিনী	প্রতিবেশিনী
শরতের পদ্মের মতো	শরতের মতো
চমৎকারা	চমৎকার
পাশে	পার্শ্বে
বিগলিতলোচনা	বিগলিতাশ্রুলোচনা
তপ্তকাঞ্চনবর্ণিনী	তপ্তকাঞ্চনকর্ণা
মাধবীলতা	লতা
কোমলবতীব্র উভয়বিধ স্বরে	তিনগ্রামে সপ্তসুরে
অঙ্গরানিন্দিত	অঙ্গরোনিন্দিত

আশ্রাব্যস্বরে	অশ্রুতস্বরে
জলকল্লোলে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনি	জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত
আবশ্যকীয়	প্রয়োজনীয়
পাপিষ্ঠ	পাপিষ্ঠা
ঢাকাই	বারাণসী
দাস্যবৃত্তি	দাসীবৃত্তি
প্রিয়	প্রীতা
শ্বেতপ্রস্তররচিত হর্ম্ম্য	শ্বেতপ্রস্তররচিত
অসুখী	সর্বনাশ
শয্যাগৃহে	শয়নগৃহে
স্বীকার	স্বীকৃত
মৃত্যুযন্ত্রণা	যন্ত্রণা
রহস্য	তামাশা
ক্ষমতা	শক্তি
একত্রিংশ	একত্রিংশত্তম
পূর্ণিত	পূর্ণ
সমাকর্ষিত	সমাকৃষ্ট
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
আত্মধর্ম্ম	সতীত্বধর্ম্ম
হস্তপ্রচার	হস্তপ্রসারণ
নিঃসঙ্গা	নিঃসঙ্গ
চক্ষুরুন্মীলন	চক্ষুরুন্মীলিত
অনন্তশ্রেণী	অনন্তপ্রাসাদশ্রেণী
নৃশংসা	নৃশংস

চক্ষে হস্তাবরণ	চক্ষু হস্তে আবৃত
সন্ধান	সংবাদ
প্রায়ারোগ্যলাভের	অপেক্ষাকৃত আরোগ্যলাভের
৬চ্ছিষ্টাবশেষ	ভোজনাবশিষ্ট
কাঙ্গালিনী	কাঙ্গালী
হস্তিদন্তরচিত	হস্তিদন্তখচিত
স্তূপকৃত	স্তূপীকৃত
উন্নত দেহ	উন্নতদেহব্রিশিষ্টা
ষ্টকান্তি	পুষ্টকান্তিমতী
কক্ষপার্শ্বে	গৃহপার্শ্বে
বিশ্বালভাজিনী	বিশ্বাসভাগিনী
বিস্মিত	বিস্মিতা
সুগন্ধি	সুস্নিগ্ধ
সাপরাধিনী	অপরাধিনী
হীনতেজঃ	তেজোহীন
বেগে	আবেগে

শব্দগত পরিবর্তন ব্যতীত কোথাও কোথাও পুরাতন পাঠ বর্জিত হয়েছে।

যেমন— **বঙ্গদর্শন** :

'আমি তোর দিদি— আমি তোকে বোনের মত ভালবাসি— আমার কাছে লুকাস্ নে— আমি কাহারও কাছে বলিব না'।

বিষবৃক্ষ (শেষ সংস্করণ) :

'আমি তোর দিদি— আমার কাছে লুকস্‌নে— আমি কাহারও কাছে বলিব না'।

'আমি তোকে বেনের মত ভালবাসি'— অংশটি বর্জিত হয়েছে। এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন; কেননা এই জাতীয় প্রয়োগ বহু ব্যবহারে মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাছাড়া এই জাতীয় কথা বলে কুন্দর প্রতি কমলের ভালোবাসা প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তা বর্জন করেছেন।

বঙ্গদর্শন :

'নহিলে নয়' (চতুর্দশ পরি:) বলার পরও কিছু অংশ ছিল। কিন্তু উপন্যাসের শেষ সংস্করণে আছে,— 'নহিলে নয়,— সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল'।

বঙ্গদর্শনে ছিল— 'চক্ষের আড়াল হইলে দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি, নইলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল'। বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশটুকু বর্জন করেছেন।

বঙ্গদর্শন :

'প্রাণের প্রাণ বলি দিল'।

বিষবৃক্ষ (সংযোজিত পাঠ) :

নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল।

মনে হয়, ঔপন্যাসিক কুন্দের চরিত্রে গভীরতা আনয়নের জন্য 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠ বর্জন করে শেষতম সংস্করণে নতুন পাঠ সংযোজিত করেছেন। শেষ সংস্করণে দেখি পরের জন্য কুন্দের যে মঙ্গলচিন্তা তা কমলের কথার পীড়পীড়িতে নয়। পরের প্রতি কুন্দের যে মঙ্গলকামনা তা শেষ সংস্করণে কুন্দের একেবারে নিজস্ব। পরের কথার চাপে নিরুপায় হয়ে রাজী হওয়া নয়। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মঙ্গল সে নিজের অন্তরেই কামনা করেছে, কমলমণির কথাতে নয়।

[বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল রূপ ও রূপান্তর/অপর্ণা ভট্টাচার্য।]

দেবেন্দ্র হীরা ঔপকাহিনীর পাঠান্তর প্রসঙ্গে অপর্ণ ভট্টাচার্য তাঁর প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য বলেছেন :

" 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দু'টি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল— হীরা ও দেবেন্দ্র। এই হীরা ও দেবেন্দ্রর চিত্র বঙ্গদর্শনে ও শেষ সংস্করণে একরূপ নয়। দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী বেশে নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুরে যাতায়াত শুরু করে। তার এই গমনাগমনের উদ্দেশ্য কি তা স্পষ্টভাবে জানার জন্য হীরা দেবেন্দ্রর উদ্যানগৃহে একাকী গোপনে রাত্রে উপস্থিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে এই অংশে ছিল— "তখন দেবেন্দ্রে শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

আমার নাম হীরে মালিনী
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।

আর একজন কোথা হতে গায়িল :—

আমার নাম হীরা মালিনী।
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, 'বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?'

তখন ঠুন! ঠুন! ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী, গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে ঝুমকা; কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে।"

দেখা যাচ্ছে, বঙ্গদর্শনে দেবেন্দ্রের গানের পরে হীরা নিজেই দেবেন্দ্রর কাছে এসে ধরা দিয়েছে। "প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল।" তাই বঙ্গদর্শনে তার সাজগোজের এত বিস্তৃত বিবরণ। বঙ্কিম পরে এই পাঠ পরিবর্তন করেন। পরিবর্তিত পাঠে হীরা ঠিক ইচ্ছাকৃতভাবে দেবেন্দ্রের কাছে ধরা দিতে আসেনি। এখানে তার উদ্দেশ্য দেবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করতে আসা নয়; বরং গোপনে আড়াল থেকে দেবেন্দ্রর বৈষ্ণবী সেজে দত্তবাড়িতে যাওয়ার রহস্যটা জেনে নেওয়া। বঙ্গদর্শনে হীরা তার বাড়ি থেকে বেরবার পূর্বেই স্থির করেছিল যে, সে দেবেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তাই "প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা" ইত্যাদি। পরবর্তী পাঠে হীরার সাজগোজের কোনো উল্লেখ নেই, গায়ে আতরের গন্ধটুকুও নেই। পরবর্তী পাঠে বঙ্কিম লিখেছেন— "স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না।" পরে বঙ্কিম লিখেছেন, "তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া বলিল, 'আমি হীরা'।" আরও পরে লিখেছেন, "সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রর কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল— ইহাতেই গোল বাধিল।"

অর্থাৎ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এখানে গোপনে হীরার ফিরে যাওয়াই উদ্দেশ্য, কিন্তু অসাবধানে খড়খড়ি ফেলেছিল, তাইতেই দেবেন্দ্রের হাতে ধরা পড়ে এবং ধরা পড়ে গেছে জেনেই সে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে— 'আমি হীরা।' অর্থাৎ পরিবর্তিত পাঠে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হীরা ধরা পড়ে নিরুপায় হয়ে দেবেন্দ্রর কাছে তার পরিচয় দিয়েছে। অতএব পরিবর্তিত পাঠে বঙ্গদর্শনের হীরা যে অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় এবং শেষ সংস্করণে হীরা দেবেন্দ্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেনি। হীরার সাহস যত বেশিই হোক না কেন, দেবেন্দ্রের মতো ব্যক্তির গানের পদের সঙ্গে গান ধরা বা তার কাছে এসে বসে পড়ার মতো দুঃসাহস তার হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই পরবর্তী পাঠে এই অংশ বর্জিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম দেবেন্দ্রের উক্তির মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্র ও কুন্দের পূর্ববর্তী সম্পর্কের

কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিতে চেয়েছিলেন। সেই বিবরণ পাঠে পাঠকের মনে সংশয় জাগতে পারে, হয়তো সত্যিই দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের 'পীরিত' হয়েছিল। পরে এ অংশ বঙ্কিম বর্জন করেন। পরিবর্তিত পাঠে বঙ্কিম দেবেন্দ্রকে কুন্দের রূপমুগ্ধ করেই আঁকতে চেষ্টা করেছেন। দেবেন্দ্র 'কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে' পারে না। কিন্তু 'তিন বৎসরের পীরিত'-এর মিথ্যা কলঙ্কে আর কুন্দকে কলঙ্কিত করে না এবং এই পবিবর্তনের ফলে দেবেন্দ্রের চরিত্রেরও সঙ্গতি রক্ষা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ যে দেবেন্দ্র অনতিপূর্বেই একমাত্র বন্ধু সুরেন্দ্রের কাছে উচ্চকণ্ঠে কুন্দনন্দিনীর প্রশংসা করে বলেছে যে, কুন্দনন্দিনী 'অত্যন্ত সাধ্বী'। এর অল্প পরেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও তার পক্ষে সেই 'সাধ্বী' সম্পর্কে এত বড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। আর এই 'তিন বৎসরের পীরিত' যদি সত্যই হত, তাহলে নগেন্দ্রের গৃহে যখন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবীবেশে কুন্দের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলে, তখন তার তিনবৎসরের প্রণয়ীকে ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও কুন্দ অবশ্যই চিনে নিতে পারত। কিন্তু কুন্দ তাকে বিন্দুমাত্র চিনতে পারেনি। তবু কুন্দ যে সত্যই এ ব্যাপারে নির্দোষ, সে প্রমাণও লেখক 'বঙ্গদর্শনে' কোথাও দেননি। কলঙ্ক যখন ঘটেনি তখন প্রমাণের প্রয়োজনও হয়তো লেখকের বোধ করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিম এই অসঙ্গতিটুকু অনুধাবন করেছেন। দেবেন্দ্রের অসংখ্য প্রলপোক্তি থেকে এই অসংলগ্ন কথা কয়টি বর্জন করে বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দ চরিত্রের নিষ্পাপ সরলতাটুকু সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত করেছেন।"